শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দে বি, এ
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

ভাদ্র, ১৩৪৪।

 [মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক—
গ্রন্থকার।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) আসাম-বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা।
(২) বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
(৩) রামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্রীহট্ট (Sylhet)।
(৪) রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।
(৫) শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় চৌধুরী, মিঠাপুর,
পোঃ পাটন

ঢাকা,—
নবাবপুর,—নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীকালাচাঁদ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।
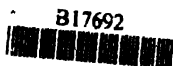
মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ৩৯৪
অশ্বিনী কুমার দত্ত ৩৯৫
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৯৬
পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ৩৯৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪০০
পণ্ডিত শ্যামপদ ভট্টাচার্য্য ৪০২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সঙ্ঘ-গঠন

শ্যামপুকুরের বাড়ী ও কাশীপুর উদ্যান ... ৪০৩
রামকৃষ্ণের অসুস্থতা ৪০৪
পাণিহাটীর মহোৎসবে গমন ৪০৫
কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতে ... ৪০৬
শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ৪০৮
কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে ৪০৯
মহাসমাধি ৪১০
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ৪১২
উপসংহার ৪১৪
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মঠ ৪১৪
রামকৃষ্ণ মিশন ৪২৫
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের বিশেষত্ব ... ৪২৬

প্রস্তাবনা

হিন্দু-সাধারণের ধারণা, ক্রমোন্নতির পথে, ক্ষুদ্রতম কীট-শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন চৌরাশী লক্ষ দেহ ধারণের পর, জীব মানব-দেহ লাভ করে। অতঃপর সৎ কর্ম্মফলে উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়া, জীব এক আনন্দময় শরীর ধারণ করতঃ, পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে; অথবা অসৎ কর্ম্মফলে নিম্ন-গতিতে অবরোহণও করিয়া থাকে। এই উন্নতি-অবনতির গতি, ক্রিয়া ও ফল জানিয়া, নিজ জীবনকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করাই, ধর্ম্মালোচনার উদ্দেশ্য। আবার, এই উন্নতি-অবনতিরও শেষ আছে। পূর্ণানন্দ সাম্ভোগান্তে, জীব আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়া, জীবত্বের গণ্ডি কাটিয়া চিৎসমুদ্রে, বারি-বিন্দুর সিন্ধু-মিলনের ন্যায় ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে, সেইরূপ ভারতে ধর্ম্মকে (মানব-তত্ত্ব) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া, তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতি, কার্য্য ও ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাই, জীবের চরমোন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া, ভারতীয় সমাজ গঠিত হইয়া আছে। সাময়িক রাষ্ট্রবিপ্লব ও প্রাকৃতিক উপদ্রব শত শত বার প্রবল-বেগে সমাজ-দেহে আঘাত করিয়াও, উহাকে ক্ষয় করা দূরের কথা, উহার শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ একবাক্যে ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রাগ্‌বাণী করিয়াছেন।

ভারত-বহির্ভূত দেশেও, অভ্যুদয় বা ঐহিক উন্নতি ও জীবাত্মার ক্রমোন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু জীবতত্ত্ব, ক্রমোন্নয়ন-বাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও ভ্রমাত্মক

ধারণা লইয়া সমাজ গঠনের ফলে, কোনও কালে কোনও সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মিশরীয়, কেলদীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যগুলি জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, সমাজ বা সমষ্টি-জীবন ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের জন্য, ঘরে ঘরে রামসীতা, কৃষ্ণার্জ্জুন, বুদ্ধ-শঙ্কর, গৌর-নিতাই প্রভৃতি যুগ-যুগান্তরের আদর্শ বা ছাঁচ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে, তাহার কোন একটী বা কয়েকটীর সম্মিলিত আদর্শ সমাজ-দেহ হইতেই আদর্শ পুরুষ রূপে উদ্ভূত হইয়া, সাময়িক প্রয়োজন সাধন করে এবং মানবের চরম উন্নতির আদর্শকে উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া যায়।

ইহাই ভারতের ইতিহাস, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভারতীয় মনোবৃত্তির ইহাই রহস্য।

ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শ বর্ত্তমান যুগের ভোগবাদে আহত হওয়ায়, প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ভারতের সমাজ-দেহ হইতে আবার সেই আদর্শ প্রোজ্জ্বল রূপে বিশ্বমানবের সম্মুখে **রামকৃষ্ণ**-রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

মানবচিত্ত পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া কিরূপে অতীন্দ্রিয় সত্য সমূহ প্রকাশের যন্ত্র-স্বরূপ হইতে পারে, কিরূপে মানব দেহ-মনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দের অধিকারী হইতে পারে, হৃদয়ের সাধারণ দুর্ব্বলতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া চির-শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার পন্থা পাঠক রামকৃষ্ণ-জীবনে পরিষ্কার রূপে জানিতে পারিবেন। বর্ত্তমান যুগে, এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে, মানবের কল্যাণ সুনিশ্চিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বংশাবলী

এই গ্রন্থ মধ্যে প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের বংশের অনেকের কথাই অল্প-বিস্তর উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিলাম।

- মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়
  - ক্ষুদিরাম (স্ত্রী—চন্দ্রমণি দেবী)
    - রামকুমার
      - অক্ষয়
    - কাত্যায়নী (কন্যা)
    - রামেশ্বর
      - রামলাল
      - লক্ষ্মীমণি (কন্যা)
      - শিবরাম
    - রামকৃষ্ণ (গদাধর)
    - সর্ব্বমঙ্গলা (কন্যা)
  - রামশীলা (কন্যা) (স্বামী—ভাগবৎ বন্দ্যোপাধ্যায়)
    - রামচাঁদ
    - হেমাঙ্গিনী (কন্যা) (স্বামী—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
      - রাঘব
      - রামরতন
      - হৃদয়রাম
      - রাজারাম
  - নিধিরাম
  - কানাইরাম
    - রামতারক (হলধারী)
    - কালিদাস
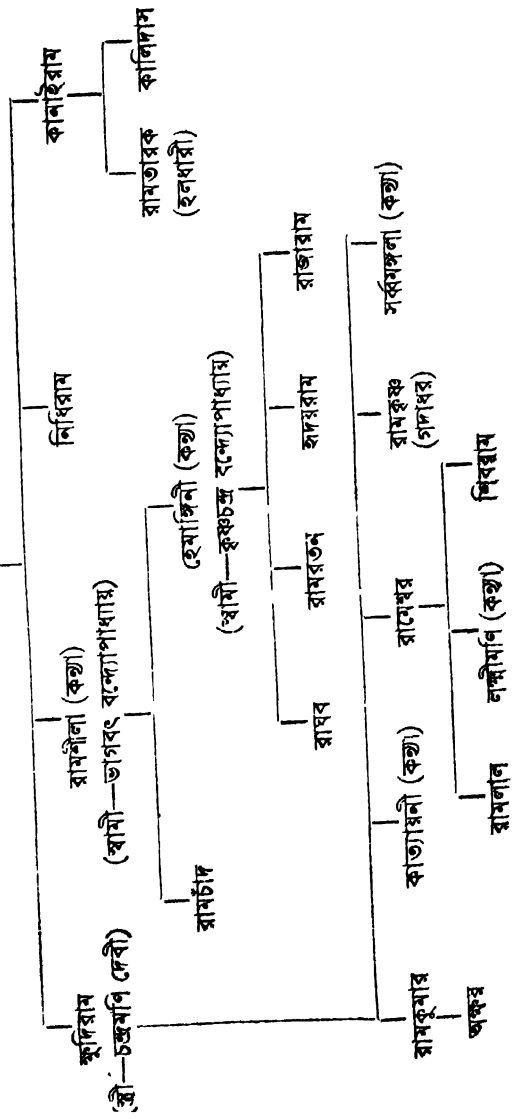
শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—কামারপুকুরে

পিতৃপরিচয় ও জন্ম

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামখানি নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে, বিস্তীর্ণ শস্য-প্রান্তরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেল লাইনের শেষ ষ্টেশন চাঁপাডাঙ্গা হইতে ২৩ মাইল পদব্রজে গমন করিলে ঐ গ্রামে পৌঁছা যায়। বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের বিষ্ণুপুর ষ্টেশন হইতেও সেখানে যাওয়া যায়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি, তখন গ্রামখানি নিত্যই আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ ও শান্তিময় ছিল। অবশ্য ১২৭৪ সালে ম্যালেরিয়া মহামারীর ভীষণ আক্রমণের পর, বাংলার নিবিড়, ছায়াশীতল, শান্তি ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বহু গ্রামের ন্যায়, ইহারও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, কামারপুকুর গ্রামে, এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, আর ব্রাহ্মণী চন্দ্রমণি দেবী। তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র হইলেও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানি গ্রামের বড় রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম পূর্ব্বে দেরেপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতৃপিতামহও ঐ গ্রামেই বাস করিতেন। দেরেপুর কামারপুকুর হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এক সময়ে সেই গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার রামানন্দ রায় তাঁহাকে কোনও নির্দ্দোষ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায়, দুষ্ট জমিদারের কোপে পড়িয়া, চিরকালের নিমিত্ত পৈতৃক বসতবাটী ও গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্ষুদিরাম এইরূপে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইলে, তাঁহার বন্ধু কামারপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করেন। বন্ধু হইতে বসতবাটী নির্ম্মাণের উপযোগী একখণ্ড ভূমি এবং ভরণ পোষণের নিমিত্ত এক বিঘা দশ ছটাক লক্ষ্মীজলা ধানের জমি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদিরাম কামারপুকুর গ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। নিদারুণ সংসার সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার মন অন্যায় অত্যাচার পীড়িত পাপতাপময় জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া

ভগবানের পাদপদ্মে একান্ত নিবিষ্ট হইল। অধিকন্তু গোস্বামী মহাশয়ের অযাচিত সাহায্য ও আশ্রয় তাঁহার ভগবদ্‌বিশ্বাস বহু গুণে বর্দ্ধিত করায়, তিনি পূজাপাঠ, জপতপ, ধ্যান-ধারণাদিতেই দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী ও অতিথিগণের নিমিত্ত ক্ষুদিরামের গৃহদ্বার সতত অবারিত ছিল। গৃহে যাহা কিছু থাকিত, তদ্বারা অতিথি সেবা করিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী অন্নজল গ্রহণ করিতেন। দরিদ্র ক্ষুদিরাম জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অথবা শূদ্রের দানগ্রহণাদি ব্রাহ্মণ্য-বিগর্হিত কার্য্য করিতেন না। পরম হিতৈষী সুখলাল গোস্বামী প্রদত্ত লক্ষ্মীজলা ভূমিখণ্ডই তাঁহার পরিবার পোষণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্রতি বৎসর উহাতে প্রচুর ধান্য জন্মিত এবং তাহা দ্বারাই পরিবারের সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। গভীর ধর্ম্মভাব, সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ব্রাহ্মণোচিত কঠোর জীবন যাপন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহারে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। এই কারণে প্রণাম কালে কেহ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না; এমন কি তিনি যখন স্নানের নিমিত্ত হালদার-পুকুরের ঘাটে নামিতেন, তখন অপর কেহ সেই ঘাটে নামিত না।

ক্ষুদিরাম গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ও কোমলহৃদয় ছিলেন। নিধিরাম ও কানাইরাম নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা

এবং রামশীলা নাম্নী এক ভগ্নী ছিলেন। ভগ্নী রামশীলাই তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা। ক্ষুদিরাম উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিলে প্রথমা পত্নী কোন সন্তান সন্ততি না রাখিয়াই দেহত্যাগ করেন। তৎপর পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণি রামকুমার, রামেশ্বর ও গদাধর নামে তিন পুত্র এবং কাত্যায়নী ও সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

গদাধর-জননী চন্দ্রমণির হৃদয় সরলতা ও দয়াতে পূর্ণ ছিল। তাঁহার উদার স্বভাব, বালিকাসুলভ সরলতা, অসীম সহানুভূতি, গৃহদেবতা ৺রঘুবীর ও স্বামীর উপর অচলা ভক্তি এবং সকলের প্রতি মাতৃতুল্য স্নেহ গ্রামের নরনারীকে আপন করিয়া লইয়াছিল। অতিথি-অভ্যাগত, সাধু সজ্জন এবং ভিক্ষুক ফকিরেরা সমভাবে তাঁহার অকপট সেবায় কৃতার্থ হইত। তাহাদের সেবার নিমিত্ত তিনি সতত প্রস্তুত থাকিতেন। স্নেহ, সরলতা ও দয়ার মূর্ত্তি চন্দ্রাদেবী বাস্তবিকই গ্রামবাসী সকলের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

জড় বিজ্ঞানের কৃপায় আজকাল বহু-দূরবর্ত্তী স্থানও সন্নিকট বলিয়া মনে হয়; লোকে দুই চারি মাইল পথ হাঁটিতেও কষ্ট বোধ করে। বাষ্পীয়-পোত দেশ ভ্রমণকে একেবারে অনায়াস-সাধ্য করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে যান-বাহনের কোনরূপ

সুবিধা না থাকায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ পদব্রজে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবর্গের নিকট চিরতরে বিদায় লইতেন। কারণ অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে অজ্ঞাত দেশ ভ্রমণে পদে পদেই বিপদ, এমন কি মৃত্যুরও আশঙ্কা ছিল। ব্রাহ্মণোচিত কঠোরতা ও সংযমে আজীবন অভ্যস্ত ক্ষুদিরাম তীর্থ ভ্রমণে অনুরক্ত ছিলেন। এই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ৺সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও ৺গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন।

হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ ৺রামেশ্বর ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এবং কামারপুকুর হইতে অল্লাধিক পনর শত মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা-পতি রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিবার সময় এই স্থানে শিবের পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ শিবলিঙ্গ রামেশ্বর নামে পূজিত হইতেছেন। সম্ভবতঃ ১২৩০ সালে ক্ষুদিরাম ৺রামেশ্বর যাত্রা করেন।

ক্ষুদিরাম ৺রামেশ্বর ও দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ দর্শন করিয়া দীর্ঘ এক বৎসর ভ্রমণের পর সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিলেন। পত্নীপুত্র, আত্মীয় ও গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহার ৺রামেশ্বর হইতে ফিরিবার প্রায় এক বৎসর কাল পরে চন্দ্রাদেবী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। ৺রামেশ্বর ভ্রমণের পর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া পিতা ইহার নাম রাখিলেন রামেশ্বর। ক্ষুদিরাম ৺রামেশ্বর হইতে একটী

শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ৺রামেশ্বর নামক ঐ শিব তাঁহার গৃহে পূজিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণ, বংশানুক্রমে রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শিব এবং ৺শীতলা দেবীও তাঁহাদের গৃহে নিত্য পূজিত হইতেন। তাঁহার অতুলনীয় দেব-ভক্তির পরিচায়ক একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একবার তিনি মেদিনীপুর গমন উদ্দেশ্যে প্রত্যুষে বাটী হইতে বাহির হইয়া এক প্রহরের অধিক কাল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে পথের ধারে একটী বেল গাছে অতি চমৎকার নূতন বেলপাত্রা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পক্ষে আর মেদিনীপুর যাওয়া সম্ভব হইল না। তিনি গ্রাম হইতে একটী নূতন ঝুড়ি ক্রয় করিয়া উহা বিল্বপত্র দ্বারা পূর্ণ করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ঐ পত্রদ্বারা মনের সাধে শিব-পূজা করিলেন।

৺গয়াধাম কামারপুকুর হইতে প্রায় দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানকার মন্দিরে ৺বিষ্ণুর পদচিহ্ন নিত্য পূজিত হয়। মৃত পিতামাতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিতে অসংখ্য নরনারী ৺গয়াধামে সমবেত হইয়া থাকে, একথা হিন্দুমাত্রেরই জানা আছে। ১২৪১ সালের শেষ ভাগে ক্ষুদিরাম ৺গয়াধাম দর্শনের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, কাজেই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কাণ দিলেন না।

কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটী

এক শুভদিনে ক্ষুদিরাম ৺গয়াধামে যাত্রা করিলেন এবং মাসাধিক কাল ভ্রমণের পর তথায় পৌঁছিলেন। প্রাথমিক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া তিনি পিতৃপিতামহগণের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলেন। ইহাতে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। তৎপর ক্ষুদিরাম পুনরায় গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন এবং ১২৪২ সালের প্রারম্ভে কামারপুকুর পৌঁছিলেন।

১২৪২ সালে ঋতুরাজ বসন্ত কোকিলের কূজন ও ভ্রমর-গুঞ্জন সহ ধরায় নামিয়া আসিলে, প্রকৃতি-রাণী নবপত্র-পুষ্পে সাজিয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। মলয় মারুতের স্পর্শ সকল জীবের প্রাণে এক নব-জীবনের সাড়া আনিয়া দিল। এই মনোরম কালে ফাল্গুনের ষষ্ঠ দিবস (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃঃ), বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ক্ষুদিরামের গৃহ আলো করিয়া চন্দ্রমণির গর্ভ হইতে এক সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। সেই দিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ জ্যোতির্লোকের এক ক্ষীণ আভা প্রকাশ করিয়া নীল গগনে হাসিমুখে উদিত হইয়াছিল।

চন্দ্রাদেবী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, এই সংবাদ রাত্রি প্রভাত হইতেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং গ্রামের নরনারী নবজাত শিশুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্ষুদিরামের কুটীরে আসিতে লাগিল। সুকুমার শিশুর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ৺গয়াধামে ৺গদাধরের পদচিহ্ন দর্শনের পর এই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ক্ষুদিরাম ইহার নাম রাখিলেন গদাধর।

বাল্যকথা

(১৮৩৬—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ)

ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠা ভগ্নী রামশীলার কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। কামারপুকুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত সিলিমপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত ভাগবৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, তিনি যথাকালে একটী পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রটীর নাম রামচাঁদ এবং কন্যা হেমাঙ্গিনী। রামচাঁদ পাঠ সাঙ্গ করিয়া মেদিনীপুরে মোক্তারি ব্যবসায় দ্বারা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, আর হেমাঙ্গিনী আশৈশব মাতুল ক্ষুদিরামের গৃহে লালিতা পালিতা হইয়া কামারপুকুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সিহোড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইলেন। ক্রমে তাঁহার রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম এবং রাজারাম নামে চারিটী পুত্র হয়। হেমাঙ্গিনী দেবীর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রাম পরবর্ত্তী কালে মাতুল গদাধরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরাম আপন ভাগিনেয় রামচাঁদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই কারণে তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর যাইতেন। রামচাঁদেরও মাতুলের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মাতুলের অভাবের কথা জানিতেন এবং তাঁহাকে সময়ে সময়ে আর্থিক সাহায্য করিতেন। এক সময়ে তিনি তাঁহাকে

নিয়মিত ভাবে মাসিক পনর টাকা করিয়া দিতেন। মাতুল-পুত্রের জন্ম সংবাদে রামচাঁদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নবজাত শিশুর দুগ্ধের নিমিত্ত একটী দুগ্ধবতী গাভী মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন। গদাধরের জন্য নানাদিক হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য আসিতে লাগিল। তাঁহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পিতামাতার একটুও ভাবিবার প্রয়োজন হইল না।

গদাধর যেমন শুক্লা দ্বিতীয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় রূপেগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সুঠাম অঙ্গাবয়ব ও রূপলাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গ্রাম্য রমণীগণ তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা প্রায়ই বালককে দেখিবার জন্য চন্দ্রাদেবীর কুটীরে আগমন করিত; সময়ের একান্ত অভাব হইলে, অতি অল্প সময়ের জন্য আসিয়াও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে চন্দ্রাদেবীর আত্মীয়া রমণীগণও তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন।

সেই সময়ে লাহা পরিবার কামারপুকুর গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। ক্ষুদিরাম দেরে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কামারপুকুরে আসিলে, লাহা পরিবারের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহা তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসের ইচ্ছা ও অর্থানুকূল্যে ষষ্ঠমাসে গদাধরের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল।

ক্রমে দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া একে একে ব্রাহ্মণ দম্পতীর চারি বৎসর কাটিয়া গেল ; গদাধর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রাদেবী আর একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন, তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে সর্ব্বমঙ্গলা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালক গদাধরের আকর্ষণী শক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা হাস্যময় থাকিত এবং তিনি চঞ্চলভাবে ইতঃস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দৃষ্টিমাত্রই সকলে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইত। ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যেই পুত্রের প্রখর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। গদাধর এই তরুণ বয়সেই সকল বিষয় অনায়াসে বুঝিতে ও শিক্ষা করিতে পারিতেন। পিতা অনেক সময়ে তাঁহার নিকট দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব ও প্রণাম-মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন এবং কখন কখন তাঁহাকে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প বলিতেন। গদাধর ঐ গল্প সমূহ সহজেই স্মরণ রাখিতে পারিতেন। একবার মাত্র শুনিলে, স্তোত্র ও প্রণাম মন্ত্রের আগাগোড়া তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। দীর্ঘকাল পরেও তিনি ঐ স্তবাদি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। গদাধরের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, ক্ষুদিরাম এই সময়ে তাঁহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

গ্রামের বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত লাহা বাবুদের বাড়ীর নাটমন্দিরে একটী পাঠশালা বসিত। প্রাতে কয়েক ঘণ্টা পড়িবার পর ছাত্রগণ স্নানাহারের নিমিত্ত বাড়ী যাইত এবং

পুনরায় অপরাহ্নে আরও দুই তিন ঘণ্টার জন্য পাঠশালায় সমবেত হইত। পাঠশালায় একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ ছোট বালকদিগকে পড়াইয়া শিক্ষক মহাশয়কে সাহায্য করিত।

গদাধরের বিদ্যারম্ভ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, ক্ষুদিরাম তাঁহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই গদাধর অন্যান্য বালকগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গেলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি নানারূপে তাহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু বন্ধুগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল।

এখন হইতে গদাধর দিবসের অধিকাংশ সময় বন্ধুগণের সঙ্গেই থাকিতেন। বালকের বুদ্ধি ও অনুকরণ-শক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যখনই গ্রামের কোন স্থানে যাত্রাগান অথবা পুরাণ পাঠাদি হইত, তিনি বন্ধুগণ সহ সেখানে উপস্থিত হইতেন। যাত্রা দেখিবার সময় তিনি প্রত্যেকটী অভিনেতার কথাবার্ত্তা, অঙ্গভঙ্গিও হাবভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং যাত্রার চরিত্র সমূহ সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। একবার মাত্র দেখিয়াই তিনি অদ্ভুত কুশলতার সহিত যে কোন চরিত্র অভিনয় করিতে পারিতেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং অসাধারণ অনুকরণ ক্ষমতা তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

পাঠশালায় যাইয়া গদাধর অল্পকাল মধ্যেই পড়াশুনায় কতকটা অগ্রসর হইলেন। তিনি বেশ লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। কিন্তু অঙ্ক কষিতে তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। অঙ্কের প্রতি তাঁহার এই বিদ্বেষ চিরকাল সমান ভাবে ছিল। শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে কখনও অঙ্ক কষিতে বলিলে, তিনি বসিয়া বসিয়া শ্লেটের উপর দাগ কাটিতেন অথবা দেব দেবীর নাম লিখিতেন।

এই সময়ে গদাধর কখন কখন গ্রামের কুম্ভকারদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের মূর্ত্তিগড়া দেখিতেন এবং নিজেও তাহা অভ্যাস করিতেন। এই ভাবে মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়া তিনি নিজ হাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতেন এবং খেলার ছলে বন্ধুগণ সহ ঐ সকল মূর্ত্তি পূজা করিতেন। গ্রামের চিত্রকর-দিগকে চিত্রাঙ্কন করিতে দেখিয়া তিনি ছবি আঁকিতেও শিখিয়াছিলেন।

কামারপুকুর গ্রামে বহু পুষ্করিণী ছিল। তন্মধ্যে তিন চারিটী খুব বড় এবং অনেক গুলিই পদ্মবনে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যহ এই পুষ্করিণী সমূহে অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়া চমৎকার শোভা ধারণ করিত। ক্ষুদিরামের গৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হালদার পুকুরই গ্রামের সব চেয়ে বড় পুকুর। উহার নিকটেই ভূতিরখাল। ভূতিরখাল ও বুধুইমোড়ল গ্রামের মধ্যে দুইটী শ্মশান। উহারা যথাক্রমে গ্রামের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। শ্মশান দুইটী, যুবক,

বৃদ্ধ ও বালক সকলের প্রাণেই ভয়ের সঞ্চার করিত। কিন্তু ষষ্ঠবর্ষীয় বালক গদাধর অনেক সময়ে এই স্থানদ্বয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; তাঁহার প্রাণে ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না।

ভূতিরখালের কিছু পশ্চিমে, গ্রামের নিকটেই একটী বিস্তৃত আম-বাগান ছিল। ভূরস্থবো গ্রামের ধনাঢ্য জমিদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সত্বাধিকারী ছিলেন। ভূরস্থবো কামারপুকুর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। জমিদার মাণিক, রাজার ন্যায় দান দক্ষিণা করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে মাণিক রাজা বলিত। গ্রামের গোচারণ ভূমিটী আম বাগানের পার্শ্বেই ছিল। এই আম-বাগান রাখাল বালকদিগকে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ হইতে রক্ষা করিত বলিয়া, স্থানটী তাহাদের বড়ই প্রিয় ছিল।

গদাধর পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিয়মিত ভাবে পড়িতে যাইতেন না। পাঠশালায় না যাইয়া কখন কখন তিনি রাখাল বালকদের সহিত মাণিক রাজার আম বাগানে চলিয়া যাইতেন এবং সারাদিন খেলাধূলা করিয়া তাহাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেন। সর্ব্বদাই তিনি ক্রীড়া-কৌতুকের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন। মধ্যে মধ্যে গদাধর বন্ধুগণকে লইয়া পিতামাতার অজ্ঞাতসারেই যাত্রাগান শুনিবার নিমিত্ত গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন।

গদাধরের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার অনেক সময়ে ক্ষুদিরামের চিন্তার কারণ হইত। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাব লক্ষ্য করিয়া

বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কটু কথা বলিয়া তাঁহাকে সংশোধন করা অসম্ভব। তজ্জন্য তিনি মধুর বাক্যে বালককে শাসন করিতেন। গদাধরও তাহাতে সহজেই শান্ত হইতেন। বালক সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছামত কাজ করিলেও তাঁহার সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ সকলকে মুগ্ধ করিত। অধিকন্তু কার্য্য-কুশলতা ও বন্ধুগণের উপর প্রভাব তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দান করিত। কাজেই ক্ষুদিরাম বালকের চঞ্চল স্বভাবকে তেমন দূষণীয় মনে করিতেন না, বরং তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রাণে উচ্চ আশা পোষণ করিতেন।

গদাধরের পাঠশালা প্রবেশ কালে যদুনাথ সরকার শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। অল্পকাল পরেই রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইলেন। গদাধরের সরলতা, সত্যবাদিতা ও মধুর ব্যবহারে তিনিও পিতা ক্ষুদিরামের ন্যায় তাঁহার বালসুলভ চপলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতেন না; পরন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যে একবার বালকের সংস্পর্শে আসিত, সে-ই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। ফলতঃ বন্ধুবর্গ ও গ্রামবাসিগণ যে কোন বিষয়ে গদাধরকে সঙ্গী রূপে পাইলে আহ্লাদিত হইত।

ভূরসুবো গ্রামের মাণিক রাজা ও তাঁহার ভাই শ্রীযুক্ত রামজয়, ক্ষুদিরামের সরল ও মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম বন্ধুদ্বয়কে

দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ভূরসুবো গমন করিতেন। একদিন সেখানে যাইবার সময় তিনি গদাধরকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মাণিক ও রামজয় বালককে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বালকের কথাবার্ত্তা, হাবভাব ও চালচলন অল্প সময়েই তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিল। অতঃপর ভূরসুবো গমন কালে বালককে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা বন্ধুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ক্ষুদিরাম ভূরসুবো যাইতে পারিলেন না। এদিকে মাণিক রাজাও তাঁহার ভ্রাতা দীর্ঘকাল বালককে দেখিতে না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গদাধরকে ভূরসুবো লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা এক দিবস জনৈকা রমণীকে কামারপুকুরে প্রেরণ করিলেন। বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে ক্ষুদিরাম বালককে ঐ রমণীর সহিত ভূরসুবো পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন গদাধর সমস্ত দিবস মাণিক রাজার বাড়ীতেই রহিলেন। তাঁহার সঙ্গসুখ লাভে শ্রীযুত মাণিক, রামজয় ও অন্যান্য সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া বালককে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইলেন এবং অপরাহ্নে তাঁহাকে বিবিধ সোণার অলঙ্কারে সাজাইয়া পুনরায় কামারপুকুরে পাঠাইয়া দিলেন।

কোমল বয়সেই বালক গদাধর ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। কখন কখন তাঁহার মন জাগতিক বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে প্রবেশ করিত।

বালকের সুস্থ ও সবল শরীর-মন তাঁহাকে সর্ব্বদা যেরূপ আনন্দে ভরপূর করিয়া রাখিত, তদ্রূপ সুনীল আকাশ, হরিৎ প্রান্তর, বিহঙ্গের কাকলী, তটিনীর কুলুকুলু ধ্বনিও তাঁহার প্রাণে এক অভাবনীয় আনন্দের সঞ্চার করিত। প্রকৃতির সংস্পর্শে তাঁহার চিত্ত ক্ষণকাল মধ্যে সমাহিত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিত। একদা বন্ধুগণের সহিত প্রান্তর মধ্যে বিচরণ কালে গদাধর আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে মেঘখণ্ড সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সেই সময়ে এক ঝাঁক অতি শুভ্র বক ঐ দিকে উড়িয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণ মেঘের কোলে বলাকা শ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা তাঁহার মনকে নিমেষ মধ্যে সমাহিত করিল। বালক সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সহসা তাঁহাকে ঐরূপে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সঙ্গী বন্ধুগণ ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল তাহারা নিরুপায় হইয়া বালকের পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল এবং তাঁহাকে বহন করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। শীঘ্রই গদাধর চেতনা লাভ করিলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

গদাধরের পিতামাতা এই ব্যাপারে বালকের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ক্ষুদিরাম ভাবিলেন, পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রাদেবী অন্যরূপ ধারণা করিলেন। তাঁহার মনে হইল উপদেবতার আবেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা কিছুকালের জন্য বালকের পাঠশালা গমন বন্ধ রাখিয়া তাঁহার

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সময়ে গদাধর দিবসের অধিকাংশ সময় গৃহে অবস্থান করিতেন বলিয়া পল্লীরমণী ও বালক-বালিকাগণ সকল সময়েই তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইত। গদাধর তাহাদের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ

(১৮৪২ খৃঃ)

১২৪৯ সালে ক্ষুদিরাম আটষট্টি বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। আজীবন নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করায়, তিনি রোগজনিত শারীরিক কষ্টের সহিত মোটেই পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু এখন তিনি রোগ ও জরার প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহার সুগঠিত দেহ দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। প্রথমে অজীর্ণ রোগ দেখা দিল; ক্রমে উহা গ্রহণীতে পরিণত হইল।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ প্রতি বৎসর শরৎ কালে নিজ বাটী সিলিমপুরে শ্রীদুর্গামাতার অর্চ্চনা করিতেন। ভাগিনেয়ের আমন্ত্রণে মাতুলও প্রায়ই ৺পূজার সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতেন। এ বৎসরও যথাকালে পূজার নিমন্ত্রণ আসিল। ৺পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে ক্ষুদিরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে সঙ্গে লইয়া সিলিমপুরে গমন করিলেন। মাতুল ও ভ্রাতাকে পাইয়া রামচাঁদ পরম আহ্লাদিত হইলেন।

সিলিমপুর আগমনের পর ক্ষুদিরামের গ্রহণী রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। রীতিমত চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগ যন্ত্রণার একটুও উপশম হইল না। ক্রমে ৺পূজার দিন আসিয়া পড়িল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস আনন্দ-উৎসবেই কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে ক্ষুদিরামের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল ; চিকিৎসকগণ ও বাড়ীর লোকেরা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। রামকুমার ও তাঁহার ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দিবারাত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। শোকের ঘনকৃষ্ণ ছায়া পরিবারকে সমাচ্ছন্ন করিল।

৺পূজা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই রামচাঁদ ব্যস্ত হইয়া মাতুলের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মাতুলকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মামা অন্তিম কালে ৺রঘুবীরকে স্মরণ করুন"। ৺রঘুবীরের নাম কর্ণে প্রবেশ করিতেই ক্ষুদিরাম চেতনা লাভ করিলেন। তিনি শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে উঠিয়া বসিলেন এবং তিন-বার ৺রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ক্ষুদিরামের আত্মা অমর ধামে চলিয়া গেল, তাঁহার 'ক্ষুদ্র আমি' 'বিরাট আমিতে' লয়প্রাপ্ত হইল। ক্ষুদিরাম চিরশান্তি লাভ করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ কামারপুকুরে প্রেরিত হইল। সহসা ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে পরিবারের সকলেই শোকে মুহ্যমান হইলেন। বিশেষতঃ বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবী এবং বালক গদাধর প্রাণে বিষম আঘাত পাইলেন; তাঁহাদের দুঃখের অবধি রহিল না।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার যথাকালে পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রামচাঁদ ভ্রাতাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্ষুদিরামের অবর্ত্তমানে পরিবারের সকল দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের স্কন্ধে পতিত হইল। চন্দ্রাদেবী আজীবন সুখদুঃখের সাথী প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারাইয়া একাকী জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা জ্ঞান করিলেন; তিনি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া অনুক্ষণ ৺রঘুবীরের চিন্তায় ডুবিয়া রহিলেন। বুদ্ধিমতী রামকুমার-পত্নী শ্বশ্রূমাতার কষ্ট বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্য প্রায় সকল গৃহকার্য্যই নিজে করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে চন্দ্রাদেবী পুনরায় ৺রঘুবীরের সেবাপূজা এবং বালক গদাধর ও শিশুকন্যা সর্ব্বমঙ্গলার রক্ষণাবেক্ষণে মন দিলেন। সাত বৎসরের বালক গদাধর এত কাল পিতার সহবাসে দিনের অধিকাংশ সময় আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে গদাধরই সব চেয়ে বেশী দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিকট অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐরূপ করিলে চন্দ্রাদেবীর শোকের

মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে। বালক প্রাণে প্রাণে পিতার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলে সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং সংসারের অনিত্যতা ও চরম পরিণতি-চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

কৈশোরের পথে

(১৮৪৩—৪৮)

বর্দ্ধমান সহর কামারপুকুর হইতে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে। বর্দ্ধমান হইতে ৺পুরীধাম গমনের পথ কামারপুকুর গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ৺জগন্নাথ দর্শনার্থী সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রিগণ ঐ রাস্তায় ৺পুরীধামে গমন করিতেন। এই সকল তীর্থযাত্রীর সুবিধার নিমিত্ত, লাহা বাবুরা গ্রামের সন্নিকটে, ঐ রাস্তার পার্শ্বে, একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ৺পুরী যাতায়াতের পথে শ্রান্ত পথিকগণ ঐ অতিথিশালায় দুই এক দিবস বিশ্রাম করিয়া যাইত। সাধু-সন্ন্যাসিগণ কখন কখন এখানে দীর্ঘকালও অবস্থান করিতেন। দেবতুল্য পিতার সঙ্গলাভে বঞ্চিত, সংসার-বিতৃষ্ণ গদাধর মধ্যে মধ্যে ঐ সকল সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি অনেক সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন এবং কখন কখন তাঁহাদের নিমিত্ত জল, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা বালকের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন

এবং নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া দেবতার প্রসাদ ভোজন করাইতেন।

ইতিপূর্ব্বেই গদাধর পুরাণের গল্প হইতে জগতের অসারতা ও অনিত্যতার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। সহসা পিতার মৃত্যুতে তিনি উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। তিনি পুরাণমুখে সাধু-সন্ন্যাসিগণের গৃহত্যাগ, অদ্ভুত তপস্যা এবং নিস্পৃহ শান্তিময় জীবনের কথাও শুনিতে পাইয়াছিলেন। ত্যাগপূত জীবন অনন্ত শান্তির আকর ও মুক্তির হেতু, ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কাজেই সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন পাইলে তিনি তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া ভগবদ্‌বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। গদাধরের আট বৎসর বয়সে কয়েক জন সাধু, লাহা বাবুদের অতিথিশালায় আগমন করেন। বহুকাল ভ্রমণের পর ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা পথশ্রম দূর করিবার জন্য এখানে কিছু অধিক কাল বাস করেন। গদাধর ইঁহাদের সহিত কয়েক দিন মধ্যেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া গেলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ ইঁহাদের জন্য জল, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সাধুগণও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সাধুদের সহিত গদাধরের ঘনিষ্ঠতা এত বাড়িয়া গেল যে তিনি প্রায় সমস্ত দিবস তাঁহাদের সহবাসেই কাটাইতেন। এমন কি কোন কোন দিন তিনি আহারের নিমিত্তও গৃহে ফিরিতেন না, সাধুদের সঙ্গেই ভোজন করিতেন।

বালক গদাধরের অন্তরে পরিণত বয়স্ক সাধুদের ন্যায় প্রবল ধর্ম্মভাব দেখিয়া, সাধুরা আমোদচ্ছলে আদর করিয়া একদিন তাঁহাকে নাগা সাধুর বেশে সাজাইয়াছিলেন। শিশু গদাই ইহাতে পরম আনন্দিত হইয়া, মাতাকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব বেশ দেখাইবার জন্য, ভস্মমাখা দেহে, কৌপীনমাত্র পরিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াইল। গদাধরের এইরূপ ব্যবহারে চন্দ্রাদেবীর হৃদয় আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে সাধুদিগের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন। গদাধর পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি কখনও মাতাকে অসন্তুষ্ট করিতেন না, বরং সকল সময়েই তাঁহার কথামত চলিতেন। কিরূপে মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় তিনি সাধুদের নিকট যাইবেন, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, গদাধর মাতার অনুমতি লইয়া সাধুদিগকে একবার মাত্র শেষ-দর্শন করিতে গেলেন এবং তাঁহাদের নিকট মাতার ভয়ের কথা বলিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ চন্দ্রাদেবীর কুটীরে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কোন সন্ন্যাসীই এত অল্প বয়স্ক বালককে গৃহত্যাগের পরামর্শ দিবেন না। তাঁহাদের কথায় চন্দ্রা নিশ্চিন্ত হইলেন। গদাধর আবার সাধুদের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহবাসে বালক পিতার অভাব অনেকটা ভুলিয়া গেলেন।

কামারপুকুর হইতে এক ক্রোশ উত্তরে আমুড় নামে একটী গ্রাম আছে। সেখানকার গ্রাম্যদেবতা ৺বিশালাক্ষী দেবী

অত্যন্ত জাগ্রতা বলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রসিদ্ধি ছিল। একদা কামারপুকুরের একদল রমণী ৺বিশালাক্ষী দেবীর পূজা-মানসে আনুড় যাত্রা করিলে গদাধরও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। একটী বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া আনুড় গ্রামে যাইতে হয়। ঐ মাঠ পার হইবার সময় রমণীগণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেবীর প্রীতি-কামনায় উচ্চকণ্ঠে গান ধরিলেন। গদাধরের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল; তিনিও তাঁহাদের সহিত সঙ্গীতে যোগদান করিলেন। শীঘ্রই বালক দেবীর ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন এবং নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহাকে পথিমধ্যে অচল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, রমণীগণ অত্যন্ত ভীতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ব্যাধির প্রভাবে ঐরূপ ঘটিয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা গদাধরের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন নিকটস্থ পুকুর হইতে জল আনিয়া তাঁহার মস্তকে সেচন করিতে লাগিলেন; অন্যেরা ব্যজনে রত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, বালক চেতনা লাভ করিলেন না। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা কন্যা ভক্তিমতী প্রসন্নময়ীও ঐ রমণীগণের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার মনে হইল, দেবীর চিন্তায় বিভোর হওয়ায় গদাধর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং দেবীর নাম উচ্চারণ দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইবে। অতএব বালকের আরোগ্য কামনায় তিনি বার বার ৺বিশালাক্ষী দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া দেবীর চরণে কাতর প্রার্থনা

জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে সঙ্গিনী রমণীগণও প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। অচিরেই শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর বুদ্ধি সুফল প্রদান করিল। বালকের মধুর হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইল; তিনি শীঘ্রই চেতনা লাভ করিলেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তৎপর রমণীগণ নিশ্চিন্ত মনে আনুড়ে যাইয়া যথারীতি দেবীর পূজা সমাপন পূর্ব্বক কামারপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর নিকট গদাধরের ভাবাবেশের কথা শুনিয়া, চন্দ্রাদেবী এইবারও বিশেষ ভাবিতা হইলেন। 'দেবীর ভাবে তন্ময় হইয়া ঐ কালে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন' বালক এইরূপ বলা সত্বেও মাতা কিছুতেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বায়ুর প্রাবল্যে অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহার ঐরূপ ঘটিয়াছে। চন্দ্রাদেবী পুত্রের কল্যাণার্থে কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশ্যেও পূজা মানৎ করিলেন।

এখন হইতে গদাধর বয়স্যগণ সহ গ্রাম মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং মধুর আলাপ, সঙ্গীত ও হাস্য-কৌতুকে সকলকে আনন্দ দান করিতেন। গ্রাম্য রমণীগণও ফল মিষ্টান্নাদি যখন যাহা পাইতেন, গদাইকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। গদাধরের বন্ধুপ্রীতির তুলনা ছিল না; তিনি কখনও বন্ধুগণকে ফেলিয়া ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

গদাধর নবম বর্ষ অতিক্রম করিতে চলিলেন। বালকের উপনয়ন-কাল সমাগত দেখিয়া, রামকুমার তাঁহার উপবীত দানের আয়োজন করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে একটী বাধা উপস্থিত হইল। গদাধরের জন্ম কালে গ্রামের কামার-কন্যা 'ধনী' চন্দ্রাদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। ধনী গদাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে ফল মিষ্টান্নাদি আহার করাইত। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই গদাই তাহার সেবা ও যত্নের মধ্য দিয়া এত বড় হইয়াছে। ধনীর একান্ত ইচ্ছা গদাধরের উপনয়ন কালে তাঁহার ভিক্ষামাতা হয়। কিন্তু তাহার নীচজন্ম নিজ মনোবাসনা পূরণের প্রতিবন্ধক হইতে পারে ভাবিয়া, বুদ্ধিমতী ধনী পূর্ব্ব হইতেই গদাধরকে ঐ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিল। ধনী যেরূপ ভাবিয়াছিল কার্য্যতঃ তদ্রূপই ঘটিল। উপনয়নের পূর্ব্বে গদাধর ধনীর নিকট নিজ প্রতি-শ্রুতির কথা রামকুমারকে জানাইলেন। বংশের প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া বালক নীচ জাতীয়া রমণীকে ভিক্ষামাতা পদে বরণ করিবে, ইহা রামকুমারের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইল। তিনি কনিষ্ঠের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে এই অন্যায় আব্দার পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন।

গদাধরের পক্ষে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্যরূপ আচরণ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমতেও নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা বিষয়ে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। অন্যদিকে তাঁহার পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস লাহাও তাঁহাকে সমর্থন

করিয়া বলিলেন, "শূদ্রা রমণীকে ভিক্ষামাতা পদে বরণ করা, ব্রাহ্মণ সমাজে একেবারে অপ্রচলিত নহে"। গদাধরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার সকল আয়োজন পণ্ড করিতে বসিয়াছে লক্ষ্য করিয়া, অবশেষে রামকুমার নিরুপায় হইয়া তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। গদাধরের উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইল; তাঁহার ভিক্ষামাতা হইয়া ধনীর আনন্দের সীমা রহিল না।

উপরি-উক্ত ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, বাল্যকাল হইতেই সত্যের প্রতি গদাধরের কিরূপ নিষ্ঠা ছিল। উপনয়নের পর গদাধরের চরিত্রে দেবভাব স্ফূর্ত্তির বিশেষ সুযোগ ঘটিল। পূজার অধিকার লাভ করিয়া তিনি স্বয়ং গৃহদেবতা ৺রঘুবীর, ৺শীতলাদেবী ও ৺রামেশ্বর শিবের পূজার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ পিতাকে একাসনে অনেক ক্ষণ পূজা ও ধ্যান করিতে দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মন উহাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখন তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন ও মাল্যরচনা করিয়া, ভক্তিমাখা সুরে দেবদেবী বিষয়ক গান গাহিতে গাহিতে, পূজার আসন গ্রহণ করিতেন। পূজাকালে তাঁহার মন বাহিরের জগৎ ছাড়িয়া দেবতার চিন্তায় বিভোর হইয়া যাইত, চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে, সেই বিষয়ে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য থাকিত না। পূজা শেষ করিয়া গদাধর ধ্যানে বসিতেন এবং তাঁহার মন ক্রমশঃ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিত। ফলে তিনি কখন কখন

ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি সমূহের দর্শন পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

সীতানাথ পাইন নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি কামারপুকুর গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথের বাড়ীতেই গদাধর তৃতীয় বার ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। কামারপুকুরে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, যাবতীয় পর্ব্বই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। উদারচেতা গ্রামবাসিগণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ঐ উৎসব সমূহে যোগদান করিত। একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে পাইন মহাশয় গ্রামবাসীর অনুরোধে নিজ বাটীতে যাত্রাগানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যাত্রার বিষয়টীও শিবসম্বন্ধীয়ই ছিল। সমস্ত দিবস শিব-সঙ্গীত ও শিব-প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল এবং যাত্রাগান আরম্ভের সময় আসিল; কিন্তু যাহার শিব সাজিবার কথা ছিল, সে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল। এত অল্প সময়ের মধ্যে লোক যোগাড় করা সম্ভব নয়। তজ্জন্য সেই রাত্রিতে গানের সকল আয়োজন পণ্ড হওয়ার উপক্রম ঘটিল। গদাধরের অভিনয়-কুশলতার কথা গ্রামের সকলেই জানিত। তাহারা অবিলম্বে তাঁহার নিমিত্ত লোক পাঠাইল।

রাত্রিতে শিবপূজা করিবার জন্য গদাধর পরম উৎসাহে দিনের বেলায় পূজার সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার পর পূজার আসন গ্রহণ করিয়া তিনি সবেমাত্র প্রথম প্রহরের পূজা সাঙ্গ করিয়াছেন, এমন সময়ে

গয়াবিষ্ণু প্রমুখ তাঁহার বন্ধুগণ গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যাত্রাগানে শিব সাজিবার জন্য ডাকিতে আসিল।

প্রথমতঃ গদাধর শিবপূজা ছাড়িয়া যাত্রাগানে যোগ দিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু বন্ধুগণের যুক্তি ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, অভিনয়ে শিব সাজিলেও তাঁহার শিব-চিন্তার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। গদাধরের সম্মতি পাইয়া সীতানাথ ও অন্যেরা নিশ্চিন্ত হইলেন।

গদাধর শিব সাজিবার নিমিত্ত সীতানাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুগণ প্রাণের উল্লাসে তাঁহাকে জটা, ত্রিশূল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও বিভূতি দ্বারা উত্তম রূপে সাজাইয়া কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আঁকিয়া দিল। জটাত্রিশূল-ধারী গদাধরকে সাক্ষাৎ ত্রিপুরারির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। যথাকালে কয়েক জন বয়স্য তাঁহাকে আসরে পৌঁছাইয়া দিল। দেবাদিদেবের চিন্তায় বিভোর গদাধর আসরে উপস্থিত হইবামাত্র বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। শিবগত-প্রাণ গদাধরকে এইরূপে দাঁড়াইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পর তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গির প্রশংসা করিতে লাগিল। বালক কিছুক্ষণ যাবৎ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অথচ অভিনয় করিতেছে না দেখিয়া, যাত্রাদলের অধিকারী ও কয়েক জন বয়স্ক লোক তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইলেন। সে সংজ্ঞা

হারাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে আসরের বাহিরে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে তাঁহারা অচৈতন্য অবস্থায়ই গদাধরকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। যাত্রার পালা ওখানেই শেষ হইয়া গেল। বালক সমস্ত রাত্রি সংজ্ঞাহীন থাকিয়া পর দিন সকাল বেলা চৈতন্য লাভ করিল।

এই কালে একদা গ্রামের লাহা বাবুদের বাড়ীতে কোন শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে গদাধর বয়স্যগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গী বালকেরা ঐ তর্কের কিছুই বুঝিতে না পারায় হাস্য-কৌতুকে রত হইল। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতগণের প্রত্যেকটী কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ আলোচনার পরেও প্রশ্নটীর মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া, গদাধর সভা মধ্যে দাঁড়াইয়া অতি সহজ ও সরল ভাষায় উহার সমাধান করিয়া দিলেন। কোমল-মতি বালকের নিকট এইরূপ একটী জটিল প্রশ্নের সরল মীমাংসা লাভ করিয়া পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইলেন এবং উহা একবাক্যে মানিয়া লইয়া বালককে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা আমাদিগকে খৃষ্টাবতার ঈশার বাল্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। একদা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক যীশু জেরুজালেমস্থ জিহোভার

মন্দিরে পণ্ডিত-মণ্ডলী সম্মুখে দাঁড়াইয়া বালকের ভাষায় ধর্ম্ম-বিষয়ক বহু জটিল প্রশ্নের অতি সরল মীমাংসা প্রদান করিয়াছিলেন।

রামকুমারের বাটীত্যাগ

(১৮৪৮—৪৯)

ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে বসতি করার ছয় বৎসর পরে, ১২২৬ সালে রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিবাহ হইয়াছিল। রামেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা বর্ত্তমানে বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদের বিবাহও সম্পন্ন হইল। রামকুমার দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বিবাহ করিলেও এযাবৎ তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। তাঁহার প্রৌঢ়া পত্নী ৩৬ বৎসর বয়সে এক সুকুমার শিশুপুত্র প্রসবান্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিবারের সকলেই শোকে অভিভূত হইল।

রামকুমারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও কিছুকাল যাবৎ আশা-নুরূপ অর্থাগম হইতেছিল না। রামেশ্বর পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উপার্জ্জন-ক্ষম হন নাই। অথচ পরিবারের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। কাজেই সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা রামকুমারের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি সহসা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি বিচলিত ও হতাশ হইলেন। রামকুমারের পত্নী গৃহকর্ম্মে চন্দ্রাদেবীর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন; তাঁহার অভাবে

চন্দ্রমণি বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় সমুদয় গৃহকর্ম্ম ও দেব-সেবার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্তু রামকুমারের নবজাত শিশুপুত্র অক্ষয়কে তাঁহারই লালন-পালন করিতে হইত। চন্দ্রা বিষম বিপদে পড়িলেন; দিবসের মধ্যে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও অবসর রহিল না।

পরিবার পোষণের চিন্তায় বিব্রত রামকুমার ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। সহরে গমন করিলে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন ভাবিয়া, তিনি স্থির করিলেন, কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন। অতঃপর রামকুমার এক শুভদিনে বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেখানে ঝামাপুকুর পল্লীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রামকুমার জ্যোতিষ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; শীঘ্রই তিনি নিজ বাসস্থানে একটী টোল স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে উক্ত বিষয় দুইটী পড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন রামকুমার কলিকাতায় যাইয়া প্রথম তিন চারি বৎসর আহিরীটোলায় নাথের-বাগানে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কয় বৎসর তাঁহার টোলটীও সেখানেই ছিল।

এদিকে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গত দুই বৎসর তিনি গৃহ-দেবতার সেবা, পূজা ও ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন। এখনও তিনি পাঠশালায় যান; কিন্তু উহা কেবলমাত্র বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিলেও চলে। বঙ্গভাষায় তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। এই

কালে তিনি রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থ এবং ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি উপাখ্যান সুন্দর রূপে পাঠ করিতে পারিতেন। তাঁহার পাঠ শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইত। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে নিজ নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠ ও কথকতা শ্রবণ করিত। বালকেরও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে বিশেষ আগ্রহ ছিল ; তিনি পাঠের নিমিত্ত কয়েকখানি পুস্তক নিজেই লিখিয়া লইয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার হস্ত-লিখিত দুই একখানা পুথি বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রামকুমারের কলিকাতা গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর সকল দায়িত্ব মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের স্কন্ধে পতিত হইল। রামেশ্বর সর্ব্বদাই সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন ; গদাধরের গতিবিধি ও শিক্ষাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইতেন না। সুতরাং গদাধর স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার একটুও মনোযোগ ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে সকল সময় অনবরত গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া তিনি প্রাণে ব্যথা পাইতেন। তজ্জন্য তিনি অনেক সময় গৃহে থাকিয়া মাতার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। গদাধরের পাঠাদি শুনিয়া পল্লী-রমণীগণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীর কাজ শেষ করিয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে চন্দ্রাদেবীর কুটীরে মিলিত হইতেন। গদাধরও তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে আনন্দ দান করিতে প্রয়াস পাইতেন। কখনও তিনি তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ

করিতেন, কখন বা তাঁহাদের সহিত হাস্য-কৌতুকে রত হইতেন, আবার কখনও মধুমাখা সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের মন ভক্তিভাবে পরিপ্লুত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিষণ্ণ দেখিলে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইত এবং তিনি কৌশলে তাঁহার বিষাদ-ভার দূর করিতেন। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ উক্তিতে উপস্থিত রমণীগণের মধ্যে হাসির তুফান ছুটিত এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিষণ্ণ ব্যক্তির অন্তরের সকল দুঃখ দূর হইত। তিনি সময়োপযোগী ভাব অবলম্বনে অতিশয় তৎপর ছিলেন; ইচ্ছামাত্র যে কোন ভাব অবলম্বন করিতে পারিতেন। সতত হাস্য-কৌতুক পরায়ণ এবং চঞ্চল-স্বভাব হইলেও তাঁহার প্রকৃতি যুগপৎ অসাধারণ গম্ভীর ছিল। প্রয়োজন মাত্রই তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন।

যৌবনে পদার্পণ

(১৮৪৯—৫২)

সেই সময় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সঙ্গীত চর্চ্চার নানা প্রকার ব্যবস্থা ছিল। কামারপুকুর গ্রামেও কয়েকটী যাত্রা এবং বাউল প্রভৃতি সঙ্গীতের দল ছিল। গদাধর নানা উপলক্ষে তাহাদের অভিনয়াদি দর্শন করিতেন এবং যাত্রার চরিত্র সমূহ অবিকল অনুকরণ করিতে পারিতেন। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে

কোনও চরিত্র অনুকরণে নিযুক্ত হইলে দর্শকগণ তাঁহার অভিনয়-কৌশল লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইত। কামারপুকুরের ধনাঢ্য গৃহস্থ সীতানাথ পাইনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সুবৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত সীতানাথ, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই গদাধরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা প্রায়ই বালককে বাটীতে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পাঠ, সঙ্গীত ও হাস্য-কৌতুক শ্রবণ করিতেন। গ্রামের রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা চন্দ্রাদেবীর কুটীরে যাইবার সুযোগ পাইতেন না, তাঁহারা পাইন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বালকের পাঠ ও সঙ্গীতাদিতে যোগদান করিতেন।

স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিতেও গদাধর তৎপর ছিলেন। স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইলে, কেহই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কখন কখন বালক কৌতুক করিয়া, গ্রাম্য বধূর বেশে মাথায় ঘোমটা দিয়া, কলসী-কাঁখে হালদার পুকুরে গমন করিত। তাহার বধুবেশ এরূপ স্বাভাবিক হইত যে, চির-পরিচিত গ্রামবাসিগণও তাহাকে বালিকা-বধূ বলিয়া ভ্রম করিত। গদাধর অবিকল ভাবভঙ্গি ও নিপুণতার সহিত ক্রমান্বয়ে কোন পালার বিবিধ চরিত্র সমূহও অভিনয় করিতে পারিতেন।

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলের হৃদয়েই গদাধরের চরিত্রের প্রভাব সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা

বেলা গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকগণ ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য কোন স্থানে মিলিত হইত। গদাধর মধ্যে মধ্যে ঐ সকল স্থানে যাইয়া নিজ স্বভাব-সুলভ মধুর আলাপ, সঙ্গীত ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সকলের প্রাণে আনন্দ দান করিতেন। তাঁহার মধুর আবৃত্তি, সরল ও উদার শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং ভক্তিপূত সঙ্গীত উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনকে ভগবদ্‌ভাবে উল্লসিত করিত। তাঁহারা এককালে সংসারের সকল দুঃখতাপ ভুলিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন।

সীতানাথ পাইনের প্রতিবেশী দুর্গাদাস পাইন বড় অহঙ্কারী লোক ছিলেন। অবরোধ প্রথার উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং তিনি নিজে সকল সময়ে ঐ প্রথা অনুসরণ করিতেন। তাঁহার পরিবারের রমণীগণকে তিনি বাটীর বাহিরে যাইতে দিতেন না। বয়স্ক বালক গদাধর যে সীতানাথের বাড়ীতে সকল সময়ে স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করিতেন, ইহাও তাঁহার পছন্দ হইত না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে দুর্গাদাসের অভিমত জানিতে পারিয়া, একদিন গদাধর তাঁহাকে বলিলেন, রমণী-গণকে কেবলমাত্র অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই তাহারা সচ্চরিত্র হয় না। পরন্তু, উপযুক্ত শিক্ষা ও ভগবদ্‌বিশ্বাস সহায়েই তাহাদের চরিত্র মহৎ হইয়া থাকে। দুর্গাদাস ইহা স্বীকার করিলেন না, বরং গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিলেন, তিনি আজীবন অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী এবং ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়া চিরকালই সুফল লাভ করিয়াছেন। কোন বাহিরের লোক

তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলতঃ কেহ কখন তাঁহার পরিবারের রমণীগণকে দেখিতে পায় না। দুর্গাদাসের অহঙ্কারপূর্ণ বাক্য শুনিয়া গদাধর বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাইবে, একথা কতদূর সত্য"।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুর্গাদাস নিজ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক যুবতী রমণী সেখানে উপস্থিত হইয়া রাত্রির জন্য তাঁহার গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করিল। রমণীর মুখে ঘোমটা ছিল, আর হাতে একটী চুবড়ি। দুর্গাদাস তাহার সহিত আলাপে বুঝিতে পারিলেন, রমণী জাতিতে তন্তুবায়, সূতা বিক্রি করিবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কামারপুকুরের বাজারে আসিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গিগণ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়ায়, রাত্রিতে একাকী বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি তাহাকে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিতে বলিলেন। যুবতী দুর্গাদাসকে প্রণাম জানাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার বিনীত ব্যবহারে দুর্গাদাসের স্ত্রী ও কন্যাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই রাত্রির জন্য আশ্রয় দান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা তাহাকে জলযোগের নিমিত্ত কিছু মুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে যুবতী বাড়ীর প্রত্যেকটী স্ত্রীলোকের চালচলন উত্তম রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেও ছাড়িল না।

রজনী প্রথম প্রহর অতীত হইতে চলিয়াছে, এমন সময়ে অন্ধকার ও নীরবতা ভেদ করিয়া এক উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর দূরান্তরে ধ্বনিত হইল। ঐ দিবস বালক গদাধর তখনও গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই বলিয়া চন্দ্রাদেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন। রামেশ্বর তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন এবং এদিকে ওদিকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন। শীঘ্রই দুর্গাদাসের বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর আসিল, 'দাদা গো, যাচ্ছি'। মুহূর্ত্ত মধ্যে গদাধর মাথার কাপড় ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে দুর্গাদাসের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাদের বাড়ীর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, রমণী গদাধর ভিন্ন আর কেহই নয়। দুর্গাদাস বালকের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন ভাবিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বালকের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোধের উপশম হইলে বালককে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের অহঙ্কার চূর্ণ হইল এবং অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার কুসংস্কার দূর হইল।

গদাধর ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলেন। এই বয়সেই তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি এতদূর বিকশিত হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে গ্রামের নরনারীগণ সংশয়ে পতিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। গদাধর অনেক কাল বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু পুথিগত বিদ্যা লাভে

তিনি ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি কখনও পাঠশালার পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। প্রথম হইতেই অর্থকরী বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল। পণ্ডিতগণকে আজীবন উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত বিদ্যাচর্চ্চা করিতে এবং সাধারণ লোকের ন্যায় ক্ষণিক সাংসারিক সুখের পশ্চাতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাগলের মত ছুটিতে দেখিয়া তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইত। তাঁহাদের বিদ্যানুশীলনের মূলে তিনি অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তাঁহাদের বিষম কলহ তাঁহাকে উদ্‌বেজিত করিত। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে, স্বতঃই তাঁহার মানস-নেত্রে গার্হস্থ্য জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা এবং সন্ন্যাসীর ত্যাগপূত, মহৎ ও শান্তিময় জীবনের ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিত এবং তিনি শান্ত সন্ন্যাসী জীবন যাপনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেন, কিন্তু ঐ কথা জানিতে পারিলে, বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রা অন্তরে ব্যথা পাইবেন ভাবিয়া গদাধর উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

গদাধর শৈশব কাল হইতেই যাত্রাগান শুনিতে এবং যাত্রার পালা অভিনয় করিতে ভালবাসিতেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নেতা করিয়া একটী সখের যাত্রাদল গঠন করিল। মাণিক রাজার আম-বাগান অভিনয়-স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল; বন্ধুগণ দিবসের কোনও নির্দ্ধারিত সময়ে সেখানে সমবেত হইয়া নিজ নিজ পাঠ প্রস্তুত করিত।

প্রধানতঃ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী যাত্রার বিষয় হইল। এই সকল বিষয় অবলম্বনে গদাধর স্বয়ং যাত্রার পালা রচনা করিতেন। শীঘ্রই আম-বাগান তাহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল। সেখানে অভিনয় কালে গদাধর মধ্যে মধ্যে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ভাবস্থ হইয়া যাইতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার নাট্য-কৌশল ও কর্ম্ম-পটুতায় বন্ধুগণ পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সাধনা ও সিদ্ধি

কলিকাতা গমন

(১৮৫২)

রামকুমার তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই তিন বৎসর তাঁহাদের পরিবারে তেমন অর্থাভাব হয় নাই; কারণ তিনি টোলের ছাত্রদিগকে পড়ান ব্যতীত ঝামাপুকুরের কয়েকটী সম্পত্তিপন্ন ভদ্র পরিবারে পুরোহিতের কাজও করিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অর্থচিন্তা একেবারে দূর হইল না। কলিকাতা আসা অবধি রামকুমার প্রায় প্রতি বৎসর একবার করিয়া বাড়ী যাইতেন। এইবার বাড়ী যাইয়া তিনি দেখিলেন, বিদ্যাভ্যাসের প্রতি গদাধরের একটুও মন নাই, সে সারাদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই জন্য তিনি কলিকাতায় ফিরিবার সময় গদাধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কলিকাতায় আসিয়া গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ঝামাপুকুর পল্লীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রথমে কিছুদিন আহিরী-টোলার নাথের-বাগানে বাস করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এখন গদাধরের দ্বারা রামকুমারের দৈনন্দিন কার্য্যে অনেকটা

সাহায্য হইতেছিল। এই সময়ে গদাধর কিছুকাল ঝামাপুকুরে শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতার নিত্যপূজা করিয়াছিলেন। রামকুমার পূজাপার্ব্বণে বিধি-ব্যবস্থা দিতেন, বিদায় গ্রহণ করিতেন এবং কখন কখন পূজাবাড়ী হইতে চালকলার পুটুলী বাঁধিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। কিন্তু গদাধর পুটুলী বাঁধা মোটেই পছন্দ করিতেন না; ইহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। পূজা করিয়া কিছু পাইলে তিনি প্রায়ই উহা রাস্তায় লোককে বিলাইয়া দিয়া আসিতেন।

ভ্রাতাকে পূজাদি কর্ম্মে সাহায্য করিতে যাইয়া, গদাধর স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ এবং বালক-বালিকাগণের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহার মধুর আলাপ, সরল ব্যবহার, কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহ ও ভাবভক্তি অচিরেই সকলকে মুগ্ধ করিল। তিনি অল্পকাল মধ্যে তাহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও গদাধরের অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়া গেল। অনবরত পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে ভজন সঙ্গীত গাহিয়া তিনি তাহাদের সহিত পরম আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর নিকটে নকুড় বাবাজী নামক জনৈক ভক্ত-বৈষ্ণবের একটী দোকান ছিল। আবার ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীও সেখান হইতে বেশী দূরে নয়। গদাধর অনেক সময়ে নকুড় বাবাজীর দোকানে যাইয়া বসিতেন। আবার কখন কখন তিনি ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতেও যাইতেন। পাঠাভ্যাসের প্রতি মূলেই গদাধরের মনোযোগ

ছিল না। তদুপরি পূজাপাঠ ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি পড়াশুনা করিবার অবকাশও পাইতেন না। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার উদাসীনতা চরমে পৌঁছিল।

টোল হইতে রামকুমারের যৎসামান্য অর্থলাভ হইত। আর তাঁহার অন্যান্য আয়েরও কোন স্থিরতা ছিল না। স্থায়ী আয় না থাকায়, এই সময়ে রামকুমারের বিষম অর্থাভাব ঘটিল। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর সুশিক্ষিত হইলেও, সংসার পরিচালনার নিমিত্ত তাঁহাকে বাড়ীতে থাকিতে হইত। আবার অর্থ উপার্জ্জনের বুদ্ধিও তাঁহার মোটেই ছিল না; চেষ্টা করিলেও তিনি অতি অল্পই উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। অধিকন্তু, সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পাইলে, তিনি বাড়ীর কাজ ভুলিয়া, তাঁহাদের সহবাসেই দিন কাটাইতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এক দিকে অর্থচিন্তা ও রামেশ্বরের অক্ষমতা, অন্য দিকে পড়াশুনার প্রতি গদাধরের উদাসীনতা রামকুমারের ভাবনা ও উদ্বেগের কারণ হইল। এক দিন তিনি গদাধরকে একান্তে ডাকিয়া পাঠাভ্যাসে মন দিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ কল্যাণ এবং পরিবারের অভাব মোচন ও সুখসুবিধার নিমিত্ত শীঘ্র পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দেওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য!

বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্যের সহবাসে আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিলেও, গদাধরের সূক্ষ্মবুদ্ধি সকল বিষয়ের অন্তর্নিহিত

গূঢ় রহস্যের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া সহজেই তাঁহাকে সত্য উপলব্ধি করাইত। সামান্য সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এই বয়সেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সংসারের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। বিষয়-বাসনা তাঁহার নিকটেও আসিতে পারিত না। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, মানব মোহগ্রস্ত হইয়া ক্ষণিক সুখের আশায় আজীবন আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হয়, কিন্তু তাহাদের ব্যর্থ প্রয়াস কেবলমাত্র শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন, শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও ভগবান—শুধু কথার কথা মাত্র- তর্কযুক্তির বিষয়েই পরিণত হইয়াছে। মানবগণ একরূপ চিন্তা করে, কথাবার্ত্তায় অন্যরূপ বলে এবং কার্য্যকালে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে; তাহাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া তিনি দৈনন্দিন কার্য্য ও আমোদ আহ্লাদের মধ্যেই অনিত্য জগতের অন্তরালে অবস্থিত সত্যস্বরূপ পরম-পিতার চিন্তায় অনুক্ষণ মগ্ন থাকিতে প্রয়াস পাইতেন।

জ্যেষ্ঠ রামকুমারের কথায় গদাধর ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, "দাদা, এই চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই। সংসারের সুখভোগই এই বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা ধনলালসা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিতে পারে না। যে বিদ্যা দ্বারা প্রাণে শান্তি হয়, ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়, আমি তাহা লাভ করিব"।

রাণী রাসমণি ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

(১৮৫৫)

কলিকাতার জানবাজার পল্লীতে (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে) রাণী রাসমণি নাম্নী জনৈকা ধনাঢ্যা রমণী বাস করিতেন। তিনি ১২০০ সালে হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোণা গ্রামে এক দরিদ্র কৃষিজীবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রাসমণি রূপবতী ছিলেন বলিয়া, জমিদার পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করিলে, রাসমণি স্বামীর অপরিমেয় ধনসম্পদের অধিকারিণী হইলেন। কারণ তাঁহাদের চারিটী কন্যা ব্যতীত কোন পুত্রসন্তান ছিল না। রাসমণি বুদ্ধিমতী, সদাচার-সম্পন্না, তেজস্বিনী অথচ উদার ও কোমলহৃদয় বিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য লোকে তাঁহাকে রাণী রাসমণি নাম দিয়াছিল। রাসমণি দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, সহজেই তাহাদের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। রাণী সকল সময়েই অকাতরে অর্থ ও অন্ন দান করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন। এই কারণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। রমণী হইলেও তিনি অদ্ভুত কুশলতার সহিত বিষয়কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতিও ছিল। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসও বিষয়-কর্ম্মে পটু ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূমাতাকে ঐ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। মথুর বাবু

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী
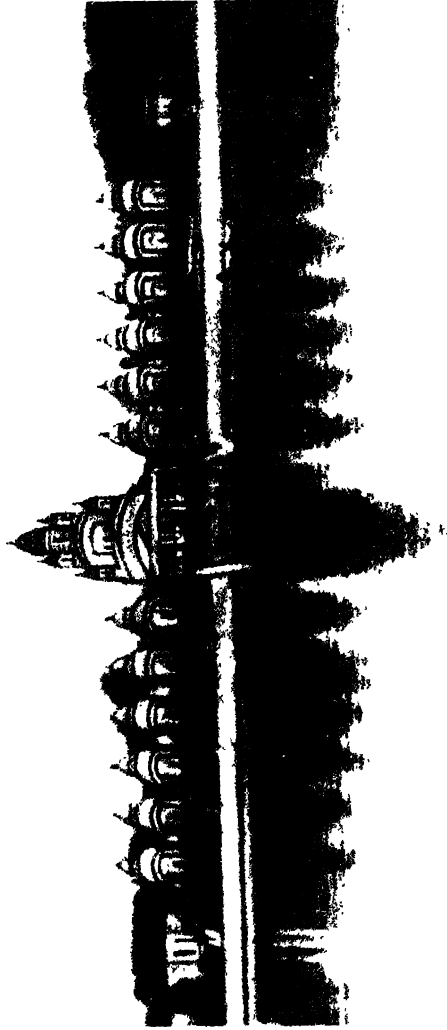
প্রথমতঃ রাণীর তৃতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়ায়, রাণী নিজ চতুর্থী কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। রাসমণি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন। নিজ ইষ্ট ৺কালিকামাতার পদে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি জমিদারীর কার্য্যে যে শীলমোহর ব্যবহার করিতেন, তাহাতে 'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী' এই কথা খোদিত ছিল।

একবার ধর্ম্মপ্রাণ রাণী ৺কাশীধাম দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া যাত্রার সকল আয়োজন করিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, কার্যতঃ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রাণীর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি ৺কাশীযাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের বাসনা অন্যরূপে প্রকাশ পাইল। গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবী ৺কালিকামাতার মূর্ত্তি স্থাপন করিবার ইচ্ছা রাণীর প্রাণে বলবতী হইয়া উঠিল।

কলিকাতা হইতে চারি পাঁচ মাইল উত্তরে, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর নামে একটী গ্রাম আছে। রাণী রাসমণি মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে ঐ গ্রামে ষাট বিঘা (কোন কোন পুস্তক মতে পঞ্চান্ন বিঘা) পরিমাণ একখণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। শীঘ্রই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যও আরম্ভ হইয়া গেল। নবরত্ন-বিশিষ্ট ৺কালিকামাতার মন্দিরের সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে, একটী বৃহৎ নাট-মন্দির এবং পশ্চাতে ৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্ত্তি স্থাপনের

নিমিত্ত আরও একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল। এই মন্দির-দ্বয়ের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে এক শ্রেণীতে দ্বাদশটী শিব-মন্দিরও নির্ম্মাণ করা হইল। মধ্যে ৺কালিকামাতা ও ৺রাধাগোবিন্দজীর মন্দির-দ্বয় ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ এবং পশ্চিমে শিব-মন্দির শ্রেণী ব্যতীত উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে তিন সারি দালান সংযুক্ত এই বৃহৎ দেবায়তনের কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে ছয় বৎসর কাল লাগিয়াছিল।

রাসমণির আন্তরিক বাসনা ছিল, মন্দিরে ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্যপূজা ও অন্ন-ভোগের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাঁহার শূদ্রকুলে জন্ম ইহাতে বাধা জন্মাইল। কারণ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদেবীকে অন্নভোগ নিবেদন শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ইদানীং প্রচলিত হইলেও তখনকার শাস্ত্র-শাসনের যুগে এই কার্য্য অসম্ভব ছিল। তজ্জন্য রাসমণি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নিজ ব্রাহ্মণ-বংশীয় গুরুর নামে মন্দিরবাটী উৎসর্গ করিয়া ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে, ১৮৫৫ খৃঃ) স্নানযাত্রা দিবসে মহা সমারোহের সহিত মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করিলেন। যথাযোগ্য অনুষ্ঠানাদির পর ৺কালিকামাতা, ৺রাধাগোবিন্দজী ও দ্বাদশ শিব-মন্দিরে মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। এই উপলক্ষে দুই তিন দিন ব্যাপিয়া কালী-কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, রামায়ণ-কথা ও যাত্রাগানাদি চলিয়াছিল এবং রাত্রিতে আলোক-সজ্জার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থান এবং কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত-বহুল স্থান হইতে বহু গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাসমণি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিষ্ঠা উৎসবে

যোগদান করিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাদিগকে রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি মূল্যবান্ পারিতোষিক দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সহস্র সহস্র ভক্ত ও দীন-দরিদ্র ৺ভবতারিণীর (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্থাপিতা কালিকামাতার নাম) প্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দোৎসবে রত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা কল্পে রাণী প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। মন্দিরের সেবাপূজা ও অন্যান্য খরচ সঙ্কুলানের নিমিত্ত তিনি দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে দিনাজপুরের অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণায় তিন লাট জমিদারী ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি ১২৫৪ সালের মধ্য ভাগে (6th. September, 1847) দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জমি ক্রয় করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১২৬০ সালে (১৮৫৩ খৃঃ) মন্দিরের কাজ শেষ হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' নামক তখনকার একটী সংবাদ-পত্রের ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ সংখ্যায় রাসমণির কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা হইতেই আমরা এরূপ অনুমান করিয়া থাকি। খবরটী এই,—"আমরা শুনিতেছি, শ্রীমতী রাসমণি আগামী বৈশাখী পৌর্ণমাসী তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত করিবেন অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর মহোৎসব সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন।" মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব যে ১২৬২ সালের (১৮৫৫ খৃঃ) স্নানযাত্রা

দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। অতএব 'সংবাদ প্রভাকরের' খবর অনুযায়ী দেখা যায়, মন্দির নির্ম্মিত হইবার দুই বৎসর পরে উহার প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে রাণী কেন দুই বৎসর দেরী করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবীর অন্নভোগ দান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের আপত্তিই ইহার কারণ হইবে।

পাঠক, চলুন আমরা একবার রামকুমারের কথা স্মরণ করি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামকুমারের কোন স্থায়ী আয় ছিল না, তিনি বিদায় আদায়ের অনিশ্চিত আয় এবং যজমানদের সামান্যমাত্র অর্থ-সাহায্যে পরিবার পোষণ করিতেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতেছিল। অথচ আজীবন যাহা করিয়া আসিয়াছেন, রামকুমার তাহা ছাড়া জীবিকা অর্জ্জনের অন্য উপায় জানিতেন না। সুতরাং কুলদেবতা রঘুবীরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াই তিনি কাল কাটাইতেছিলেন। রাসমণির মন্দিরবাটী প্রতিষ্ঠার সময়ে রামকুমার কালী-মন্দিরের পূজক-পদ গ্রহণ করিয়া মা কালীর পূজায় ব্রতী হইলেন। অশূদ্রযাজী রামকুমারকে ক্রমশঃ কৈবর্ত্ত জাতীয়া রাণীর মন্দিরে পূজক-পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ও অন্যান্য অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি কিরূপে রাণীর মন্দিরে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল এবং ভাগিনেয় হৃদয় দুইটী বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করেন।

হৃদয়রাম বলেন, রাসমণি স্ব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবীর অন্নভোগ দান সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত চাহিয়া পাঠাইলে, তাঁহাদের কেহই ইহাতে মত দিলেন না; একমাত্র রামকুমার গোঁড়ামি ছাড়িয়া শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মন্দিরবাটী রাণীর ব্রাহ্মণ-বংশীয় গুরুগণের নামে উৎসর্গীকৃত হইলে, দেবীর মন্দিরে অন্নভোগ দেওয়া চলিতে পারে। রাসমণি রামকুমারের ব্যবস্থা-বলে আপন ইচ্ছানুরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির দরুণ কালী-মন্দিরের জন্য উপযুক্ত পূজক যোগাড় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এই নিমিত্ত রাণী রামকুমারের শরণাপন্ন হইলেন এবং রামকুমার নিজ ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া স্বয়ং কালী-মন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রামলাল বলেন, রাণীর দেওয়ান ও অন্য একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহাদের দেশের লোক ছিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ও অনুরোধে দেশীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সহিত রামকুমার বিদায় গ্রহণের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। তৎপর রাণীর বিশেষ অনুরোধে রামকুমার তাঁহাদের দেশীয় অপর দুই একজন ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং প্রতিষ্ঠা উৎসবের পরেও কালী-মন্দিরের নিত্য-সেবা চালাইতে থাকেন। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক, রামকুমারের শোচনীয় আর্থিক অবস্থাই ইহার মূল কারণ ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর উৎসব দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই; সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যা কালে নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি ক্রয় করিয়া উহা দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। গদাধর ঐ দিবস সন্ধ্যার পর পদব্রজে ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। রামকুমার যে স্থায়ী ভাবে মন্দিরের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, প্রথম দিনে গদাধর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন, রামকুমার আর ঝামাপুকুরে ফিরিয়া যাইবেন না। রাণীর মন্দিরে রামকুমারের পৌরহিত্য গ্রহণ তাঁহার ভাল মনে হইল না। তাই তিনি ভ্রাতাকে পিতার অশূদ্রযাজিত্ব প্রভৃতি কঠোর রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিবার জন্য জেদ করিলেন। পক্ষান্তরে রামকুমারও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, মন্দিরের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় কাজ করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কথার কোন মীমাংসা হইল না।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গদাধর ভ্রাতার বিশেষ অনুরোধে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথম দুই তিন মাস তিনি মন্দিরে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই, মন্দিরবাটী হইতেই সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রাঁধিয়া ভোজন করিতেন। শীঘ্রই নীরবতাময় মন্দিরবাটীর রমণীয় দৃশ্য এবং পতিত-পাবনী জাহ্নবীর কুলু কুলু প্রব[illegible] অলক্ষিতে তাঁহার প্রাণ-মন হরণ করিল।

গদাধরের পূজকপদ গ্রহণ

(১৮৫৬)

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে গদাধর মধ্যে মধ্যে তাহার পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীকে দেখিবার জন্য সিহোড় গ্রামে যাইতেন। হেমাঙ্গিনীর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রাম, কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরেব ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ অথবা ভাবপ্রবণ না হইলেও, সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া গদাধরেব সহিত তাঁহাব খুব ভাব জমিয়া গিয়াছিল। শ্রীবাম মল্লিক নামক ঐ গ্রামেব আব একটী যুবকের সহিতও গদাধবেব খুব প্রণয় হইযাছিল। গদাধব ও রাম দিনরাত এক সঙ্গে থাকিতেন। সাবাদিন তাঁহাদের একত্র খেলাধূলা ও এক সঙ্গে শোয়া-বসা দেখিয়া লোকে বলিত, ইঁহাদের মধ্যে একটী মেয়ে হইলে ইঁহাদেব বিবাহ হইত।

হৃদয় বর্ত্তমানে ষোল বৎসবের যুবক। তিনি চাকুরীর খোঁজে বাহিব হইয়া ঘুবিয়া ফিবিয়া দক্ষিণেশ্বব কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। গদাধরের সহিত তাঁহার দিনগুলি আনন্দে কাটিতে লাগিল। হৃদয়রাম কর্ম্মঠ এবং সাংসারিক কার্য্যে নিপুণ, কিন্তু গদাধর সারাদিন ইষ্টচিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। গদাধরের চরিত্রে অল্পমাত্র সাংসারিকতাও ছিল না। তাই বুঝি ভগবান্ তাঁহার সংরক্ষণের নিমিত্ত হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করিলেন। আমরা দেখিতে পাইব, অতঃপর হৃদয় দীর্ঘ পাঁচিশ বৎসর কাল

গদাধরকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া শিশু বালকের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

রাসমণির জামাতা মথুর বাবু প্রায়ই কালীবাটীর কাজ-কর্ম্ম দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তরুণ-বয়স্ক গদাধর প্রথম হইতেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একদিন মথুর বাবু কালীবাটীতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, গদাধর গঙ্গাতীরে বসিয়া তন্ময় চিত্তে একটী ক্ষুদ্র শিব-মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। মূর্ত্তিটী ক্ষুদ্র হইলেও, উহার গঠন অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তাই মথুর বাবু হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মূর্ত্তিটী কে গড়িয়াছে। ঐ দিন হইতে গদাধরকে কোনও সুযোগে মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা মথুর বাবুর প্রাণে বলবতী হইল। বাড়ী ফিরিয়া তিনি রাণীকেও এই বিষয়ে বলিলেন।

গদাধর বাল্যকাল হইতেই ভাবিয়া আসিয়াছেন, এই নশ্বর জগতে ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও দাসত্ব করিবেন না। কিন্তু মথুর বাবুর আগ্রহাতিশয্যে তিনি কালী-মন্দিরের বেশকারীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। একদিন মথুর বাবু তাঁহাকে মন্দিরের কার্য্য লইবার জন্য জেদ করিলে, গদাধর তাঁহার প্রস্তাবটী সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, মায়ের বহুমূল্য গহনা ও মন্দিরের অন্যান্য জিনিষপত্র দেখিয়া শুনিয়া রাখিবার গুরু দায়িত্ব লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তবে হৃদয় গহনা ও জিনিষ-পত্রের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হইলে,

তিনি শুধু বেশকারীর কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। এই কথায় মথুর বাবু যেন হাতে আশ্‌মান পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গদাধরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, ঐ দিন হইতেই তাঁহাকে কালী মন্দিরের বেশকারীর পদে এবং হৃদয়কে তাঁহার সহকারী রূপে নিযুক্ত করিলেন। গদাধরের কল্যাণে হৃদয়েরও একটা কাজ জুটিয়া গেল। একদিন রামকুমার গদাধরের মুখে "দাদা, আমার এমন চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় প্রয়োজন নাই" এই কথা শুনিয়া ভ্রাতার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে মন্দিরের কার্য্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার সুমতি হইয়াছে ভাবিয়া তিনি কতকটা আশ্বস্ত ও অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার বৎসরেই জন্মাষ্টমীর পর দিন পূজা-অর্চ্চনা ও ভোগ-রাগের পর বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিগ্রহকে শয়ন দিবার নিমিত্ত পার্শ্বের কোঠায় লইয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে তিনি পা ফস্‌কাইয়া মন্দির-তলে পড়িয়া গেলেন। উহাতে গোবিন্দজী বিগ্রহের একটী পা ভাঙ্গিয়া যায়। এই ব্যাপারে মন্দিরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কয়েক দিনের জন্য বিষ্ণুমন্দিরের পূজা বন্ধ রহিল এবং ক্ষেত্রনাথ অচিরেই পদচ্যুত হইলেন।

অতঃপর গোবিন্দজীর পূজা ভগ্ন বিগ্রহেই চলিবে, অথবা নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য রাণী শীঘ্রই এক পণ্ডিতসভা আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতেরা এক বাক্যে বলিলেন, "ভগ্ন বিগ্রহে পূজা চলিবে না, উহা শাস্ত্রসম্মত

নয়”। রাণী এবং তদীয় জামাতা গদাধরকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং ‘বাবা’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহারা এই বিষয়ে বাবার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। চির-পূজিত দেবতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, নূতন বিগ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে গদাধর পণ্ডিতগণের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি দেবতাকে নিতান্ত আপনার বোধ করিতেন; কাজেই বলিলেন, প্রিয়জনের অঙ্গহানি ঘটিলে যেমন তাহাকে ত্যাগ করা চলে না, বরং তাহার চিকিৎসাদিরই ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ নিত্য পূজিত বিগ্রহকে বিসর্জ্জন দেওয়াও উচিত হয় না। ঐ বিগ্রহ ভগ্ন হইলে, উপযুক্ত সংস্কার করিয়া উহারই পূজা করা উচিত। রাণীর জামাতাদের মধ্যে যদি কেহ পা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কি ঐ ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থলে অন্য আর একজনকে বসান হইত, না তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত? গদাধরের সরল যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার কথা সমর্থন করিলেন এবং রাণী ও তাঁহার জামাতা ভগ্ন বিগ্রহেই পূজার ব্যবস্থা করিলেন। অবশ্য গদাধর অতি সুন্দর রূপে বিগ্রহটীর পদ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। জোড়াটী এত চমৎকার হইয়াছিল যে, কোথায় জোড়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটুও বুঝা যাইত না। এইবার রাণী গদাধরকে বিষ্ণুমন্দিরের পূজক নিযুক্ত করিলেন এবং হৃদয় মাতুলের স্থলবর্ত্তী হইয়া কালীমন্দিরের বেশকারীর কাজ করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই একটী নূতন মূর্ত্তি গঠনের নিমিত্ত কারিকরকে বলা হইয়াছিল। মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উহা মন্দিরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল। দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দজী বিগ্রহের ভগ্ন পদের জোড়া কতকটা খুলিয়া যাওয়ায়, রক্ষিত নূতন মূর্ত্তিটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের মূর্ত্তিটী বিষ্ণুমন্দিরের উত্তর দিকের কোঠায় সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। এখনও নিত্যই পুরাতন বিগ্রহটীরও পূজা হইয়া থাকে।

অল্প দিনের মধ্যেই গদাধরের মন ৺রাধাগোবিন্দের সেবা-পূজা ও ধ্যান-চিন্তায় ডুবিয়া গেল। পূজা ও ধ্যানাদি শেষ করিয়া গদাধর মন্দিরে বসিয়াই ৺গোবিন্দজীকে গান শুনাইতেন। তাঁহার সঙ্গীত অতি সরল ও মধুর ছিল। সঙ্গীত কালে তাঁহার মন এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইত এবং চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুতে ভাসিত। রাণী রাসমণি কালীবাটীতে আসিলেই তাঁহার গান শুনিয়া যাইতেন।

এই সময় রামকুমারের বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তিনি নিজের উপর আর ততটা ভরসা করিতে পারিতেছিলেন না। সময় সঙ্কীর্ণ ভাবিয়া, রামকুমার গদাধরকে শক্তিপূজা ও উহার আনুসঙ্গিক চণ্ডীপাঠাদি অনুষ্ঠান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আবার যথারীতি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে, তান্ত্রিক দেবী-পূজার প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না বলিয়া, তিনি

গদাধরকে কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারের প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শুনা যায় দীক্ষা কালে গদাধর গুরুমুখে মন্ত্র শ্রবণ-মাত্র দেবীর ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগতের সংজ্ঞা হারাইয়া ছিলেন। তান্ত্রিক দীক্ষার পর রামকুমার মধ্যে মধ্যে গদাধরকে কালী-মন্দিরের পূজায় নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। যে দিন গদাধর কালীপূজা করিতেন, সেই দিন রামকুমার বিষ্ণুঘরের সেবা-পূজা চালাইতেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত রামকুমার কার্য্যোপলক্ষে শ্যামনগর মূলাযোড়ে গমন করেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। মূলাযোড় যাইয়াই তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কয়েক দিনেই জ্বর বিষম সান্নিপাতিক বিকারে পরিণত হইল এবং রামকুমার দেহত্যাগ করিলেন। রামকুমারের দেহত্যাগের পর গদাধর কালীমন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করেন।

শক্তিসাধনা ও দিব্যভাব

(১৮৫৬—৫৮)

গদাধর 'রামকৃষ্ণ' নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'রামকৃষ্ণ' নামের উৎপত্তি কোথায়, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। এই বিষয়ে

সাধারণতঃ দুইটী মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন স্বামী তোতাপুরী গদাধরকে এই নাম প্রদান করেন। অপর কেহ বলেন ভক্ত মথুর বাবু তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ' নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটী মতের মধ্যে একটীও আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ স্বামী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার বহু পূর্ব্বে এবং মথুর বাবুর সহিতও গদাধরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পূর্ব্বে লিখিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দেবোত্তর দান-পত্রে 'রামকৃষ্ণ' নামের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী পরিবারে ভ্রাতাদিগের যেরূপ একই ধরণের নাম রাখিবার রীতি পূর্ব্বাপর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বভাবতঃ আমাদের মনে হয়, 'রামকৃষ্ণ' গদাধরের পিতৃদত্ত নাম, অপর কেহ তাঁহাকে এই নাম প্রদান করেন নাই। সে যাহা হউক, এখন হইতে আমরা গদাধরকে 'রামকৃষ্ণ' নামেই অভিহিত করিব।

রামকৃষ্ণের দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী কঠোর সাধনা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়াছেন, এমন লোক এখনও দুই চারি জন জীবিত আছেন। কিন্তু অল্প দিনের ঘটনা হইলেও, রামকৃষ্ণ এই বার বৎসরের মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ সাধনাটী করিয়াছেন, তাহার ক্রম নির্ণয় করা বাস্তবিকই প্রাচীন ইতিহাসের ন্যায় গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার সাধনার প্রথম দিকের ক্রম নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। রামকৃষ্ণ যে বার বৎসর পুরাণ, তন্ত্র ও বেদমতে সাধন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু সাধনার

ক্রম সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যেই দুই জন দুই প্রকার লিখিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন, রামকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কথামৃত-কার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পুরাণ মতে সাধনকে প্রথমে স্থান দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কালীবাটীর দেবোত্তর দানপত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ মুখের উক্তি সমূহের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিলে, এই উভয় মতের বিরুদ্ধেই কিছু কিছু বলা চলে। এখন এই বিষয়ে মীমাংসা করা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং আমরা বিচারের দিক ছাড়িয়া দিয়া রামকৃষ্ণের সাধনা সম্বন্ধে মোটামুটী স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত ক্রমই অনুসরণ করিলাম।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

বেদ সকল বিভিন্ন মত প্রকাশ করে, স্মৃতিও তদ্রূপ করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেক মুনিই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ফলে ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব সমূহ বুঝিতে পারা সুকঠিন। সুতরাং মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম লাভের প্রকৃত পন্থা বলিয়া জানিতে হইবে।

রামকৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, মহাজনগণের আচরণ ও অনুভূতি যেন সমষ্টিগত ভাবে তাঁহার

চরিত্র-মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই কবিবর রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।

শুধু ধ্যানে নয়, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণেও বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির চমৎকার মিলন দেখা যাইত। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের উদার চরিত্র আপন কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেরই অনুধাবনের যোগ্য।

বাল্যকাল হইতেই রামকৃষ্ণের অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব অতিশয় প্রবল ছিল। আবার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি সংসারের দোষ-দর্শন তাঁহার স্বভাবজাত বৈরাগ্যানলকে মধ্যে মধ্যে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত। শৈশবে পিতৃবিয়োগ তাঁহার মনকে একবার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিল। পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের অতর্কিত পরলোক গমন তাঁহাকে বিষম আঘাত প্রদান করিল। কারণ ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের পর রামকুমার তাঁহার পিতার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ ও যত্নেই তিনি মানুষ হইয়াছেন।

রামকুমারের দেহত্যাগে অসার জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব রামকৃষ্ণের মনোমধ্যে নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিল। ফলে তাঁহার মন বাহ্য জগতের কোলাহল ছাড়িয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি দিবসের সকল সময় ৺কালিকামাতার সেবাপূজা ও ধ্যানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কালে পূজায় বসিলে তাঁহার মন এত

তন্ময় হইয়া যাইত যে, পূজার একটী অঙ্গ শেষ করিতেই বহুক্ষণ কাটিয়া যাইত। কখন কখন তিনি পূজার কথা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহাকে পূজার অন্যান্য অঙ্গ বাকী রহিয়াছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। আরতির সময় ঘণ্টা বাজা থামিত না, কোন কোন দিন হয়ত এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া কেবল প্রদীপ ঘোরাণই চলিত। পূজাশেষে রামকৃষ্ণ প্রত্যহ মাতার চরণতলে বসিয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া রাম-প্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-ভক্তগণের রচিত শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতেন। তাঁহার গানে লোক-দেখান ওস্তাদি ঢংএর লেশমাত্র ছিল না, অথচ তাল লয় বিশুদ্ধ হইত। তিনি শুধু পরিষ্কার ভাবে গানের পদ কয়টী গাহিয়া যাইতেন। গানের ভাবের দিকেই তাঁহার ষোল আনা মন থাকিত। তাঁহার ভাবভক্তি-পূর্ণ মধুর সঙ্গীত শুনিয়া নিতান্ত পাষণ্ডেরও মন গলিয়া যাইত।

দিনের বেলা রামকৃষ্ণ অনেকটা সময় মায়ের সেবাপূজা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, আর অবসর সময়টুকুও মন্দিরে অথবা ঘরে বসিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেন। সন্ধ্যার পর মন্দিরের কাজ শেষ করিয়া, তিনি কালীবাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত জঙ্গলে চলিয়া যাইতেন। ঐ নির্জ্জন জঙ্গল-মধ্যে তখন একটী আমলকী বৃক্ষ ছিল। রামকৃষ্ণ ঐ আমলকী গাছের তলায় বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধ্যান করিতেন। কোন কোন দিন তাঁহার সারারাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া যাইত। আহার-নিদ্রার প্রতি তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না বলিয়া, এই কালে তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া

যাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মাতুলের এই উন্মনা ভাব লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইলেন।

মাতুল রাত্রিতে কোথাও চলিয়া যান বুঝিতে পারিয়া, হৃদয় কয়েক দিন অনুসন্ধানের পর, সকল কথা জানিতে পারিলেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি রামকৃষ্ণের পশ্চাতে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, রামকৃষ্ণ পৈতা-কাপড় একপাশে রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া আমলকী গাছের তলায় ধ্যান করিতে বসিয়াছেন। মাতুলের এই অপরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া হৃদয় ভাবিলেন, মাতুল নিশ্চয়ই পাগল হইয়া গিয়াছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মামা, এসব কি হচ্ছে? পৈতে-কাপড় সব ফেলে উলঙ্গ হয়ে বসে আছ যে?" হৃদয় একটা হুলুস্থূল বাঁধাইয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ব্যাপার বুঝিয়া স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "জানিস্ না, এই ভাবেই পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল প্রভৃতি অষ্ট পাশের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই ভাবেই ধ্যান করিতে হয়"। হৃদয়ের মুখে আর কথা সরিল না; তিনি নীরবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দিবারাত্র অবিরাম ধ্যান-ধারণার ফলে, ৺জগদম্বার দর্শন-লালসা অল্পকাল মধ্যেই রামকৃষ্ণকে পাগল করিয়া তুলিল। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তিনি জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা জ্ঞান করিলেন। কিন্তু তথাপি মাতার দর্শন মিলিল না বলিয়া, কখন কখন তাঁহার

মনে সংশয়ের উদয় হইত এবং তিনি আপন মনে ভাবিতেন, "মা কি সত্য সত্যই আছেন ? না, কেবল কল্পনা মাত্র। যদি কল্পনাই হইবে, তবে ভক্তগণ তাঁহার দর্শন লাভে ধন্য হয় কি করিয়া ?" আবার ভাবিতেন, "রামপ্রসাদাদি ভক্তগণ ৺জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তবে মিথ্যা হইবে কিরূপে ? তিনি সত্য সত্যই আছেন এবং আমাকেও অবশ্যই দর্শন দানে কৃতার্থ করিবেন"।

৺জগন্মাতার বালক, মা ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। তিনি অনবরত মাতার নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেন, "মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়াছিস্, কমলাকান্তকে ধন্য করিয়াছিস্, তবে আমায় কেন দেখা দিবি না ? আমি ধন চাই না, মান চাই না, সুখভোগ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে। তোর অদর্শনে আমার প্রাণ যে যায়"। কি করিয়া রামকৃষ্ণের দিবারাত্র কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। দিবসের শেষে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিয়া একবার তাঁহার চৈতন্য হইত। তিনি বুঝিতে পারিতেন, আরও একটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি মাতার কৃপালাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রাণে এক উন্মাদনা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইত। তিনি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতেন, "মা, এই ক্ষুদ্র জীবনের আরও একটা দিন কাটিয়া গেল, কই তোর দেখাত পাইলাম না"। মায়ের দেখা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি এত কাঁদিতেন যে তাঁহার চোখের জলে নীচের মাটী ভিজিয়া যাইত। কখন

কখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় মাটীর উপর এরূপ ভাবে মুখ ঘষিতেন যে, তাঁহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত বাহির হইত।

একদা রামকৃষ্ণ মাতার সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতেছিলেন। গান গাহিতে গাহিতে ভাবের উচ্ছ্বাসে মাতার দর্শন লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতার বিরহে অধীর হইয়া তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কাতর প্রার্থনা ও করুণ আর্ত্তনাদ আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিল; তথাপি মা দেখা দিলেন না। মাতার দর্শন না পাইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আর বৃথা জীবন ধারণে কাজ কি? আজই ইহার শেষ করিব"। নিকটেই মন্দিরের দেয়ালে একখানা অসি ঝুলিতেছিল। হঠাৎ উহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি উন্মাদের প্রায় ঐ অসির দিকে ছুটিলেন। এতদিনে মায়ের আসন টলিল; মুহূর্ত্তে মন্দিরবাটীর ঘরদ্বার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; মাতা ভক্ত-বালকের হৃদয় আলো করিয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক অসীম জ্যোতিঃসমুদ্র তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ফলে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং তিনি দিব্য আবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমাগত দুই দিবস এই ভাবে মগ্ন থাকিয়া, রামকৃষ্ণ মা, মা বলিয়া, সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

৺জগন্মাতার দর্শন লাভে ধন্য হইয়া রামকৃষ্ণ আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। এখন হইতে মন্দিরে নিয়মিত পূজা করা

তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মাতার দিব্য দর্শনের রসাস্বাদ তাঁহাকে পুনরায় আরও অধিক ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার দিব্য মাতৃ-মূর্ত্তির অবিরাম দর্শন লাভের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। 'মা আমায় কৃপা কর, দেখা দে' বলিয়া কখন কখন তিনি এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন যে, তাঁহার চারিদিকে লোক জড় হইয়া যাইত। তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহারা বলাবলি করিত, "আহা! বেচারা বোধ হয় শূল-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে"। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি চাহিয়াও দেখিতেন না। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও বস্তু তাঁহার নিকট ছায়ার ন্যায় অবাস্তব বলিয়া বোধ হইত। বিরহ-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মা সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার অন্তরের দুঃখ দূর করিতেন।

এইরূপে রামকৃষ্ণ মাতৃচিন্তায় বিভোর হইয়া প্রায়ই আত্মহারা অবস্থায় থাকিতেন। যে দিন তাঁহার পক্ষে পূজা করা সম্ভব হইত না, সেই দিন হৃদয় মাতুলের পরিবর্ত্তে মায়ের সেবাপূজা চালাইতেন। আবার মায়ের পূজা কালে যখন রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া আসনে বসিতেন, তখন তাঁহার নানারূপ জ্যোতিঃ দর্শন হইত। তিনি জ্যোতি-রূপিনী মাতাকেই সংসারের সার বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এখন হইতে তাঁহার সকল চেষ্টাই তদভিমুখী হইল। তাঁহাকে লইয়াই তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ইচ্ছামাত্র মাতার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়া রামকৃষ্ণ বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রম করায় এখন তাঁহার পূজা-পদ্ধতি আরও অদ্ভুত আকার ধারণ করিল। পূজাকালে কখন বা তিনি নিজ অঙ্গে মাতার আবেশ অনুভব করিয়া নিজের শরীর পুষ্পচন্দনে সাজাইতেন, আবার কখন মাকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে স্বয়ং উহা ভক্ষণে রত হইতেন ; কখনও বালক ভাবের আবেশে মায়ের খাটে যাইয়া শুইয়া পড়িতেন। একদিন রাত্রিতে একটা বিড়াল মন্দিরে প্রবেশ করিলে, তিনি উহার মধ্যেই সাক্ষাৎ মা কালীর প্রকাশ দেখিতে পাইলেন এবং মায়ের ভোগের জন্য প্রস্তুত লুচি বিড়াল মূর্ত্তিধারী মাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার এই অপরূপ আচরণ সমূহ কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং তাঁহারা অবিলম্বে মথুর বাবুকে এই বিষয় জানাইলেন। ইহার সন্ধান লইবার জন্য এক দিবস মথুর বাবু স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। মাতার সহিত রামকৃষ্ণের বালকের ন্যায় আচরণ এবং তাঁহার ভাবভক্তি ও অশ্রুপুলক লক্ষ্য করিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। মথুর বাবু নিজেও যেন মন্দির মধ্যে বেশ একটী দেবভাবের প্রকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে সুযোগ্য পূজকের ভক্তিবলে মা জাগ্রতা হইয়াছেন। রামকৃষ্ণের বালকভাব ও ভাবভক্তি দেখিয়া মথুর বাবু মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীকে জানাইয়া দিলেন, ছোট ভট্টাচায্যি মহাশয় (রামকৃষ্ণ) ইচ্ছানুরূপ আচরণ করিলেও কেহ যেন তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা না দেয়। রামকৃষ্ণ

কিন্তু মাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন ; তিনি কর্ম্মচারিগণের নালিশের কথা কিছুই জানিতেন না, মথুর বাবুর আগমন ইত্যাদি বিষয়েও পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ রামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্ততা বাড়িতে লাগিল। ভাবের উদ্দাম বেগে তিনি অনুক্ষণ মাতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। কখন বা তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া মাতার হস্ত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেন। আহারাদির প্রতি তাঁহার একটুও লক্ষ্য ছিল না ; নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার চক্ষে পলক পড়িত না। তাঁহার চক্ষু ও বক্ষঃস্থল সর্ব্বদাই আরক্তিম হইয়া থাকিত এবং তিনি দিবস-রজনী মাতৃচিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ক্ষণকালের জন্যও তিনি মাতার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না ; যন্ত্রণায় একেবারে অধীর হইয়া যাইতেন। ঐ যন্ত্রণার ফলে তাঁহার প্রবল গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ উহা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ভিজা গামছা মাথায় করিয়া একাদিক্রমে তিন চারি ঘণ্টা কাল গঙ্গাজলে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলেও যন্ত্রণার উপশম হইত না। হৃদয়রাম মাতুলের শরীর ও মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভাবিত হইলেন। তিনি কলিকাতার জনৈক সুবিজ্ঞ কবিরাজ দ্বারা দীর্ঘকাল তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন ; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। এই গাত্রদাহে রামকৃষ্ণ প্রায় ছয় মাস দারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ যেমন নিজে বিষয়-চিন্তাকে দূরে পরিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অপরের অন্তরে বিষয়-চিন্তা লক্ষ্য করিয়াও তিনি প্রাণে

বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। একদা রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করেন। রাণী, মন্দিরে আসিলে, পূজার ফুল বাছা, মাকে চামর ব্যজন করা ইত্যাদি উপায়ে মায়ের সেবা করিতেন। আবার তিনি রামকৃষ্ণের গান শুনিতেও ভালবাসিতেন। সেদিনও তিনি মন্দিরে বসিয়া ফুল বাছিতে বাছিতে রামকৃষ্ণের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার মন বিষয়-চিন্তায় রত হইল। রামকৃষ্ণ গান গাহিতে গাহিতে ভাবস্থ হইয়া গিয়াছিলেন, রাণীর বিষয়-চিন্তা তাঁহার ভাবধারায় আঘাত করিল। তিনি তাঁহাকে দুই চাপড় মারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি, এখানেও বিষয়-চিন্তা!" রাণী নিজ ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইলেন। এদিকে মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাণী তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। ইহার পরেও অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ভগবানের ধ্যানচিন্তা কালে কেহ অন্যমনস্ক হইয়া বিষয়-চিন্তা করিলে, তিনি তাহাকে চড়চাপড় মারিয়া শাসন করিয়া বসিতেন। তিনি কাহাকে শাসন করিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার হুস থাকিত না।

এই সময় একজন পূর্ণ জ্ঞানী কালীবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। বেশভূষায় তাঁহাকে পাগল বলিয়াই বোধ হইতেছিল। গায়ে মরার কাঁথার মত একটা কাঁথা জড়ান, এক পায়ে একটা ছেঁড়া জুতা, হাতে একটা কঞ্চি ও একটী ভাঁড়। তিনি যখন কালীমন্দিরে যাইয়া মায়ের স্তব করিতে লাগিলেন, তখন যেন

সমস্ত মন্দিরটী কাঁপিতে লাগিল। তারপর সাধুটি কুকুরের সঙ্গে এটো পাতা কুড়াইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বালকের ন্যায় ভয় পাইয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিতে লাগিলেন, "ওরে হৃদু, আমারও কি শেষটায় এই দশা হবে? এ যেমন-তেমন পাগল নয়, জ্ঞানোন্মাদ"। কিরূপে জ্ঞান হয়, ভগবানকে পাওয়া যায়, এই বিষয় জানিবার জন্য হৃদয়রাম জেদ করায় সাধুটী বলিয়াছিলেন, "যখন গঙ্গার জল আর ডোবার জল এক বোধ হবে, তখন জান্‌বি জ্ঞান হয়েছে, তখনই তাঁকে পাবি"।

ভাবের আধিক্য-বশতঃ রামকৃষ্ণের পক্ষে দেবীর পূজা করা আর মোটেই সম্ভব নয় বুঝিতে পারিয়া মথুর বাবু কালীমন্দিরের জন্য অন্য পূজক নিযুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সেবা ও যত্নে কালীবাড়ীতে থাকিয়াই আপন ইচ্ছানুযায়ী সাধনায় রত হইলেন। অতঃপর রাণী ও মথুর বাবুর বিধানে রামকৃষ্ণ আজীবন মাসিক ৭৲ সাত টাকা হিসাবে মাসহারা পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হৃদয়রাম কালীমন্দিরের পূজক রূপে রামকৃষ্ণের স্থলবর্ত্তী হইয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ কিন্তু অন্যরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে রামকৃষ্ণের খুল্লতাত পুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অন্য মতে রামতারক রামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমারের দেহত্যাগের পর হইতে কালীমন্দিরের পূজক ছিলেন। রামকৃষ্ণ রামতারককে হলধারী নামে অভিহিত করিতেন। হলধারী বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সদাচারী

সাধক ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত হইলেও শক্তিপূজায় তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি পূর্ব্বাপর কালীমন্দিরে পূজা করিতে পারেন নাই। মায়ের নিকট সর্ব্বদাই ছাগবলি হইত। তাঁহার ইহা সহ্য হইল না। তজ্জন্য তিনি কালীমন্দিরের পূজা ছাড়িয়া ৺রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজক-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্যাগী জীবন যাপন করিয়া চরম লক্ষ্যে পৌঁছানই ছিল রামকৃষ্ণের জীবনের আদর্শ। সুতরাং তাঁহার আচরণ সমূহ পদে পদেই সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিত। তিনি কুল, শীল, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সকল জীবের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক। জাতি-অভিমান বিনাশ করিবার জন্য তিনি এই সময়ে একদিন কালীবাটীতে প্রসাদ-প্রাপ্ত কাঙ্গালীদিগের উচ্ছিষ্ট-পাতা কুড়াইয়া তাহাদের ভোজন-স্থান ঝাড়ুদ্বারা পরিষ্কার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহাদের ভুক্তাবশেষ দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে ভক্ষণ করিলেন। ভেদবুদ্ধি ও ঘৃণা সম্পূর্ণ দূর করিবার জন্য অপর এক দিবস তিনি গভীর রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতে ঝাড়ু প্রভৃতি দ্বারা মন্দিরবাটীর রাস্তা, নর্দ্দমা, এমন কি পায়খানা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিলেন। রামকৃষ্ণের এই সকল বিজাতীয় আচরণ হলধারীর মোটেই ভাল লাগিত না। তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার অনাচারকে লক্ষ্য করিয়া একদিন হলধারী বলিলেন, "দেখা যাবে, কি ক'রে তোর

ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়!” রামকৃষ্ণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “তবে রে শালা, তুমি না জ্ঞানের অভিমান কর, আর শাস্ত্র ব্যাখ্যা কালে বল, জগৎ মিথ্যা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তুমি বুঝি ভাবছ, আমি তোমার মত জগৎ মিথ্যা বলবো, আবার ছেলেমেয়ের বাপ হব; ধিক্ তোমার শাস্ত্রজ্ঞানে!”

হলধারীর ভাবের কিছু ঠিক ছিল না। তিনি কখন কখন সাকারবাদী, আবার অন্য সময়ে নিরাকারবাদী হইতেন। হলধারীর বড় বড় পণ্ডিতি কথা অনেক সময়ে রামকৃষ্ণের সরল মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত। তিনি ঈশ্বরকে ভাবের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। এক দিবস তাঁহার শাস্ত্রবিচারে রামকৃষ্ণের মনে ভগবানের সাকার রূপ ধারণ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যখনই রামকৃষ্ণের মনে কোন সন্দেহের উদয় হইত, তিনি মন্দিরে যাইয়া, মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া, ঐ বিষয়ে সুমীমাংসা লাভ করিতেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি মন্দিরে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিলেন, “মা, আজ পর্য্যন্ত তোর যত রূপ দেখেছি, যত আদেশ লাভ করেছি, সবই কি মিথ্যা? আমি নিরক্ষর মুখ্খু বলে কি এমন করেই ফাঁকি দিতে হয়?” অল্পক্ষণ মধ্যেই মাতা তাঁহার অন্তরের সকল সংশয় দূর করিলেন।

পঞ্চবটী

দাস্যভাবাদি সাধনা

(১৮৫৮)

দক্ষিণেশ্বরে আসা অবধি রামকৃষ্ণ রাত্রিকালে কালীবাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত নির্জ্জন জঙ্গল মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বিষ্ণুমন্দিরে পূজাকালে তিনি ঐ জঙ্গলের নিকটে একটী তুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি সন্ধ্যার পর ঐ তুলসী বনের মধ্যে বসিয়াই ধ্যান করিতেন। ক্রমে রামকৃষ্ণ সেখানে একটী ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মথুর বাবু ঐ কুটীরখানি পাকা করাইয়া দেন। এইবার রামকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল, সাধনার অনুকূল একটী পঞ্চবটী রচনা করেন। তিনি হৃদয়ের সাহায্যে সেখানে স্বহস্তে অশ্বত্থ, বট, অশোক, বিল্ব ও ধাত্রী (আমলকী) এই পাঁচ রকমের পাঁচটি চারাগাছ রোপন করিলেন। এই চারাগাছ গুলিকে গো-ছাগাদির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল। রামকৃষ্ণ বাগানের মালী ভর্ত্তাভারীকে এই বিষয়ে বলিলেন। কিন্তু বেড়া দিবার উপযোগী বাঁশ ইত্যাদি তখন কালীবাটীতে ছিল না। ইতিমধ্যে একদিন ভর্ত্তাভারী দেখিতে পাইল, বেড়ার জন্য আবশ্যক বাঁশের বাখারি, দড়ি ইত্যাদির একটা আটি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়া পঞ্চবটীর নিকটে গঙ্গাতীরে লাগিয়া আছে। ভর্ত্তা আনন্দিত হইয়া রামকৃষ্ণকে এই সংবাদ জানাইল এবং ঐ বাখারি ইত্যাদি দ্বারা পঞ্চবটীর চারিদিকে একটা বেড়া প্রস্তুত

করিয়া দিল। শাস্ত্র বলেন, অনন্যচিত্ত হইয়া যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, অথবা সিদ্ধসঙ্কল্প পুরুষের কল্পনা আপনা হইতেই কার্য্যে পরিণত হয়। এই ঘটনা হইতে আমরা উহার প্রমাণ পাই। পঞ্চবটীর বেড়ার নীচে রামকৃষ্ণ অনেকগুলি অপরাজিতার চারা লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার যত্ন ও নিয়মিত জলসেকে পঞ্চবটীর চারা পাঁচটী দ্রুত বাড়িতে লাগিল। আর অপরাজিতার চারাগুলি অল্পকালেই উহাদিগের চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল। এখন হইতে রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে বসিয়াই ধ্যান করিতেন। এই পঞ্চবটীমূলেই তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের কঠোর সাধনা সমাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চবটীর পাঁচটী গাছের মধ্যে বিল্ব, অশোক ও ধাত্রী, এই তিনটী গাছই বহু পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পঞ্চবটীর ঠিক উত্তরেই যে প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ যুগ্মভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা রামকৃষ্ণের পঞ্চবটী রোপণের পূর্ব্বেই সেখানে ছিল। এই যুগ্ম বৃক্ষমূলেও রামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। আর যে বিরাট মাধবী-লতা বট ও অশ্বত্থ গাছকে জড়াইয়া রহিয়াছে, উহা রামকৃষ্ণ পরবর্ত্তী কালে তীর্থ-ভ্রমণের সময় ৺বৃন্দাবন হইতে আনিয়া রোপণ করেন।

৺কালিকামাতার অশেষ কৃপা লাভ করিয়াও রামকৃষ্ণের সাধনা সমাপ্ত হইল না। তিনি কিছুকালের জন্য শান্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রবল ধর্ম্মপিপাসা তাঁহাকে পুনরায় অস্থির করিয়া তুলিল। রামকৃষ্ণ জানিতেন, যিনি যেরূপে

ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইরূপেই দেখা দেন। কেহ বা কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী রূপে তাঁহার সাধনা করেন। আবার কেহ বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি পরম দেবজ্ঞানে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা সমূহ শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরাবতার রূপে ভগবানের আরাধনা করায় ভারতবর্ষে বহু দেবতার উপাসনা ও বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। আবার খৃষ্টান ও মুসলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই অসংখ্য ধর্ম্ম মতের মূলে যে একই সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য রামকৃষ্ণের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামকৃষ্ণের মন প্রথমে নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি আপনাতে বীরভক্ত হনুমানের ভাব আরোপ করিয়া তাঁহার ন্যায় দাসভাবে ৺রঘুবীরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তদ্গতচিত্তে মহাবীরের ভাব সাধনা করায়, তিনি অল্প কাল মধ্যে নিজের পৃথক্ বুদ্ধি হারাইয়া আপনাকে মহাবীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার সকল চেষ্টা হনুমানের অনুরূপ হইয়া গেল। তিনি ফলমূলাদি ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিতেন না, লম্ফ দ্বারা পথ চলিতেন এবং কাপড়ের খুঁটখানা লেজের মত করিয়া কটিতে বাঁধিয়া রাখিতেন। তিনি অনুক্ষণ 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া চীৎকার করিতেন এবং

দিনের অনেক সময়ই চঞ্চল-স্বভাব হনুমানের ন্যায় গাছের ডালে বসিয়া থাকিতেন; এমন কি তাঁহার শৌচ-প্রস্রাবও সেখানে বসিয়াই চলিত।

মহাবীরের ভাব সাধন কালে রামকৃষ্ণ কিরূপে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তিনি যে এই কালে রামময়-জীবিতা সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ সময়ে একদিন রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্য নারী-মূর্ত্তি, রূপে চারিদিক আলো করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নারীর করুণ দৃষ্টিতে স্নেহ ও প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রমণী কাহারও চিন্তায় উন্মাদিনী। হঠাৎ কোথা হইতে একটা হনুমান্ আসিয়া ঐ মাতৃমূর্ত্তির পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিটী রামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহার অঙ্গে মিলাইয়া গেল। রামকৃষ্ণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে সীতাদেবী কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। রামকৃষ্ণের নিজ উক্তি কিন্তু এই ঘটনার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় জাগাইয়া দেয়। তিনি বলিতেন, "প্রথমেই জনমদুঃখিনী সীতাকে দর্শন করে, আমার জনমটা দুঃখে দুঃখেই গেল"। এই কথা হইতে বুঝা যায় তিনি মা কালীর দর্শন লাভের পূর্ব্বেই বিষ্ণুমন্দিরে পূজা-কালে দাস্যভাব সাধন করিয়া সীতাদেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। কিন্তু এককালে বিষ্ণুমন্দিরে পূজাদি করা ও সারাদিন হনুমানের

ন্যায় চঞ্চল ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকা, সেখানেই শৌচ প্রস্রাবাদি করা, লম্ফ প্রদানে পথ চলা ইত্যাদিই বা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, মা কালীর দর্শন লাভের পর মন্দিরের কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া তিনি দাস্য ভাবের সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি পূর্ব্বেই বিষ্ণুমন্দিরে পূজাকালেও একবার সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। কারণ তাঁহার ন্যায় অতুলনীয় দৈবী সম্পাদ্ যুক্ত মানবের পক্ষে ইহা অনায়াসে সম্ভব হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজা-কালেও তিনি নানাভাবে অল্প বিস্তর সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

শরীর ও মনের মধ্যে পরস্পর কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা শরীরধারী মনুষ্যমাত্রই ভালরূপে জানেন। মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে শরীরের পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান-সম্মতও বটে। রামকৃষ্ণের উক্তিতেও আমরা ইহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকি। তিনি পরবর্ত্তী কালে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহাবীরের ভাব সাধন কালে তাঁহার মেরুদণ্ডের শেষভাগটা ল্যাজের মত এক ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল এবং ঐ ভাব সাধনের পর ক্রমশঃ উহা পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

রামকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাব সমূহের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাণী রাসমণি এবং মথুর বাবু বার বার তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইলেও, তাঁহার অপরূপ কার্য্য-

কলাপ লক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেন। কিছুকালের মধ্যে কখন মা, মা রবে আকুল ক্রন্দন, কখন রঘুবীর, রঘুবীর করিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার ও লম্ফ প্রদানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন ইত্যাদি তাঁহার বিভিন্ন আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাণী ও মথুর বাবু ভাবিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা রামকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন; এই জন্য কলিকাতার জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কিছুকাল তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। আবার অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের ফলেও ঐরূপ হইয়া থাকিতে পারে এবং স্ত্রীলোকের সহবাসে তাঁহার চঞ্চল স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ভাবিয়া মথুর বাবু কলিকাতার বিখ্যাত সুন্দরী বারাঙ্গনাগণের সাহায্যে দুইবার তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; উলঙ্গপ্রায় মোহিনী নারীগণের কামোদ্দীপক হাবভাবও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না। দুইবারই রামকৃষ্ণ তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিবামাত্র মা মা বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার পুরুষাঙ্গ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া নিজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল*। সর্ব্বদা বিকার-রহিত দেখিয়া রামকৃষ্ণকে আজন্ম পুরুষত্বহীন বলিয়াও কখন কখন তাঁহাদের সংশয় হইত। এতদূর নির্ব্বিকার ভাব মানুষ কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

---

* যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ গীতা ২।৫৮

স্ত্রীমাত্রেই রামকৃষ্ণের দৃঢ় মাতৃভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি রাণী ও মথুর বাবুর শ্রদ্ধাভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা বাবার সেবাযত্নে অধিক মনোযোগ দিলেন। স্ত্রীসহবাসে মাতুলের রোগ সারিয়া যাইতে পারে ভাবিয়া, একবার হৃদয়ও তাঁহাকে কথায় কথায় এই বিষয়ে ইঙ্গিত ও উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহার উপদেশে কাণ দিলেন না। হৃদয় ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি গোপনে সকল ব্যবস্থা করিয়া একদিন রামকৃষ্ণের অজ্ঞাতে তাঁহার গৃহে এক সুন্দরী যুবতীকে প্রবেশ করাইয়া রাখিলেন। রামকৃষ্ণ ঐ যুবতীকে দেখিবামাত্র বালকের ন্যায় মা মা বলিয়া ভয়ে ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। ইহা হৃদয়ের কার্য্য বুঝিতে পারিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

কামকাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ী লোকেরা রামকৃষ্ণের ত্যাগের ভাব, তাঁহার বালকের ন্যায় আচরণ ও মাতার উপর একান্ত নির্ভরের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়া ভাবিত। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সকল আচরণ কঠোর সাধনার ফল বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। সাধনার আরম্ভ হইতে প্রায় তিন বৎসর পরে, ১২৬৫ সালে রামকৃষ্ণ একবার পাণিহাটীর মহোৎসব দেখিতে যান। সেখানে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবচরণ তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে তিনি সারাদিন তাঁহার সহিত উৎসবানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন এবং কেশবকেই একমাত্র মুক্তিদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি ভাগবতের বড় পণ্ডিত এবং ভক্তিমান্‌ও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধন-পদ্ধতি বড়ই কুৎসিৎ ছিল। তিনি সহজিয়া বা কর্ত্তাভজা মতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিতেন। এই সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক বীরাচারিগণের পঞ্চ'ম'কার লইয়া সাধনের অনুরূপ এবং ইহাতেও সাধক ও সাধিকাগণের পদে পদেই পতনের সম্ভাবনা থাকে। সহজ মতে সাধন এত কঠিন যে, ইহা প্রায়ই ধর্ম্মের নাম ও আবরণে কুৎসিৎ ব্যভিচারে পরিণত হয়। এই ভাবেতে দেবপূজাদির কোন স্থান নাই; সাধক ও সাধিকাগণ আপন আপন প্রেমপাত্রী অথবা প্রেমপাত্রে ভগবানের ভাব (কৃষ্ণ ও রাধা ভাব) আরোপ দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া সহজ প্রবৃত্তির সহায়েই সংযম ও ইন্দ্রিয়-জয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, নিজ ভালবাসার পাত্রকে ইষ্টজ্ঞানে চিন্তা করিলে, মন সহজেই ভগবানে অনুরক্ত হয় এবং তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। তাই বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণকে বলিতেন, "মানুষের মধ্যে যখন ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারবে, তখন জানবে পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে"।

বিশ্বাস ও সংশয় সর্ব্বদাই পাশাপাশি চলে। রামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে বিশ্বাসবান্ হইলেও পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ একবার ভাবিলেন, তিনি বাস্তবিক ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই নিমিত্ত তিনি একদিন রামকৃষ্ণকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাছিবাগান নামক পল্লীতে

তাঁহাদের কর্ত্তাভজা সমাজে লইয়া যান। প্রথমেই প্রেমিকা 'রাধাগণ' রামকৃষ্ণকে ঘিরিয়া বসিল। ক্রমে তাহারা তাঁহাকে নানা ভাবে প্রেম যাচিয়া প্রলোভিত ও পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি নিজ স্বভাব-সুলভ মা মা রবে বার বার সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। সহজ মতের সাধকগণ ইন্দ্রিয়-জয়ী জ্ঞানী পুরুষকে সিদ্ধ, সহজ, অটুট প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবচরণ ও উপস্থিত সহজপন্থী'রা রামকৃষ্ণকে অটুট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। বৈষ্ণবচরণ যে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের সমাজে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা রামকৃষ্ণ পূর্ব্বে একটুও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সেদিনকার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সহজ মতে সাধনের নামে সর্ব্বদাই ব্যভিচার চলে বলিয়া, তিনি ঐ কদর্য্য মতের সাধন দ্বারা ভগবান্ লাভকে পায়খানার রাস্তা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করার সহিত তুলনা করিতেন।

আশা-বাসনা ও কাম-ক্রোধে জড়িত মানব আমরা কেবলমাত্র কল্পনা করিতেই পটু; কল্পনাতে নিমেষ মধ্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একটা সামান্য কল্পনাকেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। রামকৃষ্ণের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি কর্ত্তব্য বিষয়ে শুধু কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, বহু কষ্টসাধ্য হইলেও ঐ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেন। জগৎ মিথ্যা,

অতএব উহার অন্তর্গত ধন, মান, কামনা, যশ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, দু'দিনের বই নয়। উহারা ঈশ্বর লাভের পথে বাধা জন্মায় এবং মুক্তিকামিগণের ত্যজ্য। এই কথা মনে উদিত হইবামাত্র অর্থ-লিপ্সা ও কাঞ্চনাসক্তি সমূলে নষ্ট করিবার জন্য একদিন রামকৃষ্ণ কয়েকটী টাকা ও কিছু মাটী হাতে লইয়া বার বার 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' বলিতে বলিতে টাকা ও মাটী সমান বোধে দুইই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। যে অর্থের সন্ধানে দুনিয়া-শুদ্ধ লোক দিনরাত পাগলের মত ছুটিতেছে, খাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, রামকৃষ্ণ তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অর্থলাভের বাসনা চিরকালের জন্য দূর হইল। রামকৃষ্ণের স্বভাব বালকের তুল্য। গঙ্গাজলে টাকা ফেলিয়া তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে টাকার সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মীও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্মীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমি তোমার ধনের ঐশ্বর্য্য চাই না; তাই বলিয়া তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ে বাস কর"।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সাধু-সন্ন্যাসী ও দীন-দরিদ্রের সেবা লাগিয়াই ছিল। বিশেষতঃ গঙ্গাসাগরের মেলার সময়ে তথায় বহু সাধু-মহাপুরুষের সমাগম হইত। কারণ সেখানে প্রচুর ভিক্ষা মিলিত, আর দিশা জঙ্গলের (শৌচের নিমিত্ত জল ও ঝোপ-জঙ্গলপূর্ণ নিরালা জায়গা) ও অভাব ছিল না। রামকৃষ্ণ-কথিত একটী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি এই কালের কোন

সময়ে কিছুকাল আসন, প্রাণায়ামাদি হঠযোগের বিবিধ প্রক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরাগত সাধুদিগের মধ্যে কাহারও নিকট উপদেশ লাভ করিয়াই তিনি হঠযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। কারণ গুরুর উপদেশ ও সহবাস ভিন্ন হঠযোগ সাধন করিলে সুফল পাওয়া দূরের কথা, প্রায়ই নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। রামকৃষ্ণ বলিতেন, একদিন হলধারীকে কোনও অন্যায় কার্য্য ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, হলধারী রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই কনিষ্ঠ হইয়া আমাকে অপমান করিলি, তোর মুখে যেদিন রক্ত উঠিবে, সেদিন ইহার ফল বুঝিতে পারিবি"। হলধারী সিদ্ধবাক্ ছিলেন। তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহা ফলিয়া যাইত। ইহার কিছু দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর বাস্তবিকই রামকৃষ্ণের তালুদেশ হইতে মুখের মধ্য দিয়া প্রচুর রক্ত পড়িতে লাগিল। এই খবর পাইয়া হলধারী প্রভৃতি কালীবাটীর অনেকেই রামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বেশ একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। সেই দিন কালীবাড়ীতে একজন প্রাচীন ও অভিজ্ঞ সাধু উপস্থিত ছিলেন। তিনিও হট্টগোল শুনিয়া ঘটনা স্থলে আসিলেন এবং সিম পাতার রসের ন্যায় রক্তের ঘন সবুজ রং, গাঢ়ত্ব ও নির্গমস্থান প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণকে বলিলেন, "ভয় নাই; এই রক্তপাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং ইহাতে ভালই হইয়াছে; তোমার শরীরটা এযাত্রা রক্ষা পাইল। তুমি নিশ্চয় হঠযোগ সাধন করিতে, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়াছে।

এইরূপে রক্তপাত না হইয়া রক্তটা মাথায় উঠিয়া গেলে জড়-সমাধি-যোগে তোমার শরীর নষ্ট হইয়া যাইত”।

উত্তর-কালে রামকৃষ্ণ শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে কাহাকেও হঠযোগ সাধন করিতে বলেন নাই। বরং কেহ হঠযোগ সাধন করিতে অথবা ঐ বিষয়ে জানিতে চাহিলে তিনি তাহাকে নিরুৎসাহ করিতেন। তিনি বলিতেন, এই কালের অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ লোকের পক্ষে হঠযোগ সাধন মোটেই উপযোগী নয়। নারদীয়া ভক্তিকেই তিনি বিশেষভাবে এইকালের উপযোগী ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

রামকৃষ্ণের বিবাহ, রাসমণির দেহান্ত ও চন্দ্রাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন

(১৮৫৮—৫৯, ১৮৬১, ১৮৬৩)

রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি বর্ত্তমানে আটষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা। ১২৪৯ সালে ক্ষুদিরামের পরলোক গমনের পর একে একে ষোড়শ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; পতিপ্রাণা চন্দ্রা নানা সুখদুঃখ ও অভাব-অনটনে কষ্টে কাল হরণ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে সংসারের মায়া কাটাইয়া চিরকালের জন্য সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমণি এখনও সেই দারুণ শোক-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান নাই। আবার ইতিমধ্যেই তিনি শুনিতে পাইলেন, রামকৃষ্ণ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মন্দিরের পূজাদি কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। চন্দ্রমণির

শোকাগ্নিতে পুনরায় ঘৃতাহুতি পড়িল। শোকাকুলা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রামেশ্বর অবিলম্বে ভ্রাতাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

বাটীতে ফিরিয়াও রামকৃষ্ণের উন্মনা ভাব কাটিল না। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে তিনি বন্ধুবান্ধব ও গ্রামের স্ত্রীপুরুষগণকে লইয়া সারাদিন মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার পাঠ, সঙ্গীত ও রঙ্গরসে সকলের হৃদয় আনন্দে ভরপূর থাকিত। কিন্তু এখন আর তাঁহার সেই ভাবটী নাই। তিনি কাহারও সঙ্গে তেমন করিয়া মিশেন না, সকল সময় পাগলের মত বিড় বিড় করিয়া কি বলেন; আর একমনে কি যেন চিন্তা করেন। রামকৃষ্ণ সারাদিন একস্থানে বসিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে মা, মা রবে আকুল ক্রন্দন করিয়া চারিদিকের লোককে চঞ্চল করিয়া তুলেন। পুত্রের চিন্তায় চিন্তায় চন্দ্রাদেবীও অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন; কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহার রোগের প্রতীকারের জন্য যে যাহা বলে, তাহাই করেন; ঔষধ-পথ্য, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক কিছুই করিবার বাকী রহিল না। কিন্তু বৃদ্ধার সকল চেষ্টাই বিফলে গেল, পুত্র নিরাময় হইল না।

এইকালে একদিন রামকৃষ্ণ হরিনামে মত্ত হইয়া শ্রীনিবাস শাঁখারি ও বাল্যবন্ধুগণকে বলিলেন, "ওরে তোদের পায়ে পড়ি, তোরা একবার হরিবোল বল"। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহাদের পায়ে পড়িতে গেলেন। শ্রীনিবাসের ডাকনাম চিনু। চিনু

গ্রামমধ্যে একখানা সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা উপায় করিত। রামকৃষ্ণ যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখন মধ্যে মধ্যে চিনুর দোকানে যাইয়া বসিতেন। পরম বৈষ্ণব ও ভক্তিমান্ চিনু বয়সে অনেক বড় হইলেও রামকৃষ্ণকে খুব ভালবাসিত ও ভক্তি করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইত। অনেকে রামকৃষ্ণকে উন্মনা বলিয়া মনে করিলেও চিনু তাঁহার স্বভাব ভালরূপে জানিত। হরিবোল বলিবার কথায় চিনু বুঝিতে পারিল, রামকৃষ্ণ নবানুরাগের বশে জাতিবিচার, ছোটবড় সব ভুলিয়া সকলের পায়ে পড়িতে যাইতেছেন। তাই সে বলিয়াছিল, "ওরে, তোর এখন প্রথম অনুরাগ ; প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধূলা উড়ে, তখন আম গাছ, তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়"।

কিছুদিন পর রামকৃষ্ণ আপনা হইতেই অনেকটা শান্ত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি অনুক্ষণ মাতার দর্শন পাইয়াই ঐরূপ শান্ত হইয়াছিলেন। ভূতিরখাল ও বুধুইমোড়ল নামক গ্রামের যে শ্মশান দুইটার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামকৃষ্ণ বর্ত্তমানে ঐ শ্মশানদ্বয়ের কোনও একটীতে দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এদিকে উন্মনা পুত্রকে কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে দেখিয়া চন্দ্রমণি আত্মীয়গণের পরামর্শে তাঁহার বিবাহের জন্য চারিদিকে পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাদের মনের মত পাত্রী জুটিল না। ক্রমে এই কথা রামকৃষ্ণের কাণে পৌঁছিল। রামকৃষ্ণ বিবাহ করা সম্বন্ধে ৺জগন্মাতার ইঙ্গিত পাইয়া, এই বিষয়ে কোনই আপত্তি

করিলেন না, বরং অনেক চেষ্টায়ও পাত্রীর সন্ধান মিলিতেছে না জানিতে পারিয়া, নিজেই একটী পাত্রীর কথা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন। পাত্রীটী কামারপুকুর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা, নাম সারদামণি। শ্রীমতী সারদামণি তখন সবে মাত্র পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছেন। কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিধির বিধান, কাহারও হাতে নয়। সারদামণি নিতান্ত বালিকা হইলেও তাঁহার সহিতই চব্বিশ বৎসর বয়স্ক রামকৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইল।

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে সারদামণির সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হয়। কাল এবং কুলপ্রথা অনুযায়ী চন্দ্রাদেবী এই বিবাহে কন্যার পিতাকে তিন শত টাকা পণ দিয়াছিলেন। পুত্রের বিবাহের পর চন্দ্রাদেবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সারদামণি নেহাৎ বালিকা; স্বামী, শ্বশুরবাড়ী ইত্যাদি সম্বন্ধে তখনও তাঁহার কোন ধারণাই জন্মে নাই। বিবাহের পরেও তিনি পাড়ার অন্যান্য বালিকার সহিত খেজুর গাছের তলায় তলায় কোচড়ে করিয়া খেজুর কুড়াইয়া বেড়াইতেন। প্রথম বার কামারপুকুরে যাইয়াও তিনি খেজুর কুড়ানটা বাদ দেন নাই। বিবাহের কয়েক দিন পরেই বালিকা-বধূ সারদামণি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মাতার আগ্রহাতিশয্যে আরও দেড় বৎসরের অধিক কাল কামারপুকুরে বাস করিয়া ১২৬৭ সালের শীতকালে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। এই দেড় বৎসর কাল

রামকৃষ্ণ ভূতিরখাল ও বুধুইমোড়লের শ্মশানে কঠোর সাধনা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রায়ই হাঁড়িতে করিয়া মোয়া, লাড়ু, মিষ্টান্নাদি আহার্য্য শ্মশানে লইয়া যাইতেন এবং উহা দ্বারা ডাকিনী, যোগিনী ও ভূতপ্রেতাদি মায়ের প্রমথ ও শিবাগণের তুষ্টিবিধান করিতেন। কখন কখন মোয়ালাড়ু শুদ্ধ হাঁড়ি শূন্যে উঠিয়া আকাশে মিলাইয়া যাইত। প্রায় প্রতিদিন রামেশ্বর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভ্রাতাকে আহারের নিমিত্ত ডাকিতে যাইতেন। রামকৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহার ডাক শুনিয়া অনেক সময়ে বলিতেন, "দাদাগো, তুমি আর এদিকে এসো না, এরা তোমার অনিষ্ট করতে পারে"। দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিবার ঠিক পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে একবার শ্বশুর বাড়ী যাইয়া সারদামণি সহ কামারপুকুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহের পর দেড় বৎসর পিত্রালয়ে থাকিয়া সাত বৎসরের বালিকা সারদামণি এই সময়ে প্রথম বার স্বামীর চরণ দর্শন করেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পরে ছয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই তিনি অমরধামে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণ দেশ হইতে ফিরিবার অল্প কয়েক দিন পর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে (১২৬৭ সালের শেষ) রাণী ক্রমাগত জ্বর ও অজীর্ণাদি রোগে ভুগিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার অজীর্ণ-রোগ উৎকট গ্রহণীতে পরিণত হইল। রাণী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল

নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন মাস পরে রাসমণি উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণায় যে তিন লাট জমিদারী ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার দেবোত্তর দানপত্র করিতে পারেন নাই। এখন তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মাত্র দুইজন ঐ সময়ে জীবিতা ছিলেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি মাতার একান্ত অনুরোধ সত্বেও দেবোত্তরের সম্মতি-পত্রে সহি করিতে রাজী হইলেন না। তজ্জন্য রাণী জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে প্রাণে এক দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যেই পীড়ার আক্রমণ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা রাণী স্বয়ং এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী সম্মতি-পত্রে সহি করিলেন। দেহত্যাগ কালে রাণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, মৃত্যুশয্যায় রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া তিনি যে বিষয় প্রতীকারের জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন, অল্পকাল পরেই তাহা হুবহু ফলিয়া গিয়াছে। রাণীর দেহান্তের মাত্র কয়েক বৎসর পর হইতেই কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া তাঁহার দৌহিত্রগণের মধ্যে বিষম বিবাদ ও মোকদ্দমা চলিয়াছে। ফলে দেবোত্তর সম্পত্তি একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাসমণি প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আপন ইষ্টদেবতা ৺কালিকামাতার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে রাণী কালীঘাটে

আদিগঙ্গার তীরবর্ত্তী নিজ বাটীতে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে, তিনি ইষ্টদেবী ৺কালিকামাতার দিব্য দর্শন লাভে উল্লসিতা হইয়া আপন মনে মাতার সহিত কথা বলিতে বলিতে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাসমণির জামাতা মথুরামোহন এতকাল শ্বশ্রূমাতার নির্দ্দেশানুযায়ী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, এখন হইতে তিনি এই বিষয়ে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন। রামকৃষ্ণের পবিত্র সঙ্গগুণে তাঁহার দেবদ্বিজে ভক্তি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। অতুল ধনসম্পদ এবং বিরাট কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইয়াও মথুরামোহন বিষয়মদে মত্ত হইলেন না। মাতৃভক্ত মথুর দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের দেবচরিত্রে অধিকতর মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাধনার সহায়তা করিতে লাগিলেন; ভক্তিভরে তাঁহার সেবা করাই যেন মথুরের প্রধান কর্ত্তব্য রূপে পরিগণিত হইল। ৺জগদম্বার বরপুত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মথুরামোহনও ধন্য হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া ৺ভবতারিণীর সেবাপূজা লইয়া ব্যস্ত আছেন। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই ভাবের আধিক্যে তাঁহার মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্রমে পূর্ব্ববৎ তাঁহার শরীরের জ্বালা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল; নিদ্রা যেন তাঁহার চক্ষু হইতে কোথায় অদৃশ্য হইল। শরীরের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এবারও মথুর বাবু তাঁহাকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীন রাখিলেন। কিন্তু অনেক ঔষধ, তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও কোন ফল হইল না ; যন্ত্রণা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

চন্দ্রাদেবী কিছুকাল রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্তা ছিলেন। কিন্তু পুত্রের অনিদ্রা, গাত্রদাহ প্রভৃতি অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার চিত্ত পুনরায় চঞ্চল হইল। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, চন্দ্রা পুত্রের আরোগ্য-কামনায় পর পর কামারপুকুর ও মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলেন। শীঘ্রই দেবতার অনুগ্রহে তিনি জানিতে পারিলেন, ঈশ্বরীয় ভাবের আতিশয্যেই তাঁহার পুত্রের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তিনি দিব্যোন্মাদ হইয়াছেন। ইহাতে চন্দ্রাদেবী অনেকটা শান্ত হইলেন। মথুর বাবু প্রমুখ রামকৃষ্ণের ভক্ত ও হিতৈষিগণও ক্রমে এই কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে ১২৭০ সালের কোনও সময়ে চন্দ্রমণি পুত্রের নিকট বাস করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। এখানে তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে বাস এবং পুত্রের সেবাযত্ন করিয়া কতকটা শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহার পর বৃদ্ধা চন্দ্রমণি আর কামারপুকুরে ফিরিয়া যান নাই। শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কালীবাটীতেই উত্তর দিকের নহবতের নীচের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। তিনি প্রত্যহ প্রাতে মাতাকে দর্শন ও প্রণাম

করিয়া তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সাক্ষাৎ ৺জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে তাঁহার সেবা ও যত্ন করিতেন। সারাদিন ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিলেও, এই বিষয়ে তাঁহার কখন ভুল হইত না।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তন্ত্রমত সাধন

(১৮৬১—৬৩)

রাসমণি দেবালয় নির্ম্মাণের জন্য যে ষাট বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন, আনুমানিক উহার এক তৃতীয় বা চতুর্থাংশ জমির উপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মন্দিরবাটী অবস্থিত। বাকী জায়গাতে নানা জাতীয় সুরভি পুষ্প ও আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান এবং বাবুদের কুঠী, আস্তাবল, গোশালা প্রভৃতি বিদ্যমান; আবার কতকটা জায়গা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। গাজীতলার পুকুর ও হাঁস পুকুর নামে দুইটী পুষ্করিণীও কালীবাটীর মধ্যে রহিয়াছে। চকমিলান মন্দিরবাটীর পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকের তিন সারি অল্প-পরিসর দালান, ভাঁড়ার ও মায়ের ভোগ রাঁধিবার ঘর, অতিথিশালা, ভোজনাগার, দপ্তরখানা ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থান রূপে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর পশ্চিম দিকে এক সারিতে দ্বাদশ শিব-মন্দির। শিব-মন্দির শ্রেণীর ঠিক মধ্যস্থলে একটী খোলা হল-ঘর, চাঁদনী নামে অভিহিত হইত। চাঁদনীর উত্তরে ছয়টী এবং দক্ষিণে ছয়টী শিব মন্দির, একই সারিতে। উত্তর দিকের দালান সারির ঠিক মধ্যস্থলে

মন্দিরবাটীর প্রবেশ-পথ। চাঁদনীর খোলা হল-ঘরের মধ্য দিয়াও মন্দিরে যাওয়া যায়। যাঁহারা নৌকাযোগে কালীবাটী দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা চাঁদনীর পার্শ্বস্থিত প্রশস্ত সোপানযুক্ত গঙ্গার বাঁধা ঘাটে নামিয়া ঐ দিকেই মন্দিরে চলিয়া যান। যাঁহারা হাঁটা পথে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ সদর ফটকে কালীবাটীতে প্রবেশ করিয়া উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। আর দক্ষিণেশ্বর গ্রামের লোকেরা উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত খিড়কির দরজা দিয়া কালীবাটীতে আসেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে ৺রাধাগোবিন্দজীর মন্দির পশ্চিম-মুখী, যুগল বিগ্রহ পশ্চিমাস্য; কালীমন্দির দক্ষিণ-মুখী, মা ভবতারিণী দক্ষিণাস্যা; আর শিব-মন্দির শ্রেণী পূর্ব্বমুখী, উহাদের মধ্যে নাকেশ্বর, নির্জ্জরেশ্বর, নকুলেশ্বর প্রমুখ দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গার বড় ঘাটটীর উত্তর দিকে কিছু দূরে কালীবাটীর মধ্যেই মহিলাদিগের স্নানের নিমিত্ত আরও একটী ছোট বাঁধান ঘাট রহিয়াছে। উহার পার্শ্বে একটী বৃহৎ বকুল গাছ দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিত। বকুলতলার ঘাটের ঠিক পূর্ব্বে একটী নহবৎখানা, ছোট দ্বিতল পাকা ঘর। উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাবুদের কুঠী, একটী দ্বিতল দালান। এই দালানটী বহু পুরাতন। কালীবাটীর জমি ক্রয়ের অনেক পূর্ব্বে ইহা নীলকরের কুঠী ছিল। রাসমণির পরিবারের কেহ কালীবাটীতে আসিলে, এই গৃহে বাস করিত। বর্ত্তমানে কালীবাটীর যে ঘরখানি রামকৃষ্ণের বাসগৃহ বলিয়া

সুপরিচিত, রামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত থাকায় যে ঘরটী ৺কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ও কৈলাসের তুল্য পবিত্র, মহাতীর্থ রূপে গণ্য হইয়াছে, রামকৃষ্ণ কালীবাটীতে আসা অবধি পূর্ব্বাপর এই গৃহে বাস করেন নাই। শেষ দিকের ষোল বৎসর তিনি এই গৃহে ভক্তগণ লইয়া ঈশ্বরীয় ভাবে মাতিয়া ছিলেন। প্রথম চৌদ্দ বৎসর তিনি বাবুদের কুঠীর নীচের তলায় পশ্চিম দিকের ঘরটীতে বাস করিতেন।

১২৬৮ সালের প্রথম ভাগে একদিন সকাল বেলা একখানি নৌকা আসিয়া কালীবাটীর বকুলতলার ঘাটে লাগিল। রামকৃষ্ণ অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, নৌকা হইতে এক প্রৌঢ়া রমণী তীরে নামিয়া চাঁদনীর দিকে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক বসন, কেশদাম আলুলায়িত, আর উজ্জ্বল অঙ্গ-কান্তি গৈরিকের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। ভৈরবী বেশধারিণী রমণীর অচঞ্চল দৃষ্টি ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল তাঁহার আন্তরিক সৌষ্ঠবেরও পরিচয় দিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণের বড় আপনার জন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই আকর্ষণ রূপজ মোহ নয়; ইহা চিত্তের একতানতা, অন্তরের টান।

রামকৃষ্ণ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভাগিনেয় হৃদয়ের সাহায্যে ভৈরবীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাতুল কেন অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীকে ডাকিতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হৃদয় সাতপাঁচ ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে মাতুলের ভাবভক্তির কথা বলিয়া তাঁহাকে মাতুলের গৃহে লইয়া

আসিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণকন্যা, সুপণ্ডিতা এবং সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী ছিলেন। আবার তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই তন্ত্রমত সাধনের উত্তম অধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

রামকৃষ্ণ ভৈরবীর প্রতি যেরূপ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, ভৈরবীও তাঁহাকে দেখিয়া ততোধিক আকৃষ্টা হইলেন। তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা চলিল। রামকৃষ্ণ কথা-প্রসঙ্গে নিজ অবস্থা ও অনুভবাদির কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; লোকে যে তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করে, তিনি এই কথাও ভৈরবীকে বলিলেন। দীর্ঘকাল একমনে ঈশ্বর-চিন্তার ফলে যে এইরূপ একটা অবস্থা আসিয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণী বেশ ভাল-রূপেই জানিতেন। কারণ শাস্ত্রের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে, মহাপুরুষগণের জীবনেও এইরূপ ঘটনা বিরল নয়, আবার ব্রাহ্মণী নিজ জীবনেও এই বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন রামকৃষ্ণের এই অবস্থা ও অনুভূতি সমূহ অনবরত ঈশ্বরচিন্তা ও তীব্র ব্যাকুলতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথায় কথায় বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তৎপর ব্রাহ্মণী প্রসঙ্গ শেষ করিয়া স্নানাহারের আয়োজনে মন দিলেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী পঞ্চবটীমূলে আসন স্থাপন করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন মন্দিরের ভাণ্ডার হইতে সিধা লইয়া স্বহস্তে রাঁধিতেন এবং আপন কণ্ঠস্থিত ৺রঘুবীর শালগ্রাম শিলার ভোগ দিয়া নিজে প্রসাদ পাইতেন।

এইকালে রামকৃষ্ণ ও ভৈরবীর মধ্যে সারাদিন শাস্ত্রালোচনা চলিত। ব্রাহ্মণী প্রায় এক সপ্তাহ কাল কালীবাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই দেবমণ্ডলের ঘাটে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে রামকৃষ্ণ অসহ্য গাত্রদাহে ভুগিতেছিলেন। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অনেক সময় তিনি গঙ্গায় নামিয়া শরীরটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবাইয়া রাখিতেন। আবার ঘরের পাকা, পাথরে বাঁধান মেঝেতে জল ঢালিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া উহার উপরও পড়িয়া থাকিতেন। কয়েক দিন তাঁহার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ গাত্রদাহ প্রবল ঈশ্বরানুরাগের ফল; উহা সাধারণ ব্যাধি নয়, যোগজ বিকার। ভৈরবী জানিতেন, ভগবদ্‌বিরহে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য-দেবের এইরূপ শারীরিক বিকার উপস্থিত হইত এবং সর্ব্ব-শরীরে চন্দন লেপন ও সুগন্ধ ফুলের মালা ধারণ করিয়া তাঁহারা শরীরের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতেন। ব্রাহ্মণীর পরামর্শ ও মথুর বাবুর উদ্যোগে মাত্র তিন দিন অঙ্গে চন্দন লেপন ও ফুলের মালা ধারণ করিয়াই রামকৃষ্ণের শরীরের জ্বালা একেবারে দূর হইয়াছিল।

ইহার কিছুকাল পরে রামকৃষ্ণের এক বিষম ক্ষুধার উদ্রেক হইল। পর পর অনেক বার আহার করিলেও তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। সবে মাত্র আহার করিয়া উঠিলেও, তখনই তাঁহার মনে হইত, পেট ভরে নাই, আবার খাইতে হইবে।

ক্ষুধার জ্বালায় রামকৃষ্ণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। দিবারাত্র তাঁহার মন কেবল খাই খাই করিত, অথচ অনবরত খাইলেও তৃপ্তি হইত না। রামকৃষ্ণ এই অবস্থার কথা ব্রাহ্মণীকে জানাইলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, সাধকদের কখন কখন এইরূপ রাক্ষুসে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেই উহা সারিয়া যাইবে। তারপর তিনি মথুর বাবুর সাহায্যে রামকৃষ্ণের বাসগৃহখানি অসংখ্য প্রকারের সন্দেশ, মিস্টান্ন, চিড়া মুড়কি প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি দিবারাত্র এই ঘরে থাক, আর যখন যাহা ইচ্ছা খাও। তাহা হইলেই তোমার এই ক্ষুধা দূর হইয়া যাইবে"। বাস্তবিকই তিন দিন এইরূপে থাকিবার পর রামকৃষ্ণের ঐ দারুণ ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। পরবর্ত্তী জীবনেও দুই চারি দিন সাময়িক ভাবে তাঁহার এইরূপ রাক্ষুসে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণী প্রতিদিনই কালীবাটীতে আসিয়া রামকৃষ্ণের সহিত শাস্ত্র-প্রসঙ্গে অনেক-ক্ষণ কাটাইতেন এবং গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া ফল, মিষ্টি, অন্ন, যখন যাহা পাইতেন, আনিয়া বাৎসল্য-ভরে তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। রামকৃষ্ণের ভাবভক্তি, মুহুর্মুহুঃ সমাধি, কীর্ত্তনে পরম উল্লাস প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মণীর বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরাবতারগণেরই ন্যায় আধ্যাত্মিকতার ঘনীভূত মূর্ত্তি।

দক্ষিণেশ্বরে আসা অবধি ভৈরবী ব্রাহ্মণী পূর্ব্বাপর একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি দেখিতেন, রামকৃষ্ণ প্রবল ঈশ্বরানুরাগ ও তীব্র ব্যাকুলতার ফলে সর্ব্বদা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে অবস্থান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সমাধিমগ্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মন সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার দর্শন ও অনুভূতি সমূহ ঠিক ঠিক হইতেছে অথবা উহারা মস্তিষ্ক বিকারের ফল, এই বিষয় লইয়া তিনি কখন কখন ভাবনায় পড়িয়া যান। ব্রাহ্মণী নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিলেন, রামকৃষ্ণ এতকাল নিজ অনুভূতি সমূহ গুরুবাক্য ও শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া লইবার সুযোগ পান নাই বলিয়াই তাঁহার মনে কখন কখন সংশয়ের উদয় হয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত সাধন সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা নিজ জীবনে উহাদের শাস্ত্রোক্ত ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কাজেই শাস্ত্রবাক্য ও প্রত্যক্ষাদি যে প্রকৃতই সত্য, এই বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তিনি স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণকেও তন্ত্রমতে সাধন এবং উহার বিভিন্ন ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া, তাঁহার মন হইতে সকল সংশয় দূর করিবেন। ব্রাহ্মণীর মনোভাব জানিতে পারিয়া রামকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন।

রামকৃষ্ণের ন্যায় চতুঃসাধন-সম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহার দ্বারা নিত্যই নূতন নূতন তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। ভৈরবী প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যাদি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল

সহায়ে তান্ত্রিক সাধনার অনুকূল একটী ত্রিমুণ্ড ও একটী পঞ্চমুণ্ড আসন প্রস্তুত করিলেন। আসনদ্বয়ের মধ্যে একটী কালীবাটীর উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বেল গাছের তলায় এবং অপরটী পঞ্চবটীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনায় বহু দুষ্প্রাপ্য উপকরণের প্রয়োজন হয়। ভৈরবী দূর-দূরান্তর হইতে ঐ সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতেন এবং রামকৃষ্ণ নিশাকালে তাঁহার নির্দ্দেশমত বেলগাছের তলায় অথবা পঞ্চবটীতে যথাবিধি তান্ত্রিক পূজাদি অনুষ্ঠান করিয়া জপধ্যানে মগ্ন হইতেন। এইরূপে প্রত্যহ নূতন নূতন তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রামকৃষ্ণ ঐ কালে নিত্যই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দিব্য দর্শনাদি লাভ করিতেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর অদম্য উৎসাহ ও ক্রমাগত দুই বৎসরের অধিক-কাল চেষ্টার ফলে রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সাধক সমাজে প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্রের প্রধান প্রধান ভাবগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি পাশ সমূহের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দ-স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তন্ত্রমত সাধন কালে তাঁহার নিত্যই জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর মূর্ত্তি সমূহ প্রত্যক্ষ হইত। বলা বাহুল্য, ঐ কালে তাঁহার কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি সম্যক্ জাগরিত হইয়াছিল এবং তিনি সুষুম্না মার্গে অবস্থিত পদ্ম ছয়টীর বিকাশ স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কখন কখন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ধ্বনির সারভূত বিরাট প্রণবের অনাহত রব শুনিতে পাইতেন, আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপ্রসূ ব্রহ্মযোনিও সর্ব্বদাই তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইত।

তন্ত্রমত সাধনের ফলে শাস্ত্র, গুরুবাক্য ও নিজ অনুভূতি সমূহের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া রামকৃষ্ণের সংশয় নির্ম্মূল হইল। কাজেই এখন হইতে আর তাঁহার মন সংশয়াপন্ন হইত না। ইহা দ্বারা তিনি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবনে কখনও তিনি ঐ সকল যোগবিভূতি লৌকিক কার্য্যে প্রয়োগ করেন নাই। কারণ তিনি ৺জগন্মাতার কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলেন, সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা মুক্তিকামী সাধকের পক্ষে অত্যন্ত হেয়; ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং তাঁহাকে লাভ করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইকালে একদিন রামকৃষ্ণ ধ্যানে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, অনেক টাকা, শাল, সন্দেশ, মেয়ে-মানুষ প্রভৃতি ভোগের সামগ্রী তাঁহার ভোগের জন্য সম্মুখে সাজান রহিয়াছে। তিনি মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন, তুমি কি এসব চাও?" কিন্তু তাঁহার বিষয়বিমুখ মন ভোগের দিকে একটুও ঝুঁকিল না; তিনি মাকে লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। তান্ত্রিক সাধনার পর রামকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সর্ব্বদাই লোকেরা তাঁহার আরক্তিম মুখরাগ ও রক্তবর্ণ বক্ষঃস্থলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। ইহা রামকৃষ্ণের মোটেই ভাল লাগিত না। কারণ বাহিরের রূপ দেখিয়া বিষয়ী লোক সেখানে জড় হইলে, উহারা তাঁহাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করিবে। ইহাদের সবিস্ময় দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি কাতর ভাবে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা, বাইরের রূপে আমার

প্রয়োজন নাই। ইহা লয়ে তুই আমার অন্তরটা এইরূপে রঙিয়ে দে"।

সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধকগণ পঞ্চ'ম'কার আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু উহাদের কোনটাই গ্রহণ না করিয়া তান্ত্রিক সাধনার চরম ফল সমূহ প্রত্যক্ষ করিলেন। এখন অসতী বা বেশ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সতীসাধ্বী সকল নারীতেই তাঁহার দেবীবুদ্ধি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আবার 'কারণের' নাম শুনিবামাত্র তাঁহার জগৎকারণের কথা মনে হইত এবং তিনি মাতৃভাবে বিভোর হইতেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নাম ছিল যোগেশ্বরী। তাঁহার জন্মস্থান কোথায় এবং তিনি বিবাহিতা ছিলেন কিনা এই বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' লেখক শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ ব্রাহ্মণীর বাড়ী যশোহর জিলায় ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা যোগেশ্বরী বৈরাগ্যবশে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার তুলনা হয় না। কিন্তু তিনি কাঁহার আশ্রয় বা সাহায্যে এই অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন ও সাধনায় অগ্রসর হন, তাহা জানা যায় নাই। তবে, দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বে, তিনি চন্দ্র ও গিরিজা নামক দুই ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, এই কথা

রামকৃষ্ণের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, চন্দ্র ও গিরিজা উভয়েই বরিশালের লোক এবং উচ্চদরের সাধক ছিলেন। চন্দ্র, সাধনায় অনেকটা অগ্রসর হইবার পর, সিদ্ধাই লাভ করিয়া বিপথগামী হন। মন্ত্রপূত গুটিকা সাহায্যে তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে, সকলের অলক্ষিতে, যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিতেন। এই অদ্ভুত শক্তির অপব্যবহারে তিনি চরিত্রহীন হইয়া পড়িলেন। ফলে তাঁহার সিদ্ধাইও বেশী দিন রহিল না। কোন এক অপকর্ম্ম করিতে যাইয়া হঠাৎ তাঁহার সিদ্ধাই নষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইলেন।

সিদ্ধাই বা অলৌকিক ক্ষমতা ভগবানের পথে মোটেই সহায় হয় না; বরং উহা সাধককে অহঙ্কৃত ও অন্যায় কার্য্যে রত করে। সুতরাং সিদ্ধাই সযত্নে ত্যাগ করা উচিত। তাহা ছাড়া দেহধারী জীবের পক্ষে কাম জয় করা দুরূহ ব্যাপার। যে অবস্থায় জীবের মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় হয়, সেই কামজিৎ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও, তখন প্রায়ই তাঁহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়। অতএব দেহ থাকা পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রাখিয়া সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থাকা ভিন্ন ইন্দ্রিয়-জয়ের আর অন্য উপায় নাই। এই কারণে, কাম জয় করিয়াছি বলিয়া কাহারও অহঙ্কৃত হওয়া উচিত নয়। রামকৃষ্ণের ন্যায় কামজিৎ পুরুষকেও একবার এইরূপ ভাবিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। তন্ত্রমত সাধনান্তে একদিন রামকৃষ্ণের মনে হইল, তাঁহার কামজয় হইয়াছে। ইহার পর পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে

তাঁহার মনে এরূপ কামের বেগ আসিল যে, তিনি অস্থির হইয়া মাটীতে মুখ ঘষিতে লাগিলেন, আর গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও এমন কথা বলব না। মা, ইহাই যদি হয়, তবে কিন্তু নিশ্চয়ই গলায় ছুরি দিব"। এইরূপে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মন হইতে কামভাব দূর হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের তন্ত্রমত সাধনের পরেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী অনেক কাল (৪।৫ বৎসর) দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালেই চন্দ্র ও গিরিজা তাঁহার খবর পাইয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। চন্দ্রের ন্যায় গিরিজারও একটী সিদ্ধাই ছিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ গিরিজাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই জনৈক ভক্তের বাগান-বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। ঈশ্বর-প্রসঙ্গে রাত্রি প্রায় এক প্রহর কাটিয়া গেল। তারপর, সেখান হইতে ফিরিবার সময় রামকৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতে অসমর্থ হইলে, গিরিজা আপন পৃষ্ঠদেশ হইতে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া কালীবাটীতে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধাই জ্ঞান লাভের পরিপন্থী বলিয়া, রামকৃষ্ণ ইহার কিছুকাল পরে গিরিজার সিদ্ধাইটী নষ্ট করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণের পবিত্র সঙ্গগুণে চন্দ্র ও গিরিজা পুনরায় সাধন ভজনে মন দিয়া ভগবানে অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

বাৎসল্যভাব সাধন

(১৮৬৩—৬৪)

রামকৃষ্ণ আট বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করিতেছেন। পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পর গত তিন বৎসর যাবৎ তাঁহার জামাতা মথুর বাবু কালীবাটীর সকল কাজ সুন্দর রূপেই পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। রামকৃষ্ণের চরিত্র প্রভাবে ভক্তিমান্ মথুর মন্দিরের সেবাপূজাদি ব্যাপারে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। সাধুভক্তের সেবার নিমিত্তও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পর এই আট নয় বৎসরে রাসমণির দান-দক্ষিণা ও কালীবাড়ীর সদাব্রতের কথা সাধুদের মুখে মুখেই ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাধু-সমাজে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। এই নিমিত্ত তখন সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখা যাইত এবং তাঁহাদের উপস্থিতিতে কালীবাটী সকল সময় ভগবৎ প্রসঙ্গে ভরপূর থাকিত।

তান্ত্রিক সাধনার অন্তে রামকৃষ্ণ সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাব সমূহের অনুশীলনে রত হইয়াছিলেন। কখন কখন তিনি স্ত্রীবেশে মন্দিরে যাইয়া সখীভাবে মাতাকে চামর-ব্যজন করিতেন। ঐ কালে সম্ভবতঃ ১২৭০ সালের কোন সময়ে জটাধারী নামক রামাইৎ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন উচ্চদরের সাধক তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শুভাগমন করেন। জটাধারী আপন ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টধাতু নির্ম্মিত বালবিগ্রহ 'রামলালার' সেবাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন। ঐকান্তিক

নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘকাল সেবাপূজার ফলে, তিনি ঐ বিগ্রহ মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য বালগোপাল মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইতেন, রামলালা বিগ্রহ জীবন্তরূপে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

জগদম্বার কৃপায় রামকৃষ্ণের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি জটাধারীর রামলালা বিগ্রহ মধ্যে একটী জীবন্ত ভাব ও শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করিলেন। কয়েক দিবস জটাধারীর ভক্তিপূত ইষ্টসেবা দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার নিকট 'রাম'মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং মাতার ন্যায় বাৎসল্যভরে প্রাণ ঢালিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপাল মূর্ত্তির সেবা করিতে লাগিলেন।

শীঘ্রই রামলালা রামকৃষ্ণের প্রেমে বাঁধা পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে দিব্য মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার সহিত নানাভাবে খেলাধূলা করিতে লাগিলেন। অনেক সময় রামলালা 'কখন রামকৃষ্ণ আসিবেন' এই ভাবিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আবার জটাধারীর নিষেধ সত্ত্বেও কখন কখন তাঁহার সহিত অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। ক্রমে রামলালা রামকৃষ্ণের প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, তিনি দিনরাত তাঁহার সহবাসেই কাটাইতে লাগিলেন। অনেক সময়ে জটাধারী ভোগ রাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু রামলালার দেখা পাইতেন না। রামলালা অনুক্ষণ রামকৃষ্ণের সহিত থাকিতে ভালবাসেন লক্ষ্য করিয়া তদগতচিত্ত জটাধারী

দক্ষিণেশ্বর ত্যাগকালে, প্রিয়তমের সুখেই আপন সুখ বোধ করিয়া, প্রাণপ্রিয় বিগ্রহটী রামকৃষ্ণের নিকট রাখিয়া গেলেন।

এখন হইতে রামকৃষ্ণ রামলালাকে লইয়াই কিছুকাল বাৎসল্যভাবে মগ্ন রহিলেন। আহার বিহারাদি সকল কাজেই তিনি উহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। ক্রমে রামলালার সহিত তাঁহার বাৎসল্যভাব অত্যন্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কখন কখন রামলালা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া তাঁহার নিষেধ সত্বেও যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রৌদ্র-জল, ঝোপ-জঙ্গল, এমন কি কাঁটাবনকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে আপন বালক জ্ঞানে চড়চাপড় মারিয়া শাসন করিতেও ছাড়িতেন না। পরবর্ত্তী জীবনে রামকৃষ্ণ কখন কখন এই সময়ের কথা বলিতেন, "রামলালার উপর তখন যা যা ভাব হতো! তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম; সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম, তার জন্য বসে বসে কাঁদতাম"।

ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ কি করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠে এবং মানুষের মত আহার-বিহার, খেলাধূলা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা ভাবিলে ঘটনাটী অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। তবে ভক্তের প্রেমে বাঁধা পড়িয়া ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা-বিলাসের দৃষ্টান্ত উন্নত সাধক-ভক্ত জীবনে একেবারে বিরল নহে।

এই রামলালা বিগ্রহ বহু বৎসর (৬০।৬৫ বৎসর) দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে রক্ষিত ও পূজিত হইয়াছিলেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীমন্দিরে ভীষণ চুরি হয়। ঐ সময়ে

চোরেরা মায়ের সোণার অলঙ্কারের সহিত রামলালা বিগ্রহটীও চুরি করিয়া লইয়া যায়। কিছুকাল পরে চোর ধরা পড়িয়াছিল এবং অলঙ্কারের সোণাও অনেকটা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু রামলালাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই। চোরেরা নাকি সোণার মূর্ত্তি মনে করিয়া রামলালাকে লইয়া গিয়াছিল, পরে মূর্ত্তিটী বাস্তবিক স্বর্ণ-নির্ম্মিত নয় বুঝিতে পারিয়া, উহাকে গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছে।

মধুরভাব সাধন

(১৮৬৪—৬৫)

যে সকল ভাব আশ্রয় করিয়া ভক্ত-সাধক ভগবানের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, উহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। শক্তি-সাধনায় শান্ত, রঘুবীরের উপাসনায় দাস্য, মায়ের সখী ভাবে সখ্য এবং রামলালাকে লইয়া বাৎসল্য ভাব সাধনের পর রামকৃষ্ণ রাধারাণীর মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কান্তরূপে লাভ করিবার জন্য পুনরায় সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাহ্য বেশভূষা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ভাবের সহায়ক হয় বলিয়া, শাস্ত্র ইহাকে সাধনার অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ভাব সাধন কালে ভিন্ন ভিন্ন বেশভূষা ধারণ করিতেন। মধুর ভাব সাধন কালেও তিনি ঐ ভাব সাধনের অনুকূল বসন ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

আমরা পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, রামকৃষ্ণ যখনই যে ভাব সাধনে মন দিতেন, তখন উহার চরম সীমায় না পৌঁছিয়া তিনি প্রাণে শান্তি পাইতেন না। ললনা-সুলভ বেশভূষা, চালচলন, কথাবার্ত্তা ও অঙ্গভঙ্গিতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীমতী রাধিকার ভাব অবলম্বন করিয়া, তিনি অচিরেই নিজ শরীরে পুরুষ-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন। মধুর ভাব সাধন কালে শ্রীযুক্ত মথুর বহুমূল্য শাড়ী-কাপড় ও সোণার অলঙ্কারাদি দ্বারা রামকৃষ্ণকে মনের সাধে সাজাইয়াছিলেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণ কখন কখন মথুর বাবুর জানবাজারের বাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার পরিবারের রমণীগণের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন এবং কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সকল আচরণ অবিকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝা কঠিন হইত। আবার তখন রামকৃষ্ণের অন্তরে মোটেই পুরুষ-ভাব ছিল না বলিয়া স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করিত।

অল্পকাল মধ্যে রামকৃষ্ণ কৃষ্ণচিন্তায় এত তন্ময় হইয়া গেলেন যে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, চিন্তা ও দর্শন-প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ, দেখা দাও, এইরূপ কাতরোক্তি শুনা যাইত। তাঁহার কাতর প্রার্থনা ক্রমে আকুল ক্রন্দনে পরিণত হইল। কৃষ্ণবিরহে তাঁহার শরীরের তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তিনি অনুক্ষণ দারুণ বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন ; এমন কি ইহার ফলে, কখন কখন তাঁহার লোমকূপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। বিরহ-যন্ত্রণায় যখন রামকৃষ্ণের প্রাণ-সংশয় হইল, তখন তিনি মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা প্রেমময়ী রাধিকার চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়া কতকটা শান্ত হইলেন এবং আপনাকেই শ্রীমতী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। নিরন্তর শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হওয়ায়, এইকালে তাঁহার শরীর-মনের গঠন পর্য্যন্ত বদলাইয়া একেবারে স্ত্রীজাতির অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল, এমন কি তিনি তাহাদের ন্যায় রজস্বলাও হইয়াছিলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণ পুনরায় কৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করিলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণচিন্তার ফলে তিনি এইকালে সবকিছু কৃষ্ণময় দর্শন করিতেন এবং কখন কখন শ্রীমতীর ন্যায় পৃথক্ বুদ্ধি হারাইয়া আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিতেন।

মধুর ভাব সাধনের সময়, রামকৃষ্ণ প্রায় ছয় মাস কাল স্ত্রীবেশে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি প্রায়ই বাগান হইতে ফুল তুলিয়া ও মালা গাঁথিয়া ৺রাধাগোবিন্দজীকে সাজাইতেন এবং সর্ব্বদাই মন্দিরে যাইয়া ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের পাঠ শুনিতেন। শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তিনি এই ভাবের সাধনা শেষ করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিরহে তাঁহার যে অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল, কৃষ্ণদর্শনে তাহা সাময়িক ভাবে দূর হইলেও, কিছুকাল পরেই পুনরায় দেখা দিল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দক্ষিণেশ্বরে বাস

করিতেছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও বৈষ্ণব মত সাধনে যে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্ত্রমতে সাধনা শেষ করিয়া, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উৎসাহ-বাক্যেই রামকৃষ্ণ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাবের সাধনায় নিযুক্ত হন। শরীরে চন্দন লেপন ও সুগন্ধ ফুলের মালা ধারণের ব্যবস্থা করিয়া ব্রাহ্মণী এইবারও রামকৃষ্ণের শরীরের জ্বালা দূর করিলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্য তারকনাথ ঘোষালের (পরবর্ত্তী কালে স্বামী শিবানন্দ) পিতা শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষাল একজন উন্নত-চরিত্র শক্তিসাধক ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা সম্পূর্ণ হইবার কিছুকাল পরে, রামকানাই বাবু তাঁহার গাত্রদাহের বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে একটী 'ইষ্ট কবচ' দিয়াছিলেন। ঐ কবচ ধারণ করিবার পর আর কখনও তাঁহার গাত্রদাহ হয় নাই।

সন্ন্যাস গ্রহণ ও জ্ঞানযোগ সাধন

(১৮৬৫—৬৭)

গত নয় বৎসর অনবরত নানা ভাবে কঠোর সাধনা করিয়া সংযম, তপস্যা ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তি রামকৃষ্ণ নিত্যই ভগবানের বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল প্রেরণা ও অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার ফলে তিনি ভাবরাজ্যে যাহা কিছু জানিবার সবই জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই ভগবানের সগুণ ভাব-সম্বন্ধে তাঁহার মনে আর সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার কামকাঞ্চনে আসক্তি-বিহীন মন স্বভাবতঃই সংসারের

আবিলতা হইতে বহু ঊর্দ্ধে বিচরণ করে। যাবতীয় মলিনতা, ভোগ-বাসনা ও ভয়-ভাবনা তাঁহা হইতে একেবারে দূর হইয়াছে। রামকৃষ্ণ যৌবন অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবটী কচি বালকের স্বভাবের তুল্য। তিনি ৺জগন্মাতার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ ; বালকের বিশ্বাসে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। ভাবময় রামকৃষ্ণের অন্তর নিশিদিন আনন্দে ভরপূর থাকে। কিন্তু এখনও নির্গুণ বা ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প অবস্থার সহিত তাঁহার পরিচয়ের বাকী আছে।

পূত-সলিলা নর্ম্মদা নদীর তীরে বহু প্রাচীন কাল হইতেই মুনি-ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। আট বৎসরের বালক শঙ্কর এখানেই শ্রীমৎ গোবিন্দপাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায়, উলঙ্গ সন্ন্যাসী স্বামী তোতাপুরী এই স্থানে ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর তপস্যা করিয়া ভাল-মন্দ, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর অতীত ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চ তাঁহার নিকট একান্ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হইত। এই নিমিত্ত তিনি চিরকাল গাছের তলায় বাস করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তন্ত্র-পুরাণাদি মতে সাধনা শেষ করিয়াছেন, সেই সময়ে স্বামী তোতাপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপনীত হন। তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, রামকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ সাধনের উত্তম অধিকারী। পুরীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জ্ঞানযোগ সাধন করিবে? যদি সাধন করিতে চাও, আমি তোমাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে

পারি”। ‘মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি’, এই বলিয়া রামকৃষ্ণ কালীমন্দিরের দিকে চলিলেন।

তোতাপুরী কোন কালেই এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয়ের উপাসনা করেন নাই। সাকার বিগ্রহে ভগবানের পূজা ব্রহ্মজ্ঞ তোতার নিকট মায়া-রাজ্যের অন্তর্গত অজ্ঞ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভয়ভাবনা-প্রসূত অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র। রামকৃষ্ণ মন্দিরে যাইয়া পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া ফিরিতেছেন দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, “লোকটীকে জ্ঞান-সাধনের উত্তম অধিকারী বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইঁহার মন নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শীঘ্রই ইঁহাকে এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইবে”।

রামকৃষ্ণ মন্দির হইতে ফিরিয়া শ্রীমৎ তোতাকে বলিলেন, মাতা তাঁহাকে জ্ঞানযোগ সাধনে অনুমতি দিয়াছেন। পুরীজী ভ্রমণ কালে কোন স্থানেই তিন দিবসের অধিক বাস করিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি রামকৃষ্ণকে জ্ঞানযোগ সাধনের সহায়ক সন্ন্যাস ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

রামকৃষ্ণের মন পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধে একটী সমস্যা উপস্থিত হইল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবী নানা শোকতাপ পাইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকট বাস করিতেছিলেন। জননীর জ্ঞাতসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে তিনি প্রাণে দারুণ আঘাত পাইবেন ভাবিয়া রামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন। তিনি বিনীত ভাবে শ্রীমৎ তোতাকে মাতার কথা ও পারিবারিক অবস্থা জানাইলেন।

ইহাতে তোতা এইরূপ বলিলেন, "সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান গোপনে করিলেই চলিবে, মাতাকে ছাড়িয়া তোমার অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইবে না, আর তুমি বিবাহিত, তাহাতেও কিছু আসিবে যাইবে না, পত্নীর সহিত দেহ-সম্পর্ক না থাকিলেই হইল"।

রামকৃষ্ণের সহিত আলাপের পর পুরীজী পঞ্চবটীতে যাইয়া আসন বিস্তার করিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, দাস্যাদি ভাব সাধন কালে রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে একটী সাধন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরীজীর নিকট জ্ঞানযোগ সাধন সম্বন্ধে উপদেশ লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি ঐ কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে স্বামী তোতাপুরী শিষ্যকে আহ্বান করিলেন এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদির পর শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করিয়া গৈরিক ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণের অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি শিষ্যকে নামরূপ ও দেশকালাতীত, দেহ-মন-বুদ্ধির পারে অবস্থিত, মায়ারহিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প অবস্থা উপলব্ধি করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। রামকৃষ্ণও গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

নিরন্তর ভাব-সমাধিতে অভ্যস্ত রামকৃষ্ণের একাগ্র মন মুহূর্ত্ত-মধ্যে বাহ্য জগৎ ভুলিয়া উচ্চ ভাব-ভূমিতে সমারূঢ় হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি মনকে ভাবাতীত ভূমিতে লীন করিতে

পারিলেন না, ৺জগদম্বার চির-পরিচিত দিব্য মূর্ত্তি তাঁহার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রহিল। অবশেষে তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া তোতাকে বলিলেন, "না! হইল না, মনকে কিছুতেই নির্ব্বিকল্প করিতে পারিলাম না"। ইহাতে তোতাপুরী দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি! হইবে না? আচ্ছা দেখিতেছি"। এক খণ্ড সূক্ষ্মাগ্র কাঁচ মাটীতে পড়িয়াছিল। তোতা ঐ কাঁচ-খণ্ড তুলিয়া লইলেন এবং উহার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সহসা শিষ্যের ভ্রূ-মধ্যস্থলে প্রবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "এই বিন্দুতে মনকে স্থির কর"। তোতার এইরূপ ব্যবহারে রামকৃষ্ণ পুনরায় দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এইবারও পূর্ব্ববৎ মাতার দিব্য মূর্ত্তি তাঁহার ধ্যানপথে উদিত হইল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া, ঐ অসি দ্বারা মূর্ত্তিটী দ্বি-খণ্ডিত করিলেন। ফলতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মন নামরূপাদি বিকল্প-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করিল; তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

এক দুই করিয়া দিবসত্রয় কাটিয়া গেল, তথাপি রামকৃষ্ণের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শিষ্য তিন দিন পূর্ব্বে যে স্থানে এবং যে ভাবে ধ্যানে বসিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে এবং সেই ভাবেই স্থাণুর ন্যায় অচল, অটল, নিস্পন্দ অবস্থায় ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে, আর তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে লক্ষ্য করিয়া তোতা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলে আমি যে নির্ব্বিকল্প সমাধি

লাভ করিয়াছি, এই ব্যক্তি প্রথম দিনেই তাহা লাভ করিল। এ অতি আশ্চর্য্য মায়ার খেলা"। অতঃপর তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ক্রমাগত 'হরি ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বামী তোতাপুরী ভ্রমণ কালে কোন স্থানে দিবসত্রয়ের অধিক বাস করিতেন না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ব্ব-আচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি অদ্ভুত শিষ্যের প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ক্রমান্বয়ে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন। তোতা এই এগার মাস শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানা ভাবে উপদেশ ও শিক্ষা দান করিয়া নির্ব্বিকল্প ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানযোগ সাধন করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে পরমহংস বলে। রামকৃষ্ণও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হইয়া পরমহংস হইলেন।

তোতাপুরী দিবারাত্র নিজ আসনের পার্শ্বে ধূনি জ্বালিয়া রাখিতেন। একটী জলপাত্র, একখানি চর্ম্মাসন, একটা চিমটা এবং একখানা মোটা চাদর তাঁহার পথ চলিবার সম্বল ছিল। তোতা সর্ব্বদা মোটা চাদরখানা দ্বারা নিজ শরীর ঢাকিয়া রাখিতেন এবং লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য নিদ্রার ভাণ করিয়া সারাদিন আসনে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতেন। আবার রাত্রিকালে জীবগণ নিদ্রাগত হইলে তিনি ধূনির পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যান করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞ তোতাকে জ্ঞান লাভের

পরেও এইরূপে দিবারাত্র ধ্যান করিতে দেখিয়া, একদিন রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ-ক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মজ্ঞান করামলকবৎ আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে; আপনি ব্রহ্মজ্ঞ; নিত্য ধ্যানাভ্যাসে আপনার প্রয়োজন কি?" ইহার উত্তরে তোতা বলিয়াছিলেন, "দেখিয়াছ, আমার জলপাত্রটী কিরূপ উজ্জ্বল? প্রত্যহ পরিষ্কার করি বলিয়া এরূপ উজ্জ্বল রহিয়াছে; অন্যথা মলিন হইয়া যাইত। মনকেও এইরূপ জানিবে। নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান না করিলে মন মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

উত্তর-কালে রামকৃষ্ণ স্বামী তোতাপুরীকে ন্যাংটা নামে নির্দ্দেশ করিতেন। ন্যাংটার জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের লোক ছিলেন এবং বাল্যকালেই সন্ন্যাসী মঠে যোগদান করিয়া বেদান্ত-গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধ্যানধারণা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু কুরুক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী লাদানা নামক স্থানে এক নাগা সন্ন্যাসী মঠের মোহান্ত এবং বৃহৎ নাগা সন্ন্যাসী মণ্ডলীর অধিনায়ক ছিলেন। ঐ মঠের চমৎকার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে তোতা কথা-প্রসঙ্গে শিষ্য রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মণ্ডলীতে সাত শত ন্যাংটা সন্ন্যাসী বাস করিতেন। ঐ সন্ন্যাসিগণ গুরুর উপদেশ অনুযায়ী নিত্য বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠ এবং ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তকগণ গদিতুল্য কোমল আসন ব্যবহার করিতেন। অল্পে অল্পে অভ্যাস করিয়া, কিছুকাল পরে তাঁহারা কেবলমাত্র একখানি চর্ম্মাসন অথবা শুধু মাটীর উপর

বসিয়া ধ্যান করিতেন। আহার, বিহার, শয্যা, পরিধেয় প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই এইরূপ সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করা হইত। এইরূপে ত্যাগী জীবনের অনুকূল কঠোর রীতি সমূহ অভ্যাসের ফলে তাঁহারা কালে অনায়াসে সর্ব্বত্যাগী উলঙ্গ সন্ন্যাসী জীবন যাপন করিয়া দেশে দেশে ও তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ তোতা ব্রহ্মের মায়াশক্তি অথবা অন্য কোন দেবদেবীর কল্পনাকে কখনও মনে স্থান দেন নাই। ফলতঃ দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি ভক্তিমার্গের অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহকে তিনি বিদ্রূপের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেক সময়ে উহাদের কঠোর সমালোচনাও করিতেন। সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে উহারাও যে, ক্রমে ভক্ত-সাধককে শুদ্ধ অদ্বৈত বা ব্রহ্মজ্ঞান ভূমিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা রামকৃষ্ণকে হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে দেখিয়া, তোতা উপহাস করিয়া বলিলেন, "আরে, কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো ?" অর্থাৎ তুমি (পশ্চিম-দেশীয় লোকের ন্যায়) হাত চাপড়াইয়া রুটী ঠুকিতেছ কেন ? ইহাতে রামকৃষ্ণ বালকের মত সরল হাসি হাসিয়া তোতাকে বলিলেন, "আমি ভগবানের নাম করছি, আর তুমি কিনা বল রুটী ঠুক্‌ছি"। তোতা নিরস্ত হইলেন।

রামকৃষ্ণ যখন ভাবস্থ হইয়া ভক্তি ও বৈরাগ্যোদ্দীপক গান গাহিতেন, তখন পাষাণ হৃদয়েও প্রেম উথলিয়া উঠিত। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত শিষ্যের সহবাসে অল্পকাল মধ্যেই তোতার চরিত্রে বেশ

একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। তোতাপুরী বাংলা ভাষা জানিতেন না, কথার ভাবটা শুধু ধরিয়া লইতে পারিতেন। তিনি এত বড় জ্ঞানী ছিলেন এবং ভক্তিভাবকে উপহাস করিতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের মধুর কণ্ঠে ভাবময় সঙ্গীত শুনিয়া, তিনি ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

রামকৃষ্ণ ভগবানের নিত্য ও লীলা দুইটী ভাবই মানিতেন। কারণ, তিনি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তির খেলা অর্থাৎ ভগবান্ বা ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ ভাব যথাযথ রূপে উপলব্ধি করিয়া ভক্তিভাবে উপাসনা ও জ্ঞান-সাধন উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জানিতে বাকী ছিল না, ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীব ভগবানের লীলা বা মায়াশক্তির অধীন থাকে; এই মায়াশক্তি বা ভগবতী মহামায়ার আরাধনা করিয়াই মায়ার পারে যাইতে হয়, মহামায়া কৃপা করিয়া পথ ছাড়িয়া না দিলে জীব পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। * এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে, ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি করিতে পারে? কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামী তোতাপুরী একান্ত পুরুষকার-বাদী ছিলেন। তিনি ভগবানের নিত্য বা নির্গুণ ভাবটীই শুধু মানিতেন।

---

* সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী। চণ্ডী ১।৫৬,৫৭,৫৮

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত শুভ সংস্কারের ফলে তোতাপুরী জন্মাবধি অটুট স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতেছিলেন। আশৈশব ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ফলে তাঁহার মনও সতত আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মভাবে মগ্ন থাকিত। তিনি এযাবৎ সংসারের দুঃখতাপ, রোগজ্বালা, শোক-মোহাদির সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হন নাই। বেদান্ত গ্রন্থে ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের কথা পাঠ করিলেও, তোতাপুরী মহামায়ার কৃপায় অনুকূল অবস্থা ও সংস্কার যুক্ত হইয়া, বাল্যকাল হইতে অনায়াসে জ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে, এই জন্মে সগুণ উপাসনা ব্যতিরেকেই ভগবানের নির্গুণ ভাবটী উপলব্ধি করিয়াছিলন। এই জন্যই তোতা সগুণ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা একটুও বুঝিতে পারিতেন না; বরং জ্ঞানের অভিমানে ভক্তোচিত ব্যবহারাদিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা, এমন কি উপহাস পর্য্যন্ত করিতেন। তাই বুঝি মহামায়া একবার আপন করাল রূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন, নির্গুণ ও সগুণ এক ব্রহ্মেরই দুইটী পৃথক্ ভাব এবং স্ব স্ব স্থানে ইহাদের কোনটীই খাট নয়, এই উভয় ভাবেরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার পরেই তোতা দারুণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রথমতঃ তোতা শারীরিক অসুস্থতাকে একটুও গ্রাহ্য করিলেন না। ফলে রক্তপাতে দিন দিন তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়া শিষ্যের ব্যবস্থানুযায়ী কিছুকাল নিয়মিত

ঔষধপথ্য সেবন করিলেন। তথাপি কিছুমাত্র ফল লাভ হইল না; বরং রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। এতদিন রোগ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেই তোতা আত্মস্থ হইয়া সকল জ্বালা ভুলিতেন। কিন্তু ক্রমে উহা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি বহু চেষ্টায়ও মনকে শরীর হইতে প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে মনকে এতকাল অনায়াসে ও ইচ্ছামাত্র শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে পারিতেন, সেই মন কেন বশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তোতা অনেক ভাবিয়া, অনেক বিচার করিয়াও তাহার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি মনে করিলেন, শরীর-মনের পূর্ব্ব সংস্কার প্রবল হইয়া তাঁহাকে এইরূপ পীড়া দিতেছে। ইহা যে ভগবতী মহামায়ার খেলা, তাহা তিনি কি করিয়া বুঝিতে পারিবেন?

তোতাপুরী সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। অনিত্য শরীরের সহিত আত্মার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই; তোতা সমাধি বলে এই কথা বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানী পুরুষ, কাজেই তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর ভয় আর নাই; শরীরটাকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলিলেও আত্মহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। গভীর রাত্রিতে তোতা ভাবিতে লাগিলেন, "শরীরটাই যত অনর্থের মূল। মলমূত্রপূর্ণ এই জঘন্য শরীরকে আজই শেষ করিব। এখনই ঐ কার্য্যের উত্তম সময়; রাত্রির অন্ধকারে শরীরটাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেই সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে"। তোতা অবিলম্বে নিজ আসন ত্যাগ করিয়া কালীবাটীর বাঁধাঘাট দ্বারা গঙ্গায় নামিলেন। সেই সময়ে ঘাটের সম্মুখে

অনেকটা জায়গা চড়া পড়িয়া গিয়াছিল, আর সম্ভবতঃ তখন ভাটাও পড়িয়াছিল। এই নিমিত্তই হউক, অথবা জগৎকারণের অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি প্রভাবেই হউক, তোতা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কোথাও এক হাঁটুর চেয়ে বেশী জল নাই। ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "একি দৈবী মায়া! তাহা হইলে কি সত্য সত্যই রামকৃষ্ণের মত ভগবতী মহামায়ার চরণ-তলে মস্তক অবনত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই?"

এই চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া তোতা হতাশ হৃদয়ে কালীবাটীর ঘাটের দিকে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখ হইতে যেন একটী আবরণ সরিয়া গেল; তিনি অনুভব করিলেন, মহামায়া আকাশ-বাতাস ছাইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁরই মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে *। উক্ত দর্শন লাভে উল্লসিত হইয়া তোতা মুহূর্ত্তমধ্যে রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন এবং পঞ্চবটীমূলে ফিরিয়া সমস্ত রাত্রি মহামায়ার ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত কালে রামকৃষ্ণ তোতার নিকট রাত্রিকার ঘটনাটী জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং গুরুশিষ্য উভয়ে মিলিয়া মন্দিরে যাইয়া, ৺ভবতারিণীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। এতদিনে তোতা মহামায়ার প্রভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া

* নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ চণ্ডী ১।৬৪, ৬৫

বেশ বুঝিতে পারিলেন, ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তি এক, অভেদ ও অবিচ্ছেদ্য; যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব। অনতিকাল মধ্যে পুরীজী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি আর কখনও এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

স্বামী তোতাপুরী পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ অহর্নিশ নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত ভাবে সমাহিত থাকিবার ইচ্ছায় পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এইবার তিনি নিরন্তর ছয় মাস কাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া মহামায়ার আদেশে লোক-কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ধ্যান হইতে বিরত হইয়াছিলেন। উক্ত ছয় মাস কাল তিনি আহার-নিদ্রা প্রভৃতি শরীর ধারণের যাবতীয় চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত ছিলেন; দিবারাত্র কি করিয়া কাটিয়া যাইত, এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। চেষ্টার অভাবে তাঁহার অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ হইয়া যাইত। তাঁহার কেশ সমূহ ময়লা-মাটী জড়িত হইয়া জটাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল স্থির ভাবে একাসনে বসিয়া থাকার ফলে শরীর কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড় পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এমন কি পক্ষিগণ নির্ভয়ে তাঁহার জটা মধ্যে চঞ্চু দ্বারা আহার অন্বেষণ করিত। এই কালে একজন সাধু দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন। সাধু প্রতিদিন নিজ যষ্টি সহায়ে তাঁহার শরীরে চেতনা সম্পাদন করিয়া মুখমধ্যে আহার্য্য প্রদান করিতেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে

রামকৃষ্ণের নশ্বর দেহ ঐ দীর্ঘ ছয় মাস কাল প্রাণ-সমন্বিত থাকিয়া উত্তরকালে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল।

দীর্ঘকাল নির্ব্বিকল্প ভূমিতে অবস্থান করার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমানে সর্ব্বজীবের অন্তরে অদ্বয় ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পান। এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব-বোধ না থাকায়, তিনি আপনাকে চরাচর সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব্বভূতকে নিজের মধ্যে অধিষ্ঠিত অনুভব করেন *। সর্ব্বভূতে আপন অস্তিত্ব-বোধ ও তাহাদের সহিত নিজ একত্ব বুদ্ধি রামকৃষ্ণের অন্তরে কতদূর প্রবল হইয়াছিল, নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটী লক্ষ্য করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একদা রামকৃষ্ণ কালীবাটীর উদ্যানে শ্যামল দুর্ব্বাদলের শোভা দর্শন করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি অদ্বৈত ভাবের আবেশে দুর্ব্বাদলের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া, উহাদিগকে নিজ অঙ্গ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঠিক ঐ সময়ে কোন এক ব্যক্তি দুর্ব্বাদল পদদলিত করিয়া সেই দিকে গমন করিল। ইহাতে রামকৃষ্ণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহার বোধ হইল, লোকটী বাস্তবিক তাঁহার শরীরকেই পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অপর এক দিবস তিনি চাঁদনীর ঘাটে দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী নৌকার মাঝি পরস্পর কলহ করিয়া এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পৃষ্ঠে

* সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা ৬।২৯

দারুণ আঘাত করিল। রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত একাত্ম-বোধ হেতু বিষম আহতের ন্যায় করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কোমল পৃষ্ঠদেশ স্ফীত ও আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় দূর হইতে মাতুলের ক্রন্দন-রব শুনিতে পাইয়া সত্বর ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে যখন মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত পক্ষে কেহই তাঁহাকে প্রহার করে নাই, একাত্ম-বুদ্ধির ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন হৃদয়রামের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। কারণ কতটুকু একাত্মবুদ্ধি উপস্থিত হইলে এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে, তাহা দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মানবের কল্পনায়ও আসে না।

স্বামী তোতাপুরী কখন কখন তাঁহাদের মঠের একজন সিদ্ধ পুরুষের কথা শিষ্যকে বলিতেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ আপন-ভোলা ভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া পথ চলিতেন—গণেশগর্জ্জী। সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণের জ্ঞানযোগ সাধনের পর দক্ষিণেশ্বরেও এইরূপ একজন জ্ঞানী সাধু আসিয়াছিলেন। তিনিও আনমনে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন। মেঘ দেখিয়া তিনি বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেন। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁহার খুব আনন্দ হইত। তাঁহার ধ্যানের সময় কেহ নিকটে গেলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার তাঁহার অনবরতই চলিত। তাঁহার নিকট একটী ঝাড়ের

(কাঁচের ঝাড় বাতির) কলম ছিল। মায়ার আবরণে অহঙ্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া, এক ব্রহ্মই কেমন করিয়া নানা রূপে প্রতিভাত হন, তাহা বিচার করিবার জন্য তিনি এই ঝাড়ের কলমটীর মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলোকে নানা রং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। পাছে আসক্ত হইয়া পড়েন, তাই সাধুটী কোন জিনিষই একবারের বেশী দেখিতেন না।

রামকৃষ্ণের খুল্লতাত পুত্র রামতারকের (হলধারী) কথা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। স্বামী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পরেও হলধারী কিছুকাল পর্য্যন্ত কালীবাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর সহিত হলধারীর বেশ ভাব জমিয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে তোতাপুরী হলধারীর অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ শুনিতেন। একদিন রামকৃষ্ণ কালীঘরে বসিয়া তাঁহাদের পাঠ শুনিতে শুনিতে রাম-লক্ষ্মণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। হলধারী মোট সাত আট বৎসর কালীবাটীতে থাকিয়া, সম্ভবতঃ ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে পূজকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় বিষ্ণুমন্দিরের পূজক রূপে তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—পরিণতি

জন্মভূমি দর্শন, ইসলাম সাধন ও তীর্থ পর্য্যটন

(১৮৬৭—৬৮)

প্রায় বার বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণের মন ভগবদ্‌ভাবের প্রেরণায় ইচ্ছামাত্র উচ্চ ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলেও, স্বাস্থ্যের প্রতি দীর্ঘকালের উদাসীনতা বশতঃ তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া দুরন্ত রক্তামাশয় রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি ক্রমাগত ছয় মাস কাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর কতকটা সুস্থ হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসা অবধি প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে রামকৃষ্ণ পেটের অসুখে ভুগিতেন। কামারপুকুরে থাকা কালে তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবরই বেশ ভাল ছিল। তজ্জন্য তিনি ১২৭৪ সালের প্রথম ভাগে ভাগিনেয় হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী সহ কামারপুকুরে গমন করিলেন।

সাত আট বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ একবার বাড়ীতে (কামারপুকুরে) আসিয়াছিলেন। তখন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার উন্মনা ভাবটী লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উন্মাদের ন্যায় কখন মা মা, হরি হরি, আবার কখন রঘুবীর, রঘুবীর বলিয়া অনুক্ষণ চীৎকার করেন, ইত্যাদি অনেক কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহারা ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে একটা অপরূপ ধারণা করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা রামকৃষ্ণকে পুনরায় পূর্ব্বের মতই দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যেরূপ প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন, তাঁহার সেই ভাবটী যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। অল্পকাল তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তিনি উন্মাদগ্রস্ত হন নাই। রামকৃষ্ণের মধুর হাস্য পরিহাস, গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও আত্মহারা ভাব এবং সরল অমায়িক ব্যবহার তাঁহাদের হৃদয় সরস করিয়া তুলিল। তাঁহার প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া গয়াবিষ্ণু প্রমুখ বাল্যবন্ধুগণ, ধর্ম্মদাস লাহার ভক্তিমতী কন্যা প্রসন্ন, পাইনদের বাড়ীর মেয়েরা, ধাত্রী ধনী কামারিণী, ভক্ত শ্রীনিবাস শাঁখারি এবং গ্রামের অন্যান্য বহু স্ত্রীপুরুষ দিবসের অনেক সময় ৺ক্ষুদিরামের কুটীরে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই রামকৃষ্ণের সরস ও পবিত্র চরিত্রগুণে কামারপুকুরে আনন্দের হাট বসিল; তাঁহার উপস্থিতিতে যেন সমগ্র গ্রামখানি উৎসবময় হইয়া উঠিল।

রামকৃষ্ণের বালিকা-বধূ শ্রীমতী সারদামণি কয়েক মাস পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে দুই একবার শ্বশুরগৃহ কামারপুকুরে আসিয়া থাকিলেও এতকাল পিত্রালয় জয়রামবাটীতেই বাস করিতেছিলেন। বিবাহের পর সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেবতুল্য পতির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী, শ্বশুরগৃহ ইত্যাদি সম্বন্ধে তখনও তাঁহার কোন ধারণা জন্মে নাই। গ্রামের মেয়ে, বিশেষতঃ তিনি অতি শান্ত-প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া এখনও

তাঁহার বালিকা-ভাবই রহিয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আসিবার পর সারদামণিকেও সেখানে আনয়ন করা হইল। রামকৃষ্ণ পত্নীর কামারপুকুর আগমন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আত্মীয়গণের উদ্যোগে যখন সারদামণি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যেরও ক্রটী করিলেন না। স্ত্রীপুরুষে অভেদ-দৃষ্টি সম্পন্ন রামকৃষ্ণ দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যেই পত্নীকে গৃহকর্ম্ম ও অতিথি-সেবা, গুরু এবং দেবতার পূজা, ঈশ্বরে ভক্তিলাভ প্রভৃতি ইহ ও পরকালের কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীমতী সারদামণিও স্বামীর স্বার্থগন্ধহীন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করিতে লাগিলেন।

ছয় সাত মাস কাল কামারপুকুরে বাস করিবার পর, রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ১২৭৪ সালের শেষভাগে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। হৃদয় মাতুলের সঙ্গে আসিলেন, কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ তপস্যায় কাটাইবার উদ্দেশ্যে ৺কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

বহুবিধ ঈশ্বরীয় ভাবের সহিত পরিচিত হইয়া রামকৃষ্ণ চরমে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর কালে তিনি ধর্ম্মরাজ্যে যে অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন ও অপূর্ব্ব যুগান্তর আনয়ন করিবেন, তজ্জন্য আরও দুই একটী ভাবের সহিত তাঁহার পরিচিত হইবার

প্রয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণের অদ্বৈত ভাব সাধনের প্রায় দুই বৎসর পরে গোবিন্দ রায় নামক একজন মুসলমান দরবেশ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। দরবেশ গোবিন্দ হিন্দু-সন্তান ছিলেন। শুনা যায় দমদমার নিকটে কোন এক কৈবর্ত্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু ইসলামের সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি উদার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দ সর্ব্বদাই ঐ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে কোরাণ পাঠ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া উদার-চরিত্র রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন। অতঃপর ইসলাম ধর্ম্মকেও অনন্ত ভাবময় ভগবানকে জানিবার একটী পথ জানিয়া, তিনি দরবেশ গোবিন্দের নিকট উপদেশ ও 'আল্লা' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইসলাম-ধর্ম্ম সাধনে মন দিলেন।

রামকৃষ্ণ যখনই যে ভাব সাধনে নিযুক্ত হইতেন, তখন তাহাতেই সম্পূর্ণ মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন, এই কথা পূর্ব্বে অনেক বার বলা হইয়াছে। ইসলাম-ধর্ম্ম সাধন কালে তিনি পূর্ণমাত্রায় মুসলমান আচার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ কালে তিনি মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতেন, তাহাদেরই প্রণালীতে পাক করা খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়িতেন। একদিন তিনি ভাবস্থ হইয়া কালীবাটীর নিকটবর্ত্তী কোন মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য মথুর বাবু একজন মুসলমান বাবুর্চ্চি ও একজন ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাবুর্চ্চির নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মণ পাচক নানা প্রকার মুসলমানী খাদ্য প্রস্তুত করিত। তাঁহার সকল চেষ্টা ও চিন্তাধারা মুসলমানদের অনুরূপ হইয়া যাওয়ায়, এই সময়ে তিনি ভুলেও মন্দিরবাটীতে প্রবেশ অথবা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতেন না। এইরূপে দুই দিন গত হইলে, তৃতীয় দিবসে রামকৃষ্ণ এক দীর্ঘশ্মশ্রু দিব্য-কান্তি পুরুষের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি ইঁহাকে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উক্ত দর্শনের পর তাঁহার মন ক্রমশঃ ইসলামের সগুণ নিরাকার ভাবেতে লয় হইল।

ইসলাম ধর্ম্ম মতে সাধনা করিয়া হজরত মোহাম্মদের দর্শন লাভের পর, ধ্যান কালে রামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন, এক জায়গাতে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি বিবিধ জীবজন্তু, এবং সমাজের উচ্চ, নীচ সকল স্তরের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানাদি নানা জাতীয় লোক জড় হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান। তাহার হাতে একটা শান্কিতে ভাত রহিয়াছে। ঐ মুসলমানটী একদিক হইতে সকলের মুখে একটু একটু করিয়া ভাত দিয়া যাইতে লাগিল; রামকৃষ্ণের মুখেও দু'টী দিয়া গেল। ইহাতে রামকৃষ্ণের বোধ হইল, বাহ্যিক আকৃতি, প্রকৃতি এবং আচার আচরণে বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও জীবজগতের সকল প্রাণী ও বস্তুই স্বরূপতঃ এক ও অভেদ।

রামকৃষ্ণ ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খৃঃ) একবার জননী চন্দ্রমণি সহ ৺কাশী ও প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে

বিষ্ণুমন্দিরের সহকারী পূজক শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে ও মথুর বাবুর কয়েকটী পুত্র তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। তীর্থ ভ্রমণের সকল ব্যয় মথুর বাবুই বহন করিয়াছিলেন। এইবার রামকৃষ্ণ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ৺কাশী ও প্রয়াগ দর্শন করিয়া সকলের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১২৭৪ সনের (১৮৬৮ খৃঃ) মাঘ মাসে শ্রীযুক্ত মথুর স্বয়ং, স্ত্রী ও পরিবারের বহু লোক লইয়া ৺কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। রাসমণি ও মথুর বাবু রামকৃষ্ণকে ছোট ভট্টাচার্য্য, বাবা প্রভৃতি নামে ডাকিতেন। মথুর ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসী ভাবিলেন, বাবাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে তীর্থ-ভ্রমণের সবই বিফল হইবে। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে, রামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয় বার তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন। এইবার তীর্থযাত্রীর দলে রামকৃষ্ণ, হৃদয়, মথুর বাবু, তদীয় পত্নী, পুত্রবধূ, পাচক, দ্বারবান্ ও দাসদাসীতে একশত পঁচিশ জনের মত লোক হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহারা একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তিন খানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা পৃথক্ ভাবে কলিকাতা হইতে ৺কাশী পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার কিন্তু রামকৃষ্ণের তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে কেবল একবারের (দ্বিতীয় বার) কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, রামকৃষ্ণ আপন মাতা ও ভাগিনেয় হৃদয়কে লইয়া মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। আবার অন্য এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, ৺বৃন্দাবনে সাধ্বী গঙ্গামাতার নিকট বাস করিবার কথা মনে উদিত হইলে, বৃন্দা

মাতার কথা মনে পড়ায়, রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। মাতা যদি তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথা মনে পড়ায় রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন, এইরূপ লিখার কি তাৎপর্য্য হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে রামকৃষ্ণের নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১২৭৪ সালের তীর্থ-যাত্রায় রামকৃষ্ণের মাতা তাঁহার সঙ্গে গমন করেন নাই। কারণ, দুইবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেও, রামকৃষ্ণ ১২৭৪ সালেই মাত্র একবার ৺বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং ঐ কালেই গঙ্গামাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এই কথা সর্ব্বসম্মত। কথামৃত তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই, ঐ সময়ে রামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন—"গঙ্গামায়ী বড় যত্ন কর্‌ত। *** নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাক্‌ত। *** গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। *** হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে—এমন সময়ে মাকে মনে পড়্‌ল! মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ন'বতে। আর থাকা হ'ল না।" কাজেই রামকৃষ্ণ দুইবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং প্রথম বার তাঁহার জননী সঙ্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার যান নাই, এই মতটীই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বার তীর্থ ভ্রমণ কালে, মথুর বাবু ৺কাশীর পথে প্রথমে দেওঘরে নামিয়া ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি

তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করেন। দেওঘরে থাকা কালে তাঁহারা একদিন নিকটবর্ত্তী কোনও পল্লীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসিগণের অস্থিকঙ্কালসার দেহ, শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, রুক্ষ কেশ প্রভৃতি দৈন্যদশা দেখিয়া রামকৃষ্ণের দয়ার্দ্র হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে মথুর বাবুকে বলিলেন, "মথুর, মায়ের অনুগ্রহে তুমি অনেক ধনদৌলতের অধিকারী হইয়াছ, তুমি একদিন এদেরে একমাথা করে তেল, একখানা করে নূতন কাপড়, আর পেট ভরে খেতে দাও"। তীর্থভ্রমণে বহু অর্থ ব্যয় হইবে, তদুপরি আরও অধিক ব্যয়ের কথা শুনিয়া মথুর ভাবনায় পড়িলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। এদের দেখবার কেউ নাই, আমি এদের কাছেই থাক্‌ব"। আবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বালকের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া দরিদ্র পল্লীবাসিগণের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণের কথায় দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া মথুর বাবু দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হইলেন না; তিনি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া সেখান হইতে লইয়া আসিলেন এবং একদিন দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীবাসীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদের প্রত্যেককে একখানা করিয়া নূতন কাপড় দান করিলেন। মহাপুরুষগণের চরিত্র, বেশ একটা কোমল-কঠোর ভাবের সংমিশ্রণে গড়া থাকে। তাঁহাদের চরিত্রে একাধারেই যুগপৎ বজ্র হইতেও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল বৃত্তি

সমূহ পরিলক্ষিত হয়—বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। যেখানে প্রয়োজন তাঁহারা বজ্র হইতেও কঠোর রীতি অবলম্বন করেন, আবার স্থলবিশেষে কুসুম-কোমল মনোবৃত্তিরও পরিচয় দিয়া থাকেন।

কয়েক দিন ৺বৈদ্যনাথ ধামে বাস করিয়া শ্রীযুক্ত মথুর, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য সকলে ৺কাশী গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা কেদার ঘাটের সন্নিকটে দুইটী বৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামে অবস্থান কালে রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিন ৺বিশ্বনাথজী ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং নিত্যই বিভিন্ন দেবমন্দিরে গমন করিয়া দেবদেবী দর্শন করিতেন। দেবদর্শন, এমন কি দেবস্থানে গমন কালে, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। ৺কেদারনাথ দর্শন কালে তাঁহার অধিকক্ষণ স্থায়ী ও প্রগাঢ় ভাবাবেশ হইত। হৃদয়রাম সর্ব্বক্ষণ মাতুলের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া, যখন যে ভাবে প্রয়োজন, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ৺কাশীর প্রসিদ্ধ সাধুদিগকেও দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীর সহিত তাঁহার কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামিজী তখন মৌন অবলম্বন করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে বাস করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বদা নগ্ন দেহে অবস্থান করিতেন। তাঁহার উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহাকে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ, পরমহংস, বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ভাগিনেয় হৃদয়কে এই সম্বন্ধে বলিয়াও ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি নিজ নস্যদানি

সম্মুখে ধরিয়া রামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ইঙ্গিতে দুইচারিটী কথাও বলিয়াছিলেন। কয়েক বার মাত্র সাক্ষাতের ফলেই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বেশ একটা প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক দিবস রামকৃষ্ণ স্বহস্তে স্বামিজীকে পায়সান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন।

৺কাশীতে শ্রীযুক্ত মথুর, পূজাদানাদি সংকর্ম্মে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সেখানে মথুর বাবু বহুমূল্য বেশভূষা ও রাজার ন্যায় রৌপ্য ছত্র, দণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিয়া অনুচরগণ সহ দেবমন্দিরাদি দর্শন করিতে বাহির হইতেন। প্রায় সপ্তাহকাল কাশীবাস করিয়া তাঁহারা সকলে ৺প্রয়াগধামে গমন করেন। তথায় ত্রিরাত্র বাস এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে মস্তক মুণ্ডন ও স্নানাদি তীর্থ-কার্য্য সমাপন করিয়া, তাঁহারা পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু ৺প্রয়াগে যাইয়া মুণ্ডনাদি কিছুই করেন নাই। এইবার ৺কাশীতে প্রায় এক পক্ষ কাল অবস্থান করিয়া, শ্রীযুত মথুর ৺বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা নিধুবনের নিকটে একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। ৺বৃন্দাবনেও মথুর বাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এখানে রামকৃষ্ণ, মথুর ও অন্যান্যেরা প্রায় প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাস্থল, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড অথবা অন্যান্য দেবস্থানে গমন করিতেন। হৃদয় সকল সময়েই মাতুলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। দেবস্থানে যাইবার পথে ও দেবদর্শন কালে, রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া, নিত্য নূতন রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীকে প্রত্যক্ষ

করিতেন। ৺বাঁকাবিহারী মূর্ত্তি ও গিরি-গোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইয়াছিল। ভাবাবেশে তিনি ৺বাঁকা-বিহারীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং গিরি-গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মৃগ ও ময়ূরাদি বন্য পশুপক্ষীর নির্ভয়ে বিচরণ, ব্রজবাসীর সরল, অমায়িক ব্যবহার এবং ভগবদ্‌ভক্তি দর্শন করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। মথুরায় ধ্রুবঘাট দেখিবামাত্র তাঁহার দর্শন হইল, বাসুদেব শিশু কৃষ্ণকে কোলে করিয়া যমুনা পার হইতেছেন। ৺বৃন্দাবনে তিনি যে সকল সাধু ও সাধ্বীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিধুবনের গঙ্গামাতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধা তপস্বিনী গঙ্গামাতা একটী পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি একজন উচ্চদরের সাধিকা ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেম ও রাধিকাপ্রীতি দর্শনে ব্রজবাসী সকলেই তাঁহাকে শ্রীমতী রাধারাণীর সখী ললিতার অবতার জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। গঙ্গামাতার পরা ভক্তি-লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের পরস্পর আকর্ষণ এত বৃদ্ধি পাইল যে, গঙ্গামাতার পূত সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, রামকৃষ্ণ স্থায়ী ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বরের নহবতে একা বাস করিতেছেন, এই কথা মনে পড়ায়, মাতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, তিনি অবশেষে ৺বৃন্দাবন বাসের সংকল্প ত্যাগ করেন। গঙ্গা-

মাতাও রামকৃষ্ণের অতি উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রীমতী রাধিকার তুল্য জ্ঞানে দুলালী, লাড্‌লী প্রভৃতি সমাদর-সূচক শব্দ প্রয়োগে সম্বোধন করিতেন।

৺বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবগণের ন্যায় ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল সেখানে বাস করিয়া, রামকৃষ্ণ ও মথুর বাবু প্রভৃতি সকলে পুনরায় ৺কাশীধামে আগমন করিলেন। এবার মাসাধিক কাল কাশীবাস করিয়া, প্রায় চারিমাস পর তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

৺কাশীতে অবস্থান কালে রামকৃষ্ণ বৃহৎ পান্সী নৌকাযোগে ৺বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন করিতে যাইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি পান্সীতে চড়িয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া মন্দির পরিপূর্ণ ৺কাশীর শোভা দর্শন করিতেন। এইরূপে ভ্রমণ কালে একদিন তাঁহারা মণিকর্ণিকার ঘাটে গমন করেন। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে শবদাহের বিরাম নাই। স্থানটী দিবারাত্র চিতাধূমে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখনও কয়েকটী শব দাহ করা হইতেছিল। শ্মশানের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্য ও দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, পিঙ্গল জটা ও ত্রিশূলধারী মহাকাল প্রত্যেকটী শবের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন এবং মহাকালী-রূপিনী জগন্মাতা, উহাদের সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকলকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিতেছেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী কামারপুকুর ত্যাগ করিবার পর, এতকাল ৺কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। সেখানে পুনরায় ভৈরবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, রামকৃষ্ণ কয়েক বার তাঁহার বাস-ভবনে গমন করেন। ব্রাহ্মণীও অনেক দিন পর প্রিয় শিষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত ৺বৃন্দাবন ধাম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তথা হইতে আর ফিরিয়া আসেন নাই। শুনা যায়, অল্পকাল পরেই ৺বৃন্দাবনে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১৮৬৮—৭১)

রামকৃষ্ণের পবিত্র সহবাসে হৃদয় দীর্ঘকাল যাবৎ আনন্দে দিন কাটাইতে ছিলেন। তীর্থ হইতে দেশে ফিরিবার অল্প কাল পরে, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। ইহাতে হৃদয়ের বিষম সংসার-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কখন কখন মাতুলের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যেই হৃদয় দুই-চারিটী দিব্য দর্শন লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন ধ্যান-ধারণাতে অনভ্যস্ত ছিল বলিয়া, তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। একদিন তিনি ভাবের আতিশয্যে আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে রামকৃষ্ণ, তুইও যা', আমিও তাই। চল্ আমরা নগরে নগরে যাইয়া জীব উদ্ধার করি"। হৃদয়ের ঐরূপ

চীৎকারে লোক জড় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু হৃদয় তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। অগত্যা তিনি ৺জগন্মাতার শরণ লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার প্রার্থনার ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। ইহার পর, হৃদয় ক্রমে ক্রমে, পুনরায় বিষয়-কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন। কয়েক মাস পরে, ঐ বৎসরেরই শেষভাগে, হৃদয় দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। হলধারী কর্ম্মত্যাগ করিলে, রামকুমারের পুত্র অক্ষয় ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়ের মাতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছিল বলিয়া, রামকৃষ্ণ বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তিন চারি বৎসর তাঁহাকে সর্ব্বদাই কোলে কাঁখে করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়কে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অক্ষয় যেমন সুপুরুষ, তেমনি ভক্তিমান্ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত কুলদেবতা ৺রঘুবীরের নিত্যপূজা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কালীবাটীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, অক্ষয় একমনে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূজায় বসিলে, মন্দির মধ্যে চারিপার্শ্বে কোথায় কি হইতেছে, এই বিষয়ে তাঁহার হুঁস থাকিত না। মন্দিরের পূজা শেষ করিয়া, তিনি

প্রত্যহ পঞ্চবটীতে যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শিবপূজা করিতেন এবং সেখানেই নিজ হাতে রাঁধিয়া আহার করিতেন। আহারের পরেও তিনি বিশ্রাম লইতেন না। তখন তিনি ভাগবত লইয়া পাঠ করিতে বসিতেন। অক্ষয়ের এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ লক্ষ্য করিয়া, রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত একটা আধ্যাত্মিক আত্মীয়তাও বোধ করিতেন এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন।

রামকৃষ্ণ অক্ষয়ের ভাগবত পাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন। একদিন তিনি বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, ৺গোবিন্দজীর পাদপদ্ম হইতে রজ্জুর আকারে একটা জ্যোতিঃ বাহির হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল। তৎপর উহা তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে মিলিত হইয়া, কিছুক্ষণ এই তিন বস্তুকে সংযুক্ত করিয়া রাখিল। এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া রামকৃষ্ণ ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ যে এক বস্তু—তিনে এক, একে তিন—এই কথাটী পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাড়ী যাইয়া অক্ষয় ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসে বিবাহ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে, তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে দেহত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ রামকৃষ্ণ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে একটুও বিচলিত হইলেন না, বরং মৃত্যুকে অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র বোধ করিয়া, ভাবস্থ হইয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবের বিরাম হইলে, তিনি তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া সাময়িক ভাবে অপর সাধারণের

ন্যায় শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ কালীবাটীতে আসা অবধি চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বাবুদের কুঠীর নীচের তলায় পশ্চিম-দিকের ঘরটীতে বাস করিতেছিলেন। কুঠীঘরে অক্ষয়ের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া, রামকৃষ্ণ অতঃপর আর ঐ গৃহে বাস করেন নাই। বর্ত্তমানে কালীবাটীর যে ঘরখানি (মন্দিরবাটীর ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে) রামকৃষ্ণের বাসগৃহ বলিয়া পরিচিত, বাবুদের কুঠী ত্যাগ করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের অবশিষ্ট জীবন—কিঞ্চিদধিক ষোল বৎসর—এই গৃহেই বাস করিয়াছিলেন।

অক্ষয়ের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর তাঁহার স্থলে পূজকের পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনিও খুব বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। কালীবাটীতে মাত্র চারি বৎসর কাজ করিবার পর, ১২৮০ সালের শীতের প্রারম্ভে জ্বরাতিসার রোগে কামারপুকুরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তৎপর রামকৃষ্ণের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র দীনু পূজারী বিষ্ণুমন্দিরের সেবাপূজা চালাইতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহারও শরীর ত্যাগ হয়। দীনু পূজারীর দেহান্ত হইলে, রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল বিষ্ণুমন্দিরের পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া পিতার স্থলবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

অক্ষয়ের দেহত্যাগের কিছুকাল পরে মথুর জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি নিজ বাটী এবং কুলগুরু গৃহেও গমন করেন। অক্ষয়ের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ শোক পাইয়াছেন ভাবিয়া, এই সময়ে মথুর বাবু

তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। মথুর বাবুর জমিদারী-ভুক্ত রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী কালাইঘাট নামক গ্রামের লোকের দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া রামকৃষ্ণের কোমল হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। দেওঘরের ন্যায় এখানেও তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া দুঃখী পল্লীবাসিগণের প্রত্যেককে একমাথা তৈল ও একখানা নূতন কাপড় দান করিয়া, এক বেলা আকণ্ঠ ভোজন করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া তাহাদের ঐ বৎসরের খাজনাও মাপ করিয়া দিয়াছিলেন। মথুর বাবুর জমিদারী পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার অল্পকাল পরেই, রামকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল, নবদ্বীপ দর্শন করিবেন। এই কথা জানিতে পারিয়া মথুর পুনরায় বাবাকে লইয়া নৌকাযোগে কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

সচরাচর দেখা গিয়াছে, কোনও মহাপুরুষের লীলাস্থলে গমন করিলে, দিব্য ভাবাবেশে রামকৃষ্ণের নানা দর্শন উপস্থিত হইত। কিন্তু নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার তেমন কোন দর্শন বা ভাবাবেশ হয় নাই। তবে নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার পথে, কতকগুলি বালুচড়ার নিকটে নৌকায় উঠিবার সময়, রামকৃষ্ণ কিশোর বয়স্ক গৌরনিতাই-এর দর্শন লাভ করিয়া ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঐ দিব্যকান্তি বালক মূর্ত্তিদ্বয় তাঁহার অঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রামকৃষ্ণ এই দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত লীলাস্থল নবদ্বীপ ঐ বালুচড়াগুলির মধ্যে কোথাও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে;

তাই সেখানে তাঁহার ঐরূপ দর্শন ও ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কালনার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু, ভগবান্ দাস বাবাজীর ত্যাগ তপস্যার কথা শুনিয়া, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবাজীর বয়স তখন আশীর কোঠা পার হইয়া গিয়াছে। তিনি দিনের অনেক সময়ই ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।

৺জগন্মাতার শিশু-বালক রামকৃষ্ণ সকল প্রকার অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কার্য্যে অনুক্ষণ তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন। অহংভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না; এমন কি 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি অহংভাব প্রকাশক শব্দ পর্য্যন্ত তিনি অনায়াসে বা যখন তখন উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি, এর ভিতর যিনি রয়েছেন, এখানে, এখানকার ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিয়া, তিনি নিজের বিষয়ে বলিতেন। অধিকন্তু, অপর কেহ কথা-বার্ত্তায় বা কাজকর্ম্মে অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ করিলেও, তিনি অন্তরে যন্ত্রণা বোধ করিতেন; কারণ, উহা তাঁহার নিরহঙ্কার ভাবধারায় ভীষণ ভাবে আঘাত করিত। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ-গণকে সকল সময়েই এইরূপে অন্তরে-বাহিরে আমিত্ব বর্জ্জন করিতে দেখা যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেব নিজের কথা বলিতে যাইয়া 'তথাগত' শব্দ প্রয়োগ করিতেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ আভি-

জাত্য গৌরব ত্যাগ করিয়া 'দাস' উপাধি দ্বারা আপনাদের পরিচয় দিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। খ্রীষ্টাবতার যীশু নিজেকে The son of man (মানবসন্তান) নামে অভিহিত করিতেন। ইসলাম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ 'পয়গম্বর' (প্রেরিত পুরুষ) শব্দে আপনাকে নির্দ্দেশ করিতেন।

কালনায় ভগবান্ দাস বাবাজীর আখড়াতে উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন, বাবাজী জনৈক বৈষ্ণব সাধুকে তাঁহার অসাধু আচরণের জন্য কঠোর ভাবে তিরস্কার করিতেছেন, এবং মালাতিলক কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন। রামকৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভগবান্ দাসকে প্রণাম করিলেন এবং ঘরের এক পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। হৃদয় অগ্রেই বাবাজীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট মাতুলের আগমনের কথা বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। ইহার পর ভগবান্ দাস প্রসঙ্গক্রমে বলিতে লাগিলেন, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও অপর সাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি মালা-তিলক ধারণ ও অনুক্ষণ জপাদি বৈষ্ণবোচিত আচরণ করিয়া থাকেন। বিনয়, নিরভিমানিতা প্রভৃতি গুণ বৈষ্ণব চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। অথচ পর পর দুইটী বিষয়ে বাবাজীকে এইরূপ অহঙ্কারসূচক ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখিয়া, স্পষ্টবাদী রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে বলিতে লাগিলেন, "কি! তুমি না বৈষ্ণব? এখনও তোমার এত

অহঙ্কার! তুমি সাধুকে তাঁহার সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে, তুমি লোককে শিক্ষা দিবে, শিক্ষা দিবার তুমি কে? যাঁর জগৎ, তিনি যদি শিক্ষা না দেন, তবে তুমি লোককে শিক্ষা দিতে পার?"

ভগবান্ দাস বাবাজী বাস্তবিক অতি উন্নত চরিত্র সিদ্ধ পুরুষ। কাজেই রামকৃষ্ণের সারবান্ কথা কয়টী শুনিয়া, বাবাজীর চৈতন্যোদয় হইল; তিনি আত্মদোষ দর্শনে সমর্থ হইলেন। ফলে তিরস্কৃত হইয়াও ভগবান্ দাসের ক্রোধের উদ্রেক হইল না, বরং তিনি বিনীত ভাব অবলম্বন করিলেন। বাবাজীর মনে পড়িয়া গেল, বিন্দুমাত্র অহংকার এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানও সাধুর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, বাস্তবিক ভগবানের বিরাট ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হয়।

রামকৃষ্ণের ভাবভক্তি এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদের পরিচয় পাইয়া, ভগবান্ দাস তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। ফলে বাবাজী ও রামকৃষ্ণের মধ্যে বেশ একটী প্রীতির ভাব স্থাপিত হইল। মথুর বাবুও বাবাজীর দর্শন লাভে প্রীত হইয়া, একদিন তাঁহার আখড়ায় বৈষ্ণব ও ভক্তগণের সেবার আয়োজন করিলেন।

কালনায় আসিবার কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিবস রামকৃষ্ণ কলিকাতার কলুটোলাস্থিত (শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্তের বাড়ীতে) হরিসভায় ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ভাবস্থ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনটী গ্রহণ

করেন। রামকৃষ্ণের মধ্যে তখন শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তনানন্দের ভাব প্রকাশিত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত বৈষ্ণবগণ মত্ত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের আসনের উপর যাইয়া দাঁড়াইয়াছেন লক্ষ্য করিয়াও, তখন উপস্থিত কাহারও মন তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল না। কিন্তু পরে ইহা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে এক ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। কালনার ভগবান্ দাস এই ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসন গ্রহণকারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পর, তিনিই সেই ব্যক্তি, এই কথা জানিতে পারিয়া ভগবান্ দাস বলিয়াছিলেন, "বাস্তবিকই ইনি মহাপুরুষ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আসন গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি"। না জানিয়া, ক্রোধের বশে তাঁহাকে বৃথা কটূক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের সহিত কালনা নবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের প্রায় এক বৎসর পরে বিধির বিধানে মথুরামোহনের কাল পূর্ণ হইল, তিনি ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ১লা শ্রাবণ (১৬ জুলাই, ১৮৭১ খৃঃ) দেহত্যাগ করতঃ নিজ পুণ্যফলে দেবীলোকে গমন করিলেন।

মথুরামোহন বিশ্বাস ও রামকৃষ্ণের ছোট-খাট বাসনা

(১৮৫৭—৭১)

দরিদ্র পিতামাতার গৃহে মথুরামোহনের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি আপন রূপ, গুণ ও বিদ্যা বলে রাণী রাসমণির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর, অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীযুক্ত মথুর বিষয়-কর্ম্মে রাণীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। কাজেই, রাণী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলে, মথুর প্রায়ই পুরোহিত ও কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাদি দেখিবার জন্য কালী-বাটীতে যাইতেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাস পরেই তিনি রামকৃষ্ণের সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর প্রকৃতি ও ভাবভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। মথুর বাবুই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেদ করিয়া তাঁহাকে মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার অনেক কথাই আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

মথুরামোহন ইংরাজী-শিক্ষিত লোক। কাজেই তাঁহার মন সরল হইলেও সংশয়ী ছিল। যুক্তি-বিচার না করিয়া, তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। মথুর, দিনের পর দিন, রামকৃষ্ণের ত্যাগ তপস্যা, সরলতা ও জিতেন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে পদে পদে পরীক্ষা করিতে ছাড়িতেন না। অবশেষে মথুর পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক বৎসর রামকৃষ্ণের সঙ্গ করিবার পর, তাঁহার অদ্ভুত কাঞ্চন-ত্যাগ ও স্ত্রীমাত্রেই সহজ

মাতৃভাব সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস লাভ করিয়া, তিনি স্ত্রীপুত্র, পরিবার ও ধন-জন সহ আপনাকে চিরকালের জন্য তাঁহার পদে বিকাইয়া দিলেন ; রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও ইষ্টের স্থান অধিকার করিলেন।

মথুরামোহন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত (১২৭৮ সাল) পর্য্যন্ত, চৌদ্দ বৎসর কায়মনোবাক্যে রামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের কোন প্রকার অসুখ, অসুবিধা বা সেবার ত্রুটী হইলে, তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহার সেবাযত্ন সম্বন্ধে পরামর্শ করা, মথুরের নিত্যকর্ম্ম ছিল। কখন কখন তিনি কালীবাটীতে রামকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া, তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার অন্য সময়ে, তাঁহাকে জানবাজারের বাটীতে লইয়া যাইয়া যত্ন করিয়া রাখিতেন। অনেক দিন বিকাল বেলা তিনি নিজ গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে লইয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। আবার তাঁহাকে কলিকাতার উইলিয়াম দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম) প্রভৃতি নানা স্থানেও বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণ জানবাজারে রাণী রাসমণির বাটীতে আসিলে, তাঁহাদের বাড়ীতে উৎসবের ধূম পড়িয়া যাইত। মথুরের স্ত্রীপুত্র ও পরিবারের অন্য সকলে তাঁহাকে লইয়া আনন্দে মগ্ন হইত।

রামকৃষ্ণ মথুরের সেবায় তুষ্ট হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট মথুরের অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না। মথুর বাবু ঐহিক, পারত্রিক, সকল বিষয়েই তাঁহার শরণ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

একবার মথুরের স্ত্রী মরণাপন্ন হইলে, তিনি রামকৃষ্ণের নিকট কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রামকৃষ্ণ কি করিবেন, শরণাগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, তাঁহার অসুখ নিজ শরীরেই টানিয়া লইলেন। মথুরের স্ত্রী সুস্থ হইলেন, কিন্তু ইহার জন্য রামকৃষ্ণকে অনেক দিন ভুগিতে হইল। মথুর বাবু রজোগুণী লোক। একটা মস্ত জমিদারী তাঁহার চালাইতে হইত। কাজেই, তিনি যে সকল সময়েই ন্যায় পথে চলিতেন, এমন নহে। ভোগীদের জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা মথুরের নিত্য-সঙ্গী ছিল। একবার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা খুন করিয়া, মথুর রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া খুনের দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। মথুর কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে, রামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে শাসন করিতেন। খুনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই শালা রোজ একটা করে ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়ে আসবি, আর আমাকে তা সামলাতে হবে ?"

সদা সর্ব্বদা রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি দেখিয়া, একবার মথুর বাবুরও ভাবের আনন্দ আস্বাদ করিতে ইচ্ছা হইল। এই জন্য তিনি তাঁহাকে খুব জেদ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণ ভাব-রাজ্যের রাজা। তিনি মথুরকে প্রথমে অনেক বুঝাইলেন যে, সকলের সকল অবস্থায় ভাব হওয়া ভাল নয়; কিন্তু মথুর কিছুতেই জেদ ছাড়িলেন না। অগত্যা রামকৃষ্ণ বলিলেন, "মা কালীর যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমার ভাব অবশ্যই হবে"। ইহার অল্প কাল পরেই একবার মথুর বাবুর ভাব হইল। তিন দিন যায়, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার ভাবের বিরাম হয় না। তাঁহার

চক্ষু জবা ফুলের মত লাল এবং বক্ষঃ রক্তবর্ণ হইল, আর দিবারাত্র তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা চলিতে লাগিল। এই তিন দিনেই জমিদারীর অনেক কাজ এলোমেলো হইয়া পড়িল। মথুরের স্ত্রী-পুত্র কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া প্রমাদ গণিলেন। ডাক্তার ডাকা হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরুপায় হইয়া রামকৃষ্ণের নিকট খবর পাঠাইলেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া, তিনি জানবাজারে উপস্থিত হইলে, মথুর বাবু তাঁহাকে দেখিয়াই পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, বড় অন্যায় করেছি। আর কখনো ভাবের জন্য তোমাকে বলব না। বিষয়কর্ম্ম সব ছত্রছান হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, এসব ভাব তোমাতেই সাজে"। রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি ত তোমাকে আগেই একথা বলেছি"। তারপর তিনি মথুরের বুকে হাত বুলাইয়া দিতেই তাঁহার ভাবের উপশম হইল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মথুর বাবু যুক্তিবাদী, স্বাধীন চিন্তাশীল। একদিন তিনি কথায় কথায় রামকৃষ্ণকে বলিলেন, ঈশ্বর যে নিয়ম করেন, তাঁহাকেও সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, তিনি ইচ্ছা করিলেও, উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। রামকৃষ্ণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তিনি যেমন আইন গড়িতে পারেন, তিনি উহা ভাঙ্গিতেও পারেন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছায়ই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। মথুর কিন্তু কিছুতেই এই কথা মানিলেন না। তিনি বলিলেন, লাল ফুলের গাছে

লাল ফুলই হইয়া থাকে, কখনও সাদা ফুল হয় না। পরদিন রামকৃষ্ণ শৌচে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, একটা লাল জবা গাছে, একই বোটায় একটী লাল ও একটী সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। অমনি তিনি ডালশুদ্ধ ফুল দুইটী লইয়া আসিয়া মথুরকে দেখাইলেন। এইরূপে নিত্যই কত অদ্ভুত ঘটনা মথুরের ভাবভক্তি ও রামকৃষ্ণ-প্রীতি বাড়াইয়া দিত এবং তিনি বাবার সেবায় অধিকতর মনোযোগ দিতেন; রামকৃষ্ণ যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহা তিনি অচিরেই কার্য্যে পরিণত করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে নানা সম্প্রদায়ের সাধু-সমাগম হইত। এই কথা পূর্ব্বেই দুই এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংসার-রূপ দৈবী মায়া-প্রপঞ্চের বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়া উল্লসিত হইতেন। আবার কোন কোন সাধু জ্ঞান লাভ করিয়া বালক, উন্মাদ অথবা পিশাচবৎ বিচরণ করিতেন। একবার একজন সাধু আসিয়াছিলেন, তিনি 'গীতা' গ্রন্থকে ভগবানের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া, অনুক্ষণ উহার অনুশীলনে রত থাকিতেন। অপর একজন সাধু 'রাম' নামকেই জগতের সার জানিয়া অনবরত 'ওঁ রাম' মন্ত্র পাঠে ভক্তি গদগদ হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। রামকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল, এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীকে অন্ন-পানীয় ব্যতীত, প্রয়োজনীয় কম্বল, কমণ্ডলু প্রভৃতি দান করেন। তাই মথুর বাবু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা কালীবাটীর একটী ঘর পূর্ণ করিয়া রাখিলেন। রামকৃষ্ণের ইচ্ছামত উহা সাধুদিগকে বিতরণ করা হইত।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, মনের ছোট-খাট বাসনাগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়; আর বড় বড় বাসনা, যাহা দীর্ঘকাল অথবা জীবন-ব্যাপী দুঃখ ও অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, বিচার পূর্ব্বক ঐগুলিকে মন হইতে তাড়াইয়া দিতে হয়। বিচারের সহিত ভোগ করিয়া, কিরূপে উহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও তিনি অনেকবার স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কালী-বাটীতে আসিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় নাগের-বাগানে একটী ছেলের কোমরে সোণার গোট দেখিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার মনে ঐরূপ গোট পরিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই তিনি মথুরকে বলিয়া সোণার গোট পরিলেন। একবার তাঁহার সাধ হইল, খুব ভাল জরীর পোষাক পরিয়া আমীর-ওমরাহদের মত রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাইবেন। তাঁহার মনের সাধ জানিতে পারিয়া, মথুর সঙ্গে সঙ্গেই উহার ব্যবস্থা করিলেন। অন্য এক সময়ে, তাঁহার শাল গায়ে দিতে ইচ্ছা হইল। অমনি মথুর হাজার টাকা দামের একখানা শাল আনিয়া দিলেন।

রামকৃষ্ণের এইরূপ আচরণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্তরে বিন্দুমাত্র ভোগলালসা থাকিলেও, উহা মুমুক্ষুর পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। ছোটখাট বাসনাগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়। ভোগান্ত হইলে, বাস্তবিক ত্যাগ বা সন্ন্যাসের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বাসনা সকল (পুত্র, বিত্ত ও লোক লাভ প্রভৃতি এষণা) শীতকালের শুষ্ক পত্রের ন্যায় মনরূপ বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে। অন্যথা

ত্যাগ কেবলমাত্র ত্যাগের ভাণেই পরিণত হইয়া থাকে; জ্ঞানভক্তি শুষ্কতায় পর্য্যবসিত হয় *।

রামকৃষ্ণের ভোগ জগতের শিক্ষার জন্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ তাঁহার অপরিসীম ত্যাগের সহিত তুলনায় এই ভোগ সমূহ সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। আবার রামকৃষ্ণের ভোগ-প্রণালী অপর সাধারণের ন্যায় ছিল না। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের বাসনা সমূহের মূল একেবারে পাতালভেদী। আমরা সামান্য ভোগেই আত্মহারা ও দিশাহারা হইয়া পড়ি। কিন্তু রামকৃষ্ণের ছোটখাট ভোগগুলিও ছিল সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গত। প্রথমে সোণার গোট পরিয়া তাঁহার মন সামান্য চঞ্চল হইল, তিনি মনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মন, এরই নাম সোণার গোট। ইহা পরিতে লোকের সাধ হয়। কিন্তু ইহা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, আবার লোকের অহঙ্কার বাড়াইয়া দেয়। অতএব তুমি ইহা ত্যাগ কর"। এইরূপ বিচার করিয়া রামকৃষ্ণ সোণার গোট খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণের নিকট জরীর পোষাক এবং হাজার টাকা দামের শালেরও বড়ই দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। 'এদের দ্বারা মনের তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু এদ্বারা ভগবান্ লাভ হয় না' এইরূপ বিচার করিতে করিতে তিনি শাল ও জরীর পোষাক গায়ে দিবামাত্রই ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন।

---

* বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ গীতা ২।৫৯

সেই মুহূর্ত্তেই তিনি উহা শরীর হইতে খুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইতে ও উহার উপর থুৎকার করিতে লাগিলেন। শালের বেলায় এতটা করিয়াও তাঁহার বিচারের নিবৃত্তি হইল না, তিনি অগ্নি সংযোগে উহা পোড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি শালখানা সরাইয়া লইল। এই প্রকার বিচার ও ত্যাগের ফলে, শেষ বয়সে ধাতু-দ্রব্যাদি স্পর্শ করিলেও রামকৃষ্ণের গায়ে যেন কাঁটা ফুটিত। একদিন রামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তের মনে ভোগের প্রবল ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যা শালা, খেয়ে লে, পরে লে, সব করে লে। কিন্তু কোনটাই, ধর্ম্ম করছিস্ মনে করে করিস্‌নি"।

উপরি উক্ত প্রণালীতে রামকৃষ্ণ ছোটখাট বাসনাগুলি পূরণ করিয়া লইলেও, তাঁহার মূলে ভুল ছিল না! একবার মথুর বাবু তাঁহার সেবার নিমিত্ত একখানা তালুক লিখিয়া দিতে চাহিলে, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। ইহার পরেও, পুনরায় একদিন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে শুনিয়া তিনি "শালা, তুই আমাকে ভোগী বানাতে চাস্" এই বলিয়া মথুর বাবুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী নামক জনৈক ভক্ত একবার তাঁহাকে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিতে চাহিলে, তিনি তাঁহাকেও এই বলিয়া কঠোর ভাবে শাসন করিয়াছিলেন, "তুমি আবার অমন কথা বল ত আর এখানে এসো না"।

৮ষোড়শী পূজা, যীশুখৃষ্টের দর্শনলাভ ও চন্দ্রমণির দেহত্যাগ

(১৮৭২—৭৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের বালিকাবধূ সারদামণি বর্ত্তমানে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিয়াছেন। এখন আর তিনি বালিকা নহেন, পূর্ণ যুবতী। সারদামণি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা হইলেও, আজন্ম কোলাহলপূর্ণ নগর হইতে বহুদূরে, শান্তি ও নীরবতাময় পল্লীগ্রামে সুখের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হইয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তিনি দ্বিতীয়বার মাত্র স্বামীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দেবতুল্য স্বামীর কামগন্ধহীন, দেহসম্পর্ক-বিরহিত অপার্থিব প্রেম-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, তিনি ঐকালে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিতা হইয়াছিলেন। পতি-দেবতার চিন্তায়ই তাঁহার এই চারি বৎসর পরম আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু "রামকৃষ্ণ অনুক্ষণ উন্মাদবৎ আচরণ, মা মা রবে চীৎকার এবং উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করেন" ইত্যাদি নানা কথা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া সারদামণির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বাস্তবিকই পাগল হইয়াছেন কিনা, এবং পাগল হইয়া থাকিলেও, তাঁহার সেবা করাই স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য, এই প্রকার অনেক কথা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। সারদামণি মনে মনে স্থির করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া একবার স্বামীর চরণ দর্শন করিবেন।

১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার সময়, সারদামণি গ্রামের কয়েক জন আত্মীয়া রমণীর সহিত গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বৈগুবাটী হইয়া কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে জয়রামবাটী অঞ্চলের সহিত রেলপথে কলিকাতার কোন যোগাযোগ ছিল না। কারণ, তখনও হাওড়া হইতে বিষ্ণুপুর অথবা হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথ খোলাই হয় নাই। অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে পাল্কী ভাড়া করিয়া ৫০।৫২ মাইল পথ যাওয়াও সাধ্যাতীত ছিল। তজ্জন্য রামচন্দ্র স্বয়ং এক শুভদিনে কন্যাকে লইয়া হাঁটাপথে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত দুই তিন দিন পথ চলিয়া পথশ্রমে অনভ্যস্তা সারদামণি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এক রাত্রি চটীতে অবস্থান করিবার পর, জ্বরের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, পিতা অসুস্থা কন্যাকে লইয়াই পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সমস্ত দিনমান ও রাত্রি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত পথ চলিয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন। রামকৃষ্ণ পত্নীকে পীড়িতা দেখিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে, মথুর বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। মথুর জীবিত থাকিলে, সারদামণির চিকিৎসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের একটুও ভাবিতে হইত না। তিনি প্রথমে একটু ভাবিত হইলেন। সে যাহা হউক, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে পরম সমাদরে নিজের কাছে রাখিয়া নিয়মিত ঔষধ-পথ্য সেবন করাইতে লাগিলেন। স্বামীর যত্ন ও নিয়মিত ঔষধ সেবনে সারদামণি কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

রামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও অন্যান্য আচরণ লক্ষ্য করিয়া সারদামণি দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে যেমনটী দেখিয়াছিলেন, তাঁহার দেবতুল্য স্বামী ঠিক তেমনই রহিয়াছেন; তাঁহার স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র দেশে ফিরিলেন। কিন্তু কন্যা সারদামণি দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কামারপুকুরে আগমন করিলে, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু প্রকারে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এবারও তিনি তাঁহাকে নিকটে পাইয়া, পূর্ব্ববৎ দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যেই, কাহার সহিত কিরূপ আলাপ করিতে ও চলিতে হয় ইত্যাদি লোক-ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্‌ভক্তি, সাধন ভজন ও ঈশ্বর-লাভ বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঈশ্বরলাভ সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে সারদামণিকে বলিতেন, চাঁদামামা যেমন সকলেরই মামা, সেইরূপ ঈশ্বরও সকলেরই অতি আপনার জন। যে তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ডাকে, সে-ই তাঁহার দেখা পায়। আবার ঈশ্বরই যে একমাত্র নিত্য বস্তু এবং ঈশ্বরলাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য, ইহাও তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের এই শিক্ষা গুণেই সারদামণি পরবর্ত্তী কালে আপন মধুর অমায়িক ব্যবহার দ্বারা রামকৃষ্ণ-পদানুগ ভক্তমণ্ডলীকে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, অসংখ্য ত্রিতাপ-দগ্ধ নরনারী শ্রীমতী সারদামণির জীবনালোক ও পদাশ্রয় লাভ করিয়া

পরম শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি কিছুকাল একত্র বাস করিলেন। কিন্তু তাহাতে দেহবুদ্ধি-রহিত রামকৃষ্ণের, পত্নীতে মাতৃবুদ্ধির একটুও হানি হইল না, তাঁহার মন স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সম্পর্ক হইতে বহু ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত রহিল।

কঠোর তপস্যা, ত্যাগ এবং সংযমের ফলে, রামকৃষ্ণ ভগবানের দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি সকল ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, সংসারের অসারতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। কার্য্যতঃ উহার পরীক্ষাও আপনা হইতেই হইয়া গেল। আট মাস কাল ষোড়শী পত্নীর সহিত একত্র এক গৃহে বাস করিয়াও যখন রামকৃষ্ণ দেখিলেন, ভ্রমেও তাঁহার পত্নীতে স্ত্রী বা ভোগ্য বুদ্ধি আসে না, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুভব করেন, তখন তাঁহার মনে একটী শুভেচ্ছার পরিকল্পনা আসিল; তিনি স্থির করিলেন, পত্নীকে আনন্দময়ী মাতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজা করিয়া সাধনা সাঙ্গ করিবেন।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ৺ফলহারিণী কালিকাপূজার দিনে রামকৃষ্ণ নিজ গৃহে ৺দেবী পূজার সকল আয়োজন করিলেন। দিনমান অতীত হইলে, দেখিতে দেখিতে রাত্রির অন্ধকার সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। অমাবস্যা নিশি, গাঢ় অন্ধকার, রাত্রি প্রায় প্রথম প্রহর অতীত হইতে চলিয়াছে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ; এমন সময়ে রামকৃষ্ণ শ্রীমতী সারদামণিকে পূজা স্থানে আহ্বান করিলেন। তৎপর পূজার আসন গ্রহণ ও প্রাথমিক

কৃত্য সমূহ সমাপন করিয়া তিনি পত্নীকে ৺দেবীর আসনে বসাইলেন এবং সাক্ষাৎ ৺জগদম্বা জ্ঞানে তাঁহার শ্রীপদযুগল যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পূজা সাঙ্গ হইল, পূজক ও পূজিতা উভয়েই সমাধি-মগ্ন হইলেন। সমাধি ভঙ্গের পর, রামকৃষ্ণ আজীবন সাধনার ফল ও জপমালা প্রভৃতি সারদা দেবীর শ্রীপদে বিসর্জ্জন দিয়া, পূজার পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। এখানেই রামকৃষ্ণের সাধক জীবনের অন্ত হইল। উক্ত ষোড়শী পূজার পর, আরও কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া, সারদামণি কামারপুকুরে গমন করিলেন।

রামকৃষ্ণের সাধনেচ্ছা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হওয়ায়, বর্ত্তমানে তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি এখন অনেক সময়েই শাস্ত্র-পাঠাদি শ্রবণ করিয়া আনন্দে কাল কাটাইতেন। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়া, তিনি বুদ্ধদেব, জৈন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর প্রভৃতি তীর্থঙ্কর এবং শিখ সম্প্রদায়ের নানকাদি দশগুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই কালে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত পাথুরিয়াঘাটার যদুনাথ মল্লিকের বাগান-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে যদু বাবুর সহিত তাঁহার নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হইত। যদু বাবুর বৈঠকখানা গৃহের দেয়ালে, একখানি চিত্রপটে মেরী-কোলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ঈশার জ্যোতির্ম্ময় বালক-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়া, তিনি দিবসত্রয় যীশুখৃষ্টের ভাবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছিলেন এবং ঐ তিন দিন

পর, তিনি যীশুখৃষ্টের পরিণত বয়সের দিব্য মূর্ত্তিরও দর্শন পাইয়াছিলেন। যীশুর পরিণত বয়সের মূর্ত্তিটী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণের দেহে মিলাইয়া গিয়াছিল। এইরূপে নিজ জীবনে সকল ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে অশেষ প্রকারে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিয়া রামকৃষ্ণ নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন, অনন্ত ভাবময় ভগবান্‌কে জানিবার অনন্ত পথও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটী পথই সাধককে চরমে পূর্ণ জ্ঞান দান করিতে সমর্থ। বাস্তবিকই তাঁহার ভাবের ইতি করা যায় না,—"যত মত, তত পথ"।

কলিকাতার সিঁদুরিয়াপট্টীর শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে নিজ বাগান-বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন। তাঁহার বাগানবাটী কালীবাড়ীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শম্ভুচরণ কিছুকাল পূর্ব্বে রামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত এবং ধার্ম্মিক, উদারচেতা, দাতা ও তেজস্বী লোক। প্রথম পরিচয়ের পর, অল্পকাল মধ্যেই শম্ভু ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী রামকৃষ্ণের সহজ সরল ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। শম্ভু বাবু কখন কখন রামকৃষ্ণকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার নিকট যীশুখৃষ্টের ত্যাগ ও তপস্যাময় চরিত্রের কথা শুনিবার পরেই, যদু বাবুর বাগান বাড়ীর বৈঠকখানায় মেরীকোলে যীশুর প্রতিকৃতি দেখিয়া, রামকৃষ্ণ ঈশার ভাবে তন্ময় হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সারদামণি উত্তর কালে রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীর নিকট 'শ্রীমা' বা 'মাতাঠাকুরাণী' আখ্যা লাভ করেন। ১২৮১ সালের প্রারম্ভে শ্রীমা দ্বিতীয় বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এবং বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রাদেবীর সহিত একত্র কালীবাটীর স্বল্পপরিসর নহবৎখানায় বাস করিতে থাকেন। ঐ ক্ষুদ্র গৃহে দুই জনের পক্ষে বাস করা খুবই কষ্টকর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, শম্ভু বাবু কালীবাটীর অতি নিকটে একখণ্ড জমির বন্দোবস্ত করিলেন। তৎপর তিনি ঐ স্থানে শ্রীমার বাসের নিমিত্ত একখানা বৃহৎ চালাঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এই সময়ে নেপাল রাজ-সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণের নিকট আসিতেন। তিনি উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে তিনটী বৃহৎ শাল গাছ দ্বারা শম্ভু বাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় বৎসর কাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া, শ্রীমা দারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। শম্ভু বাবুর উদ্যোগে, কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, তিনি পিত্রালয় জয়রামবাটী গমন করিলেন।

রামকৃষ্ণ-জননী বৃদ্ধা চন্দ্রমণি পর পর স্বামী পুত্রাদির পরলোক গমন, সংসারের অভাব অনটন, গদাধরের অসুস্থতা প্রভৃতিতে শোকে জর্জ্জরিতা হইয়া, ১২৭০ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তদবধি সংসার-বীতশ্রদ্ধ চন্দ্রা ভাগীরথী-তীর আশ্রয় করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করিতেছিলেন, আর কামারপুকুরে ফিরিয়া যান নাই। এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মধ্যে

তিনি একবার মাত্র পুত্রের সহিত তীর্থ ভ্রমণে (৺কাশী ও প্রয়াগ) বাহির হইয়াছিলেন। চন্দ্রা অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর জরার প্রকোপে অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মন ও বালক-বালিকার মনের ন্যায় আঁটছাড়া হইয়া গিয়াছে। সন ১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল এবং ১৬ই ফাল্গুন তারিখে তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রামকৃষ্ণ শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মাতার দেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি বৈধ কর্ম্মে তাঁহার আর অধিকার নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ঐ সকল ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিলেন।

চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসা অবধি, রামকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং যথাসাধ্য মাতার সেবাও করিতেন। মাতার তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ নহবতে তাঁহার নিকটে বসিয়া আহার করিতেন। চন্দ্রমণির দেহত্যাগের পর, একদিন রামকৃষ্ণ ভাবিলেন, "জননীর দেহান্তে পুত্রের যে কর্ত্তব্য, তাহার ত কিছুই করিলাম না"। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হইল এবং তিনি মাতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ কালে কায়মনোবাক্যে বৈধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। উহার ফলে, তিনি হাত অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া জল লইবামাত্র বার বার অঙ্গুলি সকল বাঁকাইয়া জল গলাইয়া পড়িয়া

যাইতে লাগিল। এই নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে আর তর্পণ করা সম্ভব হইল না। মাতার উদ্দেশ্যে একবার মাত্র তর্পণও করিতে পারিলেন না ভাবিয়া, তখন রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি কোনও পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ একটা অবস্থার উল্লেখ আছে। ইহাকে গলিত-কর্ম্ম অবস্থা বলে। সৌভাগ্য-ক্রমে যাঁহাদের এই অবস্থা আসে এবং সকল বৈধ কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ হয়, তাঁহারা 'গলিতকর্ম্মা' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রমণি কত অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া শান্ত, সরল ও নির্লোভ জীবন যাপন করিতেন, সেই সম্বন্ধে আমরা এখানে একটী ঘটনা উল্লেখ করিব। মথুর বাবুর মৃত্যুর পর কি ভাবে বাবার সেবা চলিবে, এই কথা ভাবিয়া মথুর একবার তাঁহার নামে একখানা তালুক লিখিয়া দিবার জন্য হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। দূর হইতে তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইয়া, রামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া মথুর বাবুকে বলিলেন, "শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস ?" শুধু ইহাই নহে, তিনি তাঁহাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। চন্দ্রমণি তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করিতেছেন। মথুর বাবু ভাবিলেন, চন্দ্রাদেবীর নিকট এইরূপ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দেখিবেন, তাহাতে কোন কাজ হয় কিনা। একদিন মথুর প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট কখন কোন জিনিস চাও না। আমার ভারি সাধ, তোমাকে একটা কিছু দিব। আজ তুমি আমার নিকট

যাহা হউক কিছু চাহিয়া লও"। ইহার উত্তরে চন্দ্রা বলিলেন, "বাবা, আমার ত এখানে খাওয়া-পরা কিছুরই কোন অভাব নাই; তোমার নিকট আর কি চাইব?" মথুর তবুও বার বার জেদ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ক্ষণেক চিন্তার পর চন্দ্রা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার মুখে গুল দিবার তামাক পাতা ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি যখন কিছু না দিয়া ছাড়িবে না, আমাকে চার পয়সার তামাক পাতা আনিয়া দিও"। ঠাকুরমা এত অল্পেই সন্তুষ্ট লক্ষ্য করিয়া, মথুর বাবু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এমন মা না হইলে কি এইরূপ ত্যাগী ছেলে হয়?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—প্রচার

(১৮৭২—১৮৮৫)

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৯

শান্ত, মহৎ ও সাধু ব্যক্তিগণ বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকহিত সাধনে রত হন; তাঁহারা স্বয়ং ভীতিসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও একান্ত নিষ্কাম ভাবে ত্রাণ করিয়া থাকেন।

জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহমন বিশুদ্ধ এবং আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় স্বতঃই বিষয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ। কাঞ্চনাসক্তি সমূলে বিনাশ-প্রাপ্ত হওয়ায়, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুদ্রব্যের স্পর্শ তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করে। দীর্ঘকাল নির্ব্বিকল্প ভূমিতে অবস্থান করার ফলে তাঁহার মন বিরাট মনের সহিত সতত যুক্ত থাকে এবং তজ্জন্য দৃষ্টিমাত্র মানব-মনের চিন্তারাশি তাঁহার মনোমধ্যে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার ইচ্ছা বিরাট ইচ্ছার সহিত একত্ব লাভ করায়, তিনি ইচ্ছামাত্র লোকের অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিতে সমর্থ। তিনি যেমন অনুক্ষণ ভগবদ্‌ভাবে বিভোর, তেমনি তাঁহার সংসর্গ লোকের প্রাণে

পরম আনন্দ দান করে ও ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততার সৃষ্টি করে। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জাতিস্মরত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, ইচ্ছা, দৃষ্টি ও স্পর্শমাত্র অন্যের প্রাণে ধর্ম্মভাব সঞ্চার-ক্ষমতা প্রভৃতি বহু প্রকার যোগ-বিভূতি লাভে অনন্ত শক্তিধর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল অলৌকিক শক্তি ভ্রমেও কখন পার্থিব উদ্দেশ্য বা সুখ-সম্পদ লাভের জন্য প্রয়োগ করিলেন না। কারণ, তিনি উহাদিগকে স্বরূপতঃ অল্প বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন এবং ভূমার আস্বাদ লাভে চির-পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সংসার-দাবদগ্ধ নরনারীকে ভূমার সন্ধান দানে কৃতার্থ করাই, এখন হইতে তাঁহার প্রধান কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইল। জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

ফুল ফুটিলে, মধুলোভে ভ্রমর আপনা হইতেই আসিয়া জুটে, ধনীর দ্বারে প্রার্থীর অভাব হয় না; শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন তপস্যা-লব্ধ তপোধন গ্রহণের নিমিত্তও বহু ভগবদ্‌ভক্ত, ত্যাগী, তপস্বী চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার নিকট জুটিতে লাগিলেন। আবার কোন সাধক বা ভক্তের সন্ধান পাইলে, তিনি অযাচিত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মোপদেশ দানে তাঁহাকে ভগবানের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রমাগত বার বৎসরের সাধনা ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগে, জ্যৈষ্ঠমাসে ৺ফলহারিণী কালীপূজা দিবস, পত্নীতে ৺ষোড়শী পূজা করিয়া, তিনি সাধন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। ইহার পরে, সম্ভবতঃ

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, তিনি খৃষ্টাবতার যীশুর ভাবে তিন দিন মগ্ন ছিলেন। যীশুর ভাবে তিন দিন মগ্ন হইয়া থাকা, বাস্তবিক তাঁহার সাধনার অন্তর্গত নহে। কারণ, তিনি যদু বাবুর বাগান-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইয়া, মেরীকোলে যীশুর প্রতিকৃতি দেখিয়া, আপনা হইতেই তাঁহার ভাবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছিলেন। ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা শেষ হইবার পর, এমন কি ইহার পূর্ব্ব হইতেই অল্পে অল্পে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত সাক্ষাতের পর হইতেই, লোকে তাঁহার কথা বিশেষ ভাবে জানিতে পারে এবং অসংখ্য ভক্ত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সমবেত হইতে থাকেন। তবে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার কোন প্রধান শিষ্য বা ভক্তের আগমনের কথা জানিতে পারা যায় না। তজ্জন্য আমরা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচরণ মল্লিকাদি ভক্তগণের আগমন সময় হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেবের দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতার শ্যামপুকুরে গমন পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ বৎসরকেই তাঁহার প্রচার কাল বলিয়া ধরিলাম এবং শম্ভু বাবুর আগমন হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-প্রচারের অধ্যায় আরম্ভ করা হইল।

শম্ভুচরণ মল্লিক

(আগমন- -১৮৭২ খৃঃ)

শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের কথা ইতিপূর্ব্বে সামান্য ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি জাতিতে সুবর্ণ-বণিক এবং কলিকাতার কোনও এক সওদাগরি আফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন অনেক পরিমাণে সাহেবি ধরণের ছিল। শম্ভু সর্ব্বদাই বাইবেল পাঠ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের পর, তিনি তাঁহাকে অনেক দিন বাইবেল পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। রামকৃষ্ণের অশিক্ষিত, অনাড়ম্বর জীবনে অদ্ভুত ত্যাগ-তপস্যা দেখিয়া, তিনি একদিন তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সিংহ"। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এবং সাধু সন্ন্যাসীতে আস্থাহীন হইলেও, এই সরল ত্যাগ-তপস্যার ভাবটী লক্ষ্য করিয়াই শম্ভু পরমহংসদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়া দেহত্যাগ করিলে, শম্ভু বাবু ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শম্ভুচরণের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। আবার হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ও স্কুল স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি লোকহিতকর কার্য্যের দিকে তাঁহার বড় বেশী ঝোঁক ছিল। এই সম্পর্কে

পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনে কর, ভগবান্ তোমায় দর্শন দিয়ে, বর দিতে চাইলেন, তুমি কি তাঁর কাছে কতগুলো হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারী চাইবে, না শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান এসব চাইবে?" টাকার স্পর্শে পরমহংসদেবের শরীর সঙ্কুচিত হইত, শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত এবং হাত বাঁকিয়া যাইত। ইহা ছাড়া তিনি একটু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার পেটের অসুখ খুব বাড়িয়া গেলে, তিনি শম্ভু বাবুর পরামর্শে একটু একটু আফিং সেবন করিতেন। একদিন শম্ভুচরণের বাগানবাড়ী হইতে, অল্প পরিমাণ আফিং কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া পরমহংসদেব কালীবাটীর দিকে চলিলেন। কিন্তু তিনি যেন আর পথ দেখিতে পাইলেন না, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তারপর নিরুপায় হইয়া কাপড়ের খুঁট হইতে আফিং খুলিয়া ফেলিয়া দিলে, পরমহংসদেব রাস্তা চলিতে সমর্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ছয় বৎসর পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধান ও সেবা করিবার পর, তাঁহার জীবৎ কালেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। ভগবানে শম্ভু বাবুর অটল বিশ্বাস ছিল। তজ্জন্য দেখা গিয়াছে, দেহত্যাগ কালেও মৃত্যুভয় তাঁহাকে মোটেই বিচলিত করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি"।

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়

(১৮৭৩—৭৪)

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। তিনি নেপালের অধিবাসী এবং নেপাল রাজ-সরকারের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বিশ্বনাথ অতি সদাচারী ব্রাহ্মণ ও পরম শিব-ভক্ত; পরমহংসদেব সর্ব্বদাই তাঁহার দেবভক্তির প্রশংসা করিতেন। বেদ-বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নিত্যই গৃহদেবতার পূজা, স্তব ও আরতি করিতেন। পূজা ও আরতির সময়ে, তাঁহার মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। তখন যেন তিনি আর একটি মানুষ হইয়া যাইতেন। বিশ্বনাথের পিতাও অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি ইংরাজের ফৌজে উচ্চ বেতনে সুবাদারের কার্য্য করিতেন। ইঁহার এত ভক্তি ছিল যে, যুদ্ধের সময়ে একহাতে তলোয়ার বা বন্দুক লইয়াও, ইনি অপর হাতে শিবপূজা করিতেন এবং নিত্যপূজা সমাপন না করিয়া, জল গ্রহণ করিতেন না। সুবাদারের পুত্র ছিলেন বলিয়া, পরমহংসদেব বিশ্বনাথকে কাপ্তেন বলিয়া ডাকিতেন।

বিশ্বনাথ প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তজ্জন্য ইংরাজী পড়াশুনা ও ভিন্ন জাতের সঙ্গে মেলামেশাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ইংরাজী-পড়া লোক ভ্রষ্টাচার হইয়া থাকে।

আবার সাধুর মাছ খাওয়াটাও তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি পরমহংসদেবকে বলিতেন, "তুমি মাছ খাও, তার জন্য তোমার সিদ্ধাই হয় না"। এই সম্পর্কে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "সিদ্ধাই হওয়াটা কি ভাল? যে সিদ্ধাই চায়, সে ভগবান্‌কে পায় না; ভগবান্ তার থেকে অনেক দূরে থাকেন"।

সংসারটা কিরূপ মেয়ে-মানুষের বশ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পরবর্ত্তী কালে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "যে মাগ-সুখ ছেড়েছে, সে জগতের সব সুখ ছেড়েছে। কামিনীই মায়া। একবার, কাপ্তেনের বাড়ী হয়ে রামের বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। কাপ্তেনের কাছে গাড়ীভাড়া চাইলুম। সে তার মাগকে টাকার কথা বললে। তার মাগও তেমনি ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, করতে লাগলো। শেষটায় কাপ্তেন আমায় বলে, রাম বাবুরাই গাড়ীভাড়া দিবে। এমন ভক্তিমান্ লোক, কিন্তু কেমন মাগের বশ দেখলে? টাকাকড়ি যা কিছু, সব মাগের হাতে। মাগের কথায় চলে, মাগই যেন তার সব"।

কাপ্তেনের স্ত্রীও বেশ ভক্তিমতী ছিলেন এবং পরে রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অনেক সময়ে পরমহংসদেবকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। তখন কাপ্তেনের স্ত্রী নানা প্রকার তরকারী রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুই-জনে মিলিয়া তাঁহার সেবা করিতেন।

একবার কাপ্তেন তাঁহাদের দেশের একটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া পরমহংসদেবের নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। মেয়েটি ব্রহ্মচারিণী, আর গীত-গোবিন্দখানা আগাগোড়া তাহার কণ্ঠস্থ। সে পরমহংসদেবকে গীত-গোবিন্দ গান করিয়া শুনাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মথুরের পুত্র দ্বারিক বাবু প্রভৃতি ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটি এমন ভক্তিমাখা সুরে গান গাহিয়াছিল যে, দ্বারিক বাবু পর্য্যন্ত তাহার গান শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। 'কেন বিবাহ করে নাই', এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মেয়েটি বলিয়াছিল, "আমি ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব?"

মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী

(১৮৭৩—৭৪)

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। পৈত্রিক সম্পত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণের খাওয়া-পরা চলিয়া যাইত। তজ্জন্য তিনি, কাহারও কর্ম্ম স্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে ঈশ্বর-চিন্তা ও শাস্ত্রপাঠে কাল কাটাইতেন। মহিমাচরণ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিছু পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গৃহী হইলেও, বেদান্তচর্চ্চায় ও জ্ঞানমার্গে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। তিনি বলিতেন, 'জগৎ স্বপ্নবৎ অলীক'। কিন্তু তাঁহার কথায় ও কাজে মিলিত না। মুখে যতটা বলিতেন, তার অনেকাংশই তিনি কার্য্যে পরিণত

করিতে পারিতেন না। মুখে বেদান্তের 'জগৎ মিথ্যা" ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিলেও, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার জন্য বলায়, একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "আজ্ঞে, সংসার এগুতে দেয় না, পেছন থেকে টেনে রাখে"।

শাস্ত্রপাঠ ও তর্ক-বিচারের দিকে মহিমাচরণের যেমন ঝোঁক ছিল, সাধন ভজনের দিকে তেমনটি ছিল না। তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাধনা করিবার কথা বলিতেন। 'সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কই'? মহিমাচরণ এই কথা বলাতে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেন, তুমি ত বল, এ জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা"।

পরমহংসদেব মহিমাচরণের স্তবাদি শুনিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার আদেশে প্রায়ই তিনি বেদ, জীবন্মুক্তি গীতা, রামগীতা, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক ও স্তবাদি আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া, কখন কখন রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন।

মহিমাচরণ শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভাবভক্তি বিশেষ পছন্দ করিতেন না; জ্ঞানের কথা শুনিতেই ভালবাসিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া, শ্রীমতীর ব্যাকুলতা সম্বন্ধে একটি গান গাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে ওসব গান গাওয়া কেন? প্রেম টেম আমার ভাল লাগে না"।

সাধারণতঃ লোক নিজে যাহা করে, তাহার সুখ্যাতি শুনিলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আবার উহার বিপরীত সমালোচনা

শুনিলে, তাঁহার অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হয়। পরমহংসদেব লোক বুঝিয়া কথা বলিতেন। মহিমাচরণ গৃহী ছিলেন; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনের মত ও উপযোগী করিয়াই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সংসার একেবারে ত্যাগ করবার প্রয়োজন কি? আসক্তি চলে গেলেই ত সব হল"।

মহিমাচরণ বড় বড় কথা ভালবাসিতেন। একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কেন্দ্র পরিষৎ'। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল 'মৃগাঙ্ক-মৌলী পূততুণ্ডী'। তিনি তাঁহার গুরুর নাম বলিতেন 'আগমাচার্য্য ডমরুবল্লভ'। আবার কখন কখন পরমহংসদেবের গুরু স্বামী তোতাপুরীকেও তিনি আপন গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মহিমাচরণ অতিমাত্রায় নামযশের কাঙ্গাল ছিলেন। যাহাতে সকলেই তাঁহাকে ভক্ত ও তপস্বী বলিয়া সম্মান করে, সেই নিমিত্ত উৎসবের দিনে, দক্ষিণেশ্বরে লোক-সমাগমের পূর্ব্বেই, তিনি গেরুয়া পরিধান ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া পঞ্চবটীতে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া একতারা যোগে প্রণব মন্ত্র (ওঁকার) গান করিতেন। আবার উৎসবান্তে মহিমাচরণ আপন বাঘছালটি পরমহংসদেবের ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত 'ঐ বাঘছালটি কাহার' এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "কাশীপুরের মহিম চক্রবর্ত্তী এটা এখানে রেখে গেছে, কেন রেখেছে তা জান? লোক এসে জিজ্ঞাস করবে 'এটি কার'? আর তার নাম শুনে ভাববে,

লোকটা নিশ্চয়ই তপস্বী"। কোন কিছুই শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না, উহা অনায়াসে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া ফেলিত।

মহিমাচরণ নিজ গৃহে অনেক বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ঐ পুস্তকের সব কয়খানা পাঠ করিয়াছেন বলিয়া লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে উহার অনেকগুলিই তাঁহার পড়া ছিল না। পরবর্ত্তী কালে একদিন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীযুক্ত মহিমার বাড়ীতে যাইয়া, কৌতূহল বশতঃ ঐ পুস্তক হইতে কয়েকখানা টানিয়া বাহির করিলে, দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনও অনেকগুলি পুস্তকের পাতাই কাটা হয় নাই।

বাহ্যিক ব্যবহারে মহিমাচরণের অহংসর্ব্বস্ব ভাব দেখা গেলেও, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা ও জ্ঞান লাভের ইচ্ছা নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। সেই নিমিত্ত তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া পরমহংসদেবের নিকট আগমন করিতেন।

বুড়ো গোপাল

(১৮৭৪—৭৫)

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র শূর একজন কাগজ ব্যবসায়ী এবং পাকা বিষয়ী লোক ছিলেন। বরাহনগরের নিকটে সিঁতিতে তাঁহার বাস ছিল। সহসা তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হওয়াতে, তিনি

অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং জনৈক বন্ধুর পরামর্শে হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুই তিন দিবস সেখানে যাতায়াত করিয়াই, গোপাল পরমহংস মহাশয়ের সহানুভূতি ও উপদেশে অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার উপদেশ ও সঙ্গগুণে জগতের অনিত্যতা ও ক্ষণ-স্থায়িত্ব তাঁহার মনোমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তিনি ভগবান্ লাভের উদ্দেশ্যে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগী জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বেই, গোপাল গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব ইঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। ইনিই উত্তর কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'স্বামী অদ্বৈতানন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বুড়ো গোপাল তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবেন জানিতে পারিয়া, একদা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যতক্ষণ আমাদের হৃদয়ে অজ্ঞান থাকে, আমরা ঈশ্বরকে মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থে তীর্থে খুঁজে বেড়াই। আর জ্ঞানের উদয় হলে, আমরা তাঁকে আপন আপন অন্তরেই প্রকাশিত দেখতে পাই। ঈশ্বর যে আমাদের কত নিকটে, অন্তরের বস্তু, তা বুঝতে না পেরেই আমরা এখানে সেখানে ঘুরে মরি। দেখ, দুপুর রাতে একজনের তামাক খেতে ইচ্ছা হল। কি করে টিকে ধরাবে ভাবতে ভাবতে সে পাশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। ঐ বাড়ীর লোক সব ঘুমিয়ে ছিল,

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি, দোর ঠেলাঠেলির পর, একজন উঠে দোর খুলে তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি গো, কি মনে করে' ? অমনি সে বলতে লাগল, 'আর ভায়া, কি মনে করে! জান তো তামাকের নেশা আছে ; টিকে ধরাব মনে করে'। তখন লোকটী বল্লে, 'বা, তুমি তো বেশ লোক ; এত কষ্ট করে এসে দুপুর রাতে দোর ঠেলাঠেলি করছ। তোমার হাতেই যে লণ্ঠন রয়েছে"।

কেশব চন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

(১৮৭৫ প্রারম্ভ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, যখন ভারতীয় যুবকগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত চাক-চিক্য-মোহে দেশীয় রীতিনীতি, এমন কি চিরাচরিত ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত ভোগাসক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে চলিল, দেশের সেই সঙ্কটের দিনে হিন্দু ধর্ম্মের অবান্তর শাখা মহাত্মা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়া, সনাতন ধর্ম্মকে আংশিক ভাবে রক্ষা করে। স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ঐ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার এক ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া, তৎকালে শিক্ষিত যুবক সমাজে তাঁহার বিশেষ আধিপত্য ছিল। বহু শিক্ষিত যুবক, ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যে,

তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। কেশব বাবুর ভগবদ্‌ভক্তি ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা শুনিতে পাইয়া, রামকৃষ্ণের তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। তখন নারায়ণ শাস্ত্রী নামক জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করিতেছিলেন। কেশব বাবু কেমন লোক, তাহা ভাল করিয়া জানিবার জন্য রামকৃষ্ণ প্রথমতঃ নারায়ণ শাস্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। পণ্ডিতজী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলে, রামকৃষ্ণ তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারিলেন, কেশব বাস্তবিকই ভক্তিমান্ ও ভাগ্যবান্ পুরুষ।

শ্রীযুত জয়গোপাল সেন একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই মাইল দূরে, বেলঘরিয়া নামক স্থানে তাঁহার একটী উদ্যানবাটী ছিল। কেশব বাবু কিছুকাল যাবৎ নিজ সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ঐ উদ্যানবাটীতে অবস্থান করিয়া, সাধন ভজন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে, শ্রীরামকৃষ্ণ একদা হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বেলা ৮।৯ টার সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব বাবু তখন কতিপয় ব্রাহ্ম ভক্ত সহ উদ্যানবাটীর বাঁধা ঘাটে, বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। প্রথমতঃ হৃদয় উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট মাতুলের আগমন সংবাদ ও হরিভক্তির কথা নিবেদন করিলেন এবং তৎপর তাঁহার অনুমতি ক্রমে মাতুলকে গাড়ী হইতে নামাইয়া তাঁহাদের সমীপে লইয়া গেলেন। বালক-স্বভাব পরমহংস রামকৃষ্ণের বেশভূষায় মোটেই

আড়ম্বর ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই সামান্য বেশে থাকিতেন। সেদিনও তাঁহার পরিধানে একখানা অতি সাধারণ লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল। আর সম্পূর্ণ দেহ নগ্ন; কেবল ধুতির খুঁটখানা কাঁধে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশব বাবু ও ব্রাহ্ম ভক্তগণ প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া সামান্য লোক বলিয়া ধারণা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বালকের ন্যায় সরলতা-মাখা স্বরে বলিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক? সে কি রকম দর্শন, তাই জানতে এসেছি"। কেশবের সহিত সামান্য কথাবার্ত্তার পর, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া নিজেই ঈশ্বরীয় কথা বলিতে লাগিলেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে "কে জানে মন, কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন", এই গানটী গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দিব্য অঙ্গকান্তি ও ঈষৎ হাস্যরঞ্জিত মুখকমল দর্শন এবং বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, কেশব প্রমুখ সকলেই পুলকিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ স্থির নিস্পন্দ, নয়ন-যুগলে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। অপূর্ব্ব সাধকের এই দিব্য ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এদিকে হৃদয় মাতুলের ভাব ভঙ্গের নিমিত্ত, অনবরত তাঁহার কর্ণে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলকেও ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন। কেশব ও তদীয় সঙ্গিগণ ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও সমাধি হইতে দেখেন নাই; সুতরাং

উহাতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে ভণ্ডামি বলিয়াও মনে করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপমার সাহায্যে, সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, ঈশ্বরের ভাব অনন্ত, কিন্তু লোকে তাঁকে সান্ত করে ফেলে। তাঁকে যে যে ভাবে দেখেছে, সে তাঁকে তাই বলেই মনে করে; কিন্তু ওটা অজ্ঞান। যে ঈশ্বরকে সকল ভাবে দর্শন করেছে, সে-ই তাঁর যথার্থ স্বরূপ জানতে পেরেছে। এক গাছে একটা গিরগিটী থাকত। গিরগিটী বহুরূপী, যখন তখন রং বদলায়। কয়েক জন লোক তাকে দেখেছিল। তাদের মধ্যে যে যেরূপে দেখেছে, সে তাকে সেরূপেই জানে। একদিন গিরগিটীর কথা নিয়ে, তাদের মধ্যে বিষম ঝগড়া বেঁধে গেল। কেউ বলে ওটা লাল, কেউ বা সবুজ, আবার কেউ কেউ হলদে, নীল ইত্যাদি। একজন লোক ঐ গাছ-তলায় বাস করত। তাদের বিবাদ দেখে, সে এসে বল্লে, তোমরা যা বলছ, সবই সত্য। ঐ গিরগিটী কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল, কখন বা হলদে রং ধরে। আবার কখন দেখা যায়, তার কোন রংই নাই; একেবারে নির্গুণ"।

"কয়েক জন অন্ধের ইচ্ছা হয়েছিল, হাতী কেমন জানোয়ার তা জানবে। একদিন তারা একটী হাতীর কাছে গেল, আর হাত বুলিয়ে হাতী কেমন তা' দেখতে লাগল। পরে যখন

তাদের জিজ্ঞেস করা হল, হাতীকে কেমন বুঝলে, তখন তাদের মধ্যে বিষম ঝগড়া। একজন বল্লে, হাতী থামের মত; সে হাতীর পায়ে হাত দিয়েছিল। আর একজন বল্লে, জানোয়ারটা কুলোর মত; হাতীর কাণে তার হাত পড়েছিল। তৃতীয় ব্যক্তি বলতে লাগল, একটা জলের জালার মত; সে হাতীর পেটে হাত বুলিয়েছিল। আরো কত কি? কিছুতেই আর তাদের বিবাদ মেটে না। তখন একজন চক্ষুষ্মান্ লোক তাদের বল্লে, তোমরা কেউই হাতীটাকে ঠিক ঠিক জানতে পার নি, কেউ তার পা, কেউ বা কাণ, আবার কেউ তার পেট্‌টার কথা মাত্র জানতে পেরেছ। তোমরা যা বলছ, তা কতকটা সত্য হলেও পূরোপূরি সত্য নয়। তেমনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এক একটা ভাব বা অংশকে জেনে অল্পজ্ঞেরা ঝগড়ার সৃষ্টি করে। ভগবানের ভাব অনন্ত, তাঁর ভাবের ইতি করা যায় না। যাঁরা তাঁকে পূরোপূরি জানতে পারে, তাঁদের মধ্যে ঝগড়া থাকে না"।

"একটা ডেয়ো পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গেছ্‌ল। এক দানা চিনি খেয়েই তার হেউ-ঢেউ; আর যে খায়, তার শক্তি নাই। সে আর এক দানা মুখে করে চলে এলো। এতেই তুষ্ট; ভাবলে, পরদিন গিয়ে সমস্ত পাহাড়টা নিয়ে আসবে। একটা পিঁপড়ে কি চিনির পাহাড়টা মাপ্‌তে পারে? একটা পিঁপড়ের পক্ষে যেমন আস্ত পাহাড়টার কথা জানা সম্ভব নয়, তেমনি মানুষ ভগবানের অনন্ত ভাব জেনে শেষ করতে পারে না। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আবার তারও পারে"।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের বিরাম নাই, কথারও শেষ নাই। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"ওগো, তোমরা নাকি শক্তি মান না? সে কেমন কথা? ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি যে অভেদ! যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। দুটাকে আলাদা করা যায় না; একটাকে ছেড়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। ব্রহ্মের আনন্দময়ী শক্তিকেই ভক্তেরা যার যেমন ইচ্ছে, 'মা কালী', 'মা দুর্গা' আরও কত কি বলে ডাকছে। যেমন শোলার আতা দেখলে, আসল আতার কথা মনে হয়, তেমনি মাটীর 'মা কালী', 'মা দুর্গার' মূর্ত্তি দেখে তাঁর কথাই মনে পড়ে। এক ঈশ্বর, তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত নাম। যেমন একটা পুকুর, তার অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিঁদুরা, অপর ঘাটে মুসলমান, আবার তৃতীয় ঘাটটীতে খৃষ্টানেরা জল খাচ্ছে। অন্য ঘাটে আর এক দল। একই জল, কিন্তু তারা তাকে বিভিন্ন নামে বলছে,—জল, পানি, ওয়াটার (Water), একুয়া (Aqua)"।

৺জগদম্বা যাঁহার সকল ভার লইয়াছেন, তিনি যাঁহার ভাণ্ডার স্বরূপ, তাঁহার কি আর কথার অভাব! শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অফুরন্ত ভাবে চলিতে লাগিল। এদিকে স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু কেশব প্রভৃতি কাহারও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে পরমহংসের সরল, মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ বাক্যামৃত পান করিয়া উত্তরোত্তর আনন্দে উল্লসিত হইতেছেন। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা

কাল ভগবৎ প্রসঙ্গে কাটিয়া গেল, উপাসনার সময়ও অতিক্রান্ত হইতে চলিল।

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেশব, তোমার ল্যাজ খসেছে"। এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কেশব ও তাঁহার অনুচরগণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। উহা লক্ষ্য করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কথাটীর প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, যতদিন বেঙ্গাচীর ল্যাজ থাকে, তত দিন সে জলেই বাস করে, ডাঙ্গায় যেতে পারে না। আর ল্যাজ খসে গেলে, সে যেমন ইচ্ছা, জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙ্গায়ও যেতে পারে। তেমনি যতদিন মানুষের অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলে বাস করে। কিন্তু অবিদ্যার ল্যাজ খসে গেলে, সে সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে। এই সামান্য কথাটীর গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এবার কেশব প্রমুখ সকলেই আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিনকার মত প্রসঙ্গ শেষ করিয়া বিদায় লইলেন। কয়েক ঘণ্টার কথাবার্ত্তায়ই কেশব বাবু তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। কিন্তু একবার মাত্র আলাপ আলোচনায়, একটা লোকের চরিত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা চলে না। তাই কেশব বাবু রামকৃষ্ণের অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবার জন্য, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন প্রমুখ তাঁহার বিশেষ অনুগত তিন জন ব্রাহ্ম ভক্তকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে

পাঠাইলেন। তাঁহারা তিন দিন কালীবাটীতে বাস এবং রামকৃষ্ণের চাল চলন ও ভাবভক্তি পরখ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই রামকৃষ্ণের চরিত্রে একটা অসাধারণ বিশেষত্ব রহিয়াছে। কেশব চন্দ্রের সংশয় নিরসন হইল। এখন হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া পরমহংস মহাশয়কে দর্শন ও তাঁহার উপদেশাবলী নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশব বাবু কয়েকখানা ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। তিনি ঐ সকল পত্রিকায় পরমহংসের কথা ও উপদেশাবলী ছাপাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্রিকা পাঠে, দেশের শিক্ষিত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিল। ফলে, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট সমবেত হইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও ঈশ্বরপ্রেমে, কেশব বাবু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাতে বিশেষ অনুরক্ত হইলেন। প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের পরদিন, তিনি শিষ্য ও ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তন করিয়া ষ্টীমার-যোগে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাজের উপাসনা গৃহে লইয়া যাইতেন। কখন কখন তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় অপার সার্কুলার রোডস্থিত নিজ বাটী 'কমল কুটীরে'ও লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, ব্রাহ্ম কেশব বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া, মূর্ত্তিপূজার অন্তর্নিহিত উচ্চ ভাব ও ভগবানের মাতৃশক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। ক্রমে তাঁহার নিরাকার উপাসনাও কতকটা

সাকারে পরিণত হইল। তিনি সন্তানের ন্যায় মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং স্বপ্রবর্ত্তিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে' .উহার প্রচলন করিয়া, উহাকেই 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' আখ্যা প্রদান করিলেন। এখন হইতে বক্তৃতা-মঞ্চে, সংবাদ পত্রে, উপাসনা-গৃহে, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখে ঈশ্বরের মাতৃভাবটীর কথা শুনা যাইত।

শ্রীযুক্ত কেশব পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়াই 'বিধানের জয়' এই কথাটী বলিতেন। একদা কেশব বাবু সদল-বলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে, অনেকক্ষণ ভগবৎ প্রসঙ্গের পর, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "কেশব, তুমি এত বড় বক্তা, আজ আমাদিগকে কিছু বল, আমরা তোমার বক্তৃতা শুনিব"। তদুত্তরে কেশব বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমি কি শেষটায় কামারের দোকানে সূঁচ বিক্রি করতে যাব। আপনাকে আবার কি ঈশ্বরীয় কথা বলব? আপনি বলুন, আমরা শুনি"। কেশবের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবার জন্য, তিনি পুনরায় বালকের ন্যায় জেদ করিলেন। অগত্যা কেশব বাবু কালীবাটীর চাঁদনীতে যাইয়া অনেকক্ষণ ঈশ্বর-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ উপাসনা কালে, 'তুমি এরূপ নীল আকাশ, এত বিস্তৃত সমুদ্র, এমন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ' ইত্যাদি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ইহা লক্ষ্য করিতেন। একদিন তিনি কেশব বাবুকে বলিলেন, "তোমরা তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা এত করিয়া বল কেন?

তিনি যে আমাদের অত্যন্ত আপনার জন! আপনার জনকে কি কেউ তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা বলে এরকম স্তব-স্তুতি করে? বেশী ঐশ্বর্য্যের আরোপ করলে তিনি যে অনেক দূরে চলে যান"।

দিনের পর দিন কেশব বাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছিল। কেশব বাবু সময়াভাবে অনেকদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারিলে, তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কেশব বাবুর দেহত্যাগ হয়। তাঁহার পরলোক গমনে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কেশব বাবুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন তাঁহার শরীর হইতে একটী অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

(১৮৭৫—৭৬)

কেশব বাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়ের পর, ব্রাহ্ম সমাজের সকলেই তাঁহার কথা জানিতে পারিলেন। তদবধি সমাজের অনেকেই অবসর মত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, কেশব বাবুর বিশেষ অনুগত। তিনি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু একজন প্রসিদ্ধ গায়ক, কেশব বাবুর সমাজে সর্ব্বদাই গান করিতেন এবং নিজেই অনেক গান রচনাও

করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার গান শুনিতে শুনিতে, তিনি অনেক সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন এবং প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন। রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেই ত্রৈলোক্য বাবু ভগবদ্‌ভাবে উল্লসিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, যতক্ষণ এখানে থাকি, বেশ আনন্দে থাকি; আবার এখান থেকে চলে গেলে, সে আনন্দ আর থাকে না"।

ত্রৈলোক্য বাবু মনে করিতেন, সংসারে আসক্ত থাকিয়াও পূর্ণমাত্রায় ধর্ম্ম সাধন করা যাইতে পারে। একদা তিনি অন্যান্য কয়েক জন ভক্তের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের আস্বাদ পেলে, আর সংসারে আঁট থাকে না; সংসার আলুনি বোধ হয়"। অমনি ত্রৈলোক্য বাবু বলিয়া উঠিলেন, এ-তো সন্ন্যাসীর কথা, আর গৃহীর পক্ষে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি এসব কি বল্‌ছ? যারা সংসারে থেকে ধর্ম্ম করতে চায়, তারা যদি একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায়, তাদের কাছে সংসার আর ভাল লাগে না। কাজের আঁট একেবারে কমে যায়। ক্রমে তারা ভগবানের ভাবে ডুবে যায়। তাদের কাছে ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। তারা ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র কিছুতেই সুখ পায় না। যোগ-ভোগ কি এক সঙ্গে হয়? তবে জ্ঞান লাভের পর সংসারে থাকা যেতে পারে। তাতে ক্ষতি হয় না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৭৫—৭৬)

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে, কেশব চন্দ্র ধর্ম্মানুশীলনে বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তৎপর অল্পকাল মধ্যেই, তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া, বলিতে গেলে, ঐ সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষি ও অন্যান্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মগণের সহিত মতান্তর হওয়ায়, তিনি আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামক দলের সৃষ্টি করেন। আবার স্বপ্রবর্ত্তিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিজ অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকে কোচবিহারের মহারাজের সহিত বিবাহ দেওয়ার ফলে, তাঁহার দলের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অধিকাংশ ব্রাহ্ম সভ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামক আর একটী নূতন দল গঠিত করেন।

বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে কেশব বাবুর পরম হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। কিন্তু পরে, তাঁহারই 'বিশেষ উদ্যোগে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠিত হইল। বিজয় নদীয়া-শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ

ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায়, ধর্ম্ম-পিপাসু বিজয় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিলেন। আর্থিক অভাব-অনটন হেতু, তিনি অনেক কাল 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' বেতন-ভোগী প্রচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন, তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরমহংসের উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও সঙ্গগুণে, বিজয় অল্পকাল মধ্যেই ঈশ্বরের সাকার ভাব সমূহে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, পুনরায় হিন্দুভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং তিনি ঈশ্বর-দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিজয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমাজের অন্যান্য নেতা ও সভ্যগণ তাঁহাকে দ্বেষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এই কারণে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম-চিন্তায় রত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যে অবস্থায় পৌঁছালে, আর জন্ম নিয়ে সংসারে ফিরে আসতে হয় না, বিজয় সেই অবস্থার কাছাকাছি চলে গিয়েছে; যেন ঘরে ঢোকাটুকুই শুধু তার বাকী, দোর খুলে দেবার জন্য দ্বারে আঘাত কচ্ছে"। প্রবল ঈশ্বরানুরাগ, কঠোর সংযম ও সাধনার ফলে উত্তরোত্তর নানা দিব্য দর্শন ও যোগ-বিভূতি লাভ করিয়া, শ্রীযুক্ত বিজয় পরবর্ত্তী কালে বঙ্গ ও তদিতর দেশ সমূহে বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিলে পর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' আচার্য্য-পদে বৃত হইলেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের পর, শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে কামকাঞ্চন ত্যাগের অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশার ফলে বিজয়ের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, শিবনাথ তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এই বিষয়ে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, পরমহংসের নিকট বেশী যাতায়াত করিলে, তাঁহাদের সমাজের অন্যান্য সভ্যগণও তথায় গমন করিবে এবং ফলে সমাজের দলটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুকাল শিবনাথের সাক্ষাৎ না পাইলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং কলিকাতায় তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা ছিল, সংসারে লিপ্ত এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনে আসক্ত থাকিয়াও মানব উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভালবাসা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও, তাঁহার কাম-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শটীর কথা তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি, কাঞ্চন-স্পর্শে শরীরের আড়ষ্টতা ইত্যাদিকে শিবনাথ তেমন সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। অবশ্য, তিনি

তাঁহাকে সাধারণ মানব অপেক্ষা উচ্চ স্তরের সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্বীকার ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার ভাব-সমাধিকে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভাবের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তথাপি তিনি উহাকে ভক্তি-প্রসূত ভাবপ্রবণতা এবং কঠোর শারীরিক তপস্যার ফল স্বরূপ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতেন না।

শিবনাথের এই বদ্ধমূল ধারণার কথা জানিতে পারিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "শিবনাথ, তুমি নাকি বল, আমার এসব ভাব-সমাধি শরীরের বিকার; আর আমি ভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ি? তুমি দিন-রাত বিষয়-চিন্তা করেও মনে কর, তোমার মাথা বেশ সুস্থ আছে। আর আমি কিনা, দিবারাত্র চৈতন্য-স্বরূপ ভগবানের ধ্যান করে বেহেড হয়ে গেলাম!"

কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ত্যাগপূত উক্তি সমূহের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অথবা সকল অংশ তাঁহাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। এই নিমিত্ত তিনি, সময়ে সময়ে, তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমার যা মনে হয়, বলে গেলুম, তোমরা এর ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও (অর্থাৎ যতটা পার গ্রহণ করো)"।

প্রতাপ বাবুর অভিমত

(১৮৭৫—৭৬)

ইংরাজী-শিক্ষিত ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন আদর্শ লইয়াও দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা অপর একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের * সামান্য দুই চারি স্থানের বঙ্গানুবাদ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা উহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"এই অদ্ভুত পুরুষ দেশকাল-নির্ব্বিশেষে আপনার চতুর্দ্দিকে এক আনন্দময় ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। এখনও আমার মন, সেই দিব্য ভাবধারা মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রাণে এমন এক অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন যে, আমার মন হইতে উহার প্রভাব এখনও দূর হয় নাই। তাঁহার সহিত আমার এমন কি সাদৃশ্য রহিয়াছে? আমি একজন পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন, সভ্য, দেহগণ্ডিবদ্ধ, অর্দ্ধসংশয়বাদী, শিক্ষাভিমানী তার্কিক; আর তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অমার্জ্জিতরুচি, অর্দ্ধ-পৌত্তলিক, অসহায় হিন্দু সাধক।" *** "রামকৃষ্ণ পরমহংস শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা বেদান্তী, কোনটাই নহেন। তথাপি তাঁহাকে এই সব কয়টী অভিধানই দেওয়া চলে। তিনি শিব,

---

*থিইষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক ইংরাজী পত্রিকার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের সংখ্যায় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে উক্ত প্রবন্ধ 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' নামক ইংরাজী পুস্তিকার আকারে কলিকাতা 'উদ্বোধন কার্য্যালয়' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কালী, রাম, কৃষ্ণ, সকলের উপাসনাই করেন, আবার বেদান্তবাদেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি পৌত্তলিক হইয়াও নিরাকার, অদ্বয় অনন্ত ব্রহ্মের চরম ভাব অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধ্যানে তন্ময় থাকেন।" * * * "তিনি বিবাহিত, কিন্তু কখনও স্ত্রীসহবাস করেন নাই। তাঁহার অন্তরের পবিত্রতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব অতি অদ্ভুত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই তাঁহার অতুলনীয় নৈতিক চরিত্রের মূল রহস্য।" * * * "তিনি যেরূপ অনায়াসে ও সহজ ভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রের অতি দুর্ব্বোধ স্থান সমূহেরও অপূর্ব্ব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে কল্পনা করাও অসম্ভব যে, তিনি একজন সাদাসিদা অশিক্ষিত লোক। তাঁহার উক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করিলে, উহারা এক অত্যদ্ভুত জ্ঞানের পুস্তক হইয়া দাঁড়াইত।" * * * "এই মহান্ সাধু-পুরুষ হিন্দুধর্ম্মের গভীরতা ও মাধুর্য্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। ইনি ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছেন। এই সিদ্ধ হিন্দু তপস্বী জগতের অনিত্যতা ও অসারতার সাক্ষ্য-স্বরূপ বিরাজিত। ইঁহার ঐশ্বর্য্যবিহীন জীবনে ভগবান্ ব্যতীত আর কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাই, ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যতীত অপর কোন চিন্তা বা কর্ম্ম নাই। ইনি ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই জানেন না; জানিতে চাহেনও না; ভগবান্ই ইঁহার যথা-সর্ব্বস্ব।" * * * "আমাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ভিন্ন; কিন্তু যতদিন ভগবান্ ইঁহাকে আমাদের মধ্যে রাখেন, আমরা আহ্লাদের সহিত ইঁহার চরণতলে বসিয়া, পবিত্রতা, ত্যাগ, ধর্ম্ম ও গভীর ঈশ্বরপ্রেমের উচ্চ তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা করিব।"

কীর্ত্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ

(১৮৭৬—৭৭)

পাঠক প্রসঙ্গাধীন শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর কণ্ঠ ও ভাবময় সঙ্গীতের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত হইয়াছেন। শ্যামা-সঙ্গীত, শিব-সঙ্গীত ও হরিনাম সংকীর্ত্তনে, তাঁহার মন মুহূর্ত্ত-মধ্যে এক ভাবময় রাজ্যে চলিয়া যাইত। ঐ অবস্থায়, প্রায়ই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সহিত তালে তালে সহজ ও উদ্দাম-মধুর নৃত্য করিতেন এবং ভাবে তাঁহার দেহ মুহুর্মুহুঃ নিস্পন্দ হইতে থাকিত। এই সময়ে যাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিত, তাহারাও জগতের কথা ভুলিয়া, যেন অবশ হইয়া, তাঁহার ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যেমন সুকণ্ঠ ছিলেন, তেমনই ঈশ্বরীয় সঙ্গীত শ্রবণেও তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে রামায়ণগান, চণ্ডীগান, পদাবলী-কীর্ত্তনাদি লাগিয়াই থাকিত। আবার কলিকাতায় কোনও ভক্তের বাড়ীতে গান-কীর্ত্তনাদি হইলেও, তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে যাইতেন। এক সময়ে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর পাণিহাটীর মহোৎসবেও যাইতেন। কীর্ত্তন শুনিয়া, তাঁহার ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হইতেন। আবার কখন কখন ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তিনি সহসা আসন ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন এবং নিজে কীর্ত্তনে মাতিয়া অপরকেও মাতাইয়া তুলিতেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থে, আমরা তাঁহার কীর্ত্তনানন্দে পরম উল্লাসের বহু হৃদয়গ্রাহী ভাষা-চিত্র দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর, একবার শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করেন। এই সময়ে, ভাগিনেয় হৃদয়রামও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কামারপুকুরের পথে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে হৃদয়ের বাড়ী সিহোড়ে কয়েক দিন অবস্থান করেন। পরমহংসদেবের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, সিহোড়ের চারিপার্শ্বের গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনেরও ধূম পড়িয়া গেল। সিহোড় হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে, বেল্‌টে, ফুলুই-শ্যামবাজার প্রভৃতি গ্রামে, অসংখ্য বৈষ্ণবের বাস। বেল্‌টে গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী বেশ ভক্তিমান্ লোক ছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া, বেল্‌টে গ্রামে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ও কীর্ত্তনানন্দে এক সপ্তাহ কাল কাটাইয়া আসেন। এই কালে ফুলুই-শ্যামবাজার গ্রামের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মল্লিকের বিশেষ আগ্রহে, পরমহংসদেব তাঁহার বাড়ীতে চব্বিশ-প্রহরী নাম-সংকীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের আরম্ভেই, শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে যোগদান করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণও পরম উল্লাসে মত্ত হইয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের

উপস্থিতিতে, অল্প সময়েই কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল। কেহ ভাবে গান গাহিতে লাগিল, কেহ কাঁদিয়া আকুল হইল, কাহারও মুখে অবিরাম হাসির ফোয়ারা ছুটিল, কেহ উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা ভাবে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল ; সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !

এদিকে রামকৃষ্ণের সমাধির কথা রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত হইয়া, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পডিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, কীর্ত্তনে এমন একজন ভক্ত আসিয়াছে, যে দিনে সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে। এই জনরব চতুর্দ্দিকের গ্রাম সমূহে এক অদ্ভুত উত্তেজনার স্মৃষ্টি করিল। ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র, যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, সকলেই শ্যামবাজারের দিকে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে, পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসিয়া, পরমহংসদেবকে ঘেরিয়া ফেলিল। নিকটবর্ত্তী ও দূরের গ্রাম সমূহ হইতে বহু কীর্ত্তনের দল আসিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্যে পরমহংসদেবকে দেখিতে না পাইয়া, অসংখ্য লোক ঘরের চালে এবং বাড়ীর দেয়াল ও গাছের উপরে উঠিল। একদিনের মধ্যেই শ্যামবাজার এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইল।

এদিকে দিবারাত্র কীর্ত্তন চলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে কীর্ত্তনের দলে যোগদান করেন, তখন সেখানেই কীর্ত্তন খুব জমিয়া যায়। তাঁহার আহার-নিদ্রারও এক প্রকার অবসর নাই। শুধু, হৃদয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে জোর করিয়া, ভিড়ের মধ্য হইতে

বাহিরে আনিয়া, খোলা মাঠে লইয়া যান এবং তিনি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার অবসর পান। সেখানে যাইয়াও তাঁহার নিস্তার নাই; কীর্ত্তনের দল তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে; এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই, পুনরায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল, কিন্তু কীর্ত্তন থামিল না, আর লোকের ভিড়ও ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, হৃদয় ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, মাতুলকে লইয়া এইরূপে মাতামাতি চলিলে, তিনি নিশ্চিতই অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি তাঁহাকে লইয়া, কৌশলে সিহোড়ে পলাইয়া আসিলেন। ইহার পর, কামারপুকুরে যাইয়া কিছুকাল বাস করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

'কথামৃত'-কার শ্রীম এই ঘটনা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের লিখা হইতে বুঝা যায়, ইহা ১৮৭৬ বা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, ১৮৭৬ বা '৭৭ খৃষ্টাব্দই এই ঘটনার সময়; এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন করিয়াছিলেন। তবে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, তিনি পুনরায় কামারপুকুর ও সিহোড়ে গমন করিয়া থাকিতে পারেন। এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের লিখাটুকু আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "বরানগর আলমবাজার নিবাসী ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ

করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ (ফুলুই শ্যামবাজারের) ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ দিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফুলুই শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।"*

রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র

(১৮৭৯ শেষভাগ)

কেশব সেন পরিচালিত 'সুলভ-সমাচার' পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়া, রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার মাসতুত ভাই মনোমোহন মিত্র, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, এক দিবস রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। তাঁহারা দ্বারে মৃদু আঘাত করিতেই, তিনি নিজে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ তক্তপোষের নিকটে বসাইয়া, পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমহংসকে জটাবল্কল-ধারী ও ভস্মাবৃত-দেহ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে অপর সাধারণের ন্যায়, অথচ আড়ম্বরহীন অতি সামান্য বেশে দেখিতে পাইয়া, বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, "এ আবার কেমন পরমহংস! এমনটী ত কখনো

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পরিশিষ্ট, ৯ পৃষ্ঠা।

দেখি নাই”। যাহা হউক, অল্পক্ষণ মধ্যেই রামচন্দ্র ও মনোমোহনের ভ্রম দূর হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর আলাপ ও অমায়িক ব্যবহারে, তাঁহারা উভয়েই মুগ্ধ হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাম ও মনোমোহন বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “একটু দাঁড়াও, মার প্রসাদ খেয়ে যাও”। তিনি তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ও জল আনিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং পরমহংসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। বিদায় কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “আবার এসো, আবার এসো”। অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি পরমহংসের এই অযাচিত স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, রামচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রাণে প্রথম দর্শন দিনেই, এক পরম আত্মীয়তা বোধ জাগাইয়া তুলিল।

রামচন্দ্র ও মনোমোহন উভয়েই চাকুরীজীবী। রামচন্দ্র ডাক্তার; কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁহারা কলিকাতায় সিমুলিয়া বাজারের নিকটে বাস করিতেন। রবিবার ভিন্ন তাঁহাদের অবসর নাই। কাজেই এখন হইতে রাম ও মনোমোহন দুইজনে মিলিয়া, প্রতি রবিবার নিয়মিত-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই, তাঁহাদের চরিত্রে একটা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল এবং ক্রমে পরিবারের লোকেরাও তাঁহাদের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের কথা জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বে সাংসারিক বিষয়ে তাঁহাদের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইত, এখন আর তেমন উৎসাহ

নাই। তাঁহারা অবসর পাইলেই, ভগবদ্‌বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, অথবা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যান। রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সংসার-বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করিয়া, আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভাবিত হইলেন এবং সুযোগ পাইলেই, তাঁহাদের দক্ষিণেশ্বর গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে, যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণও ততই বাড়িয়া চলিল। কাহার বাধা কে মানে? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের মনপ্রাণ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিলেন। ফলে, তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া, ভগবান্ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

একদা রামচন্দ্র ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ভগবান্ কি সত্য সত্যই আছেন? না, ইহা কেবল কথার কথা মাত্র"। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "নিশ্চিত আছেন, এতে কোনই সংশয় নাই। দিনের বেলা আকাশে তারা দেখা যায় না। তাই বলে কি আকাশে তারা নাই, একথা বলতে পার? যেমন দুধের মধ্যে মাখন আছে, কিন্তু দুধকে মথন না করলে মাখন পাওয়া যায় না, তেমনি কেবলমাত্র ইচ্ছা করলেই ভগবানের দর্শন লাভ হয় না। তাঁতে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয়। যাঁর গড়া দুনিয়া এত সুন্দর, তিনি কি কেবল কথার-কথা হতে পারেন? বিশ্বাস ও ভক্তিভরে একমনে ডাকলে, তবে তাঁকে দর্শন করা যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, রামচন্দ্র অনন্যমনে ভগবান্‌কে ডাকিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও কন্যাদি বিদ্যমানে, এইরূপে এককালে সংসার-ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে না বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। অনন্তর, বিষয়-বৈরাগ্য ও তীব্র ব্যাকুলতার ফলে, রামচন্দ্র গৃহে থাকিয়াই অনতিকাল মধ্যে অভীষ্ট বস্তুর দর্শন লাভে ধন্য হইলেন।

১৩০৫ সালের ৪ঠা মাঘ রামচন্দ্রের শরীর-ত্যাগ হয়। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ, কলিকাতা হইতে প্রায় চারি মাইল দূরবর্ত্তী কাঁকুড়গাছিতে, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত 'যোগোদ্যান' নামক মন্দিরবাটীতে অবস্থান করিয়া, ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(১৮৮০ শেষভাগ)

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতার কোন এক ইংরাজ সওদাগরের অধীনে মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন। তিনি রামচন্দ্র এবং মনোমোহনের প্রতিবেশী ও বন্ধু। একদা রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে একজন ভাল সাধু আছেন, পরমহংস। তুমি তাঁকে দেখতে যাবে ?" পাকা ইংরাজী-শিক্ষিত, ধর্ম্মকর্ম্মে উদাসীন সুরেন্দ্রনাথ সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। যাহা হউক, অনেক কথাবার্ত্তার পর, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মে উদাসীন হইলেও, দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি সুরেন্দ্রের অসীম সহানুভূতি ছিল। তিনি তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে সর্ব্বদাই যত্নপর হইতেন। কিন্তু তাঁহার একটা বড় দোষ ছিল। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। আবার অন্তরের পশু-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিয়া, সুরেন্দ্র কিছুকাল যাবৎ প্রাণে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। এমন কি, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে আত্মহত্যার কল্পনাও আসিত।

এক দিবস রাম ও মনোমোহন সুরেন্দ্রকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তগণ সঙ্গে হরিকথা কহিতেছিলেন। ঘরে অনেক লোক; সুরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া, এক পার্শ্বে বসিলেন। পরমহংসের কথাগুলি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছিলেন, বিড়ালছানাকে মা যেখানে রাখে, সে সেখানেই পড়িয়া থাকে, আর মিউ মিউ করিয়া ডাকে। মায়ের উপর তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর। সব অবস্থায়ই তার সেই এক বুলি, 'মা, মা'। তাই মা সকল সময় তাকে দেখে, যত্ন নেয়। আর বাঁদর-ছানাগুলি নিজেরাই তাদের মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। মা যখন এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া চলে, তখন অনেক সময় বাঁদর-ছানা হাত ফস্‌কাইয়া ছুটিয়া পড়িয়া যায়। মা যদি হাতে ধরিয়া লইয়া চলেন, তবে আর ছেলের পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না। যাঁহারা ৺জগদম্বার উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

সুরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "তাইতো, আমিও তো নিজের ভরসায় থাকি। তার জন্য এত দুঃখ পাই। আজ থেকে মায়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করব"।

পরমহংসের দুই চারিটী কথা শুনিয়াই, সুরেন্দ্র প্রাণে বেশ একটা শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের ঘোর অনেকটা কাটিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে রামবাবুকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সাধু যদি বাজে বুজরুকি করেন, তবে কাণ মলে দিয়ে আসব"। কিন্তু ফিরিবার সময়, তিনি পরমহংসকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ইহা লইয়া বন্ধুত্রয়ের মধ্যে ভারি রহস্য চলিল। সুরেন্দ্র বলিলেন, "ভাই, কাণ মল্‌তে এসে, কাণে মলা খেয়ে গেলুম। তিনি যে এমন তা কে জান্‌ত ?"

ইহার পর, সুরেন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি রবিবারেই রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সহিত, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। পরমহংসের উপদেশ ও সঙ্গগুণে, অল্পদিনেই সুরেন্দ্রের স্বভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই, তিনি পুনরায় দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া, পূর্ব্বাভ্যাসে অনুরক্ত হইলেন। ফলে, তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমাকর্ষণ একটুও ভুলিতে পারিলেন না। সর্ব্বদাই তাঁহার কথা মনে পড়ে। সুরেন্দ্রের মন পুনরায় অশান্ত হইয়া উঠিল। কি করিবেন কিছুই স্থির

করিতে না পারিয়া, তিনি এক দিবস সসঙ্কোচে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘরে অনেক লোক; তাই নীরবে যাইয়া একপার্শ্বে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও মনোমোহন প্রমুখাৎ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সুরেন্দ্র পুনরায় মন্দ লোকের সহিত মিশিতেছেন। তাঁহার সলজ্জ ভাব লক্ষ্য করিয়া, তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "লোক যখন যেখানে যায়, যদি সে মায়ের কথা ভাবে, তা'হলে তার মনে কোন খারাপ কাজের চিন্তা আসতে পারে না। দেখ, একটু পুরুষত্ব না থাক্‌লে চলে না। পুরুষত্ব কিনা পুরুষকার, মনুষ্যত্ব। যা ভাল বলে বুঝ্‌ব, যা একবার ধরব, প্রাণ থাক্‌তে ছাড়ব না। করা চাই-ই চাই"।

শ্রীরামকৃষ্ণের সরল উপদেশ মধ্যে আপন সাধন-পন্থার ইঙ্গিত পাইয়া, সুরেন্দ্র আত্মসংশোধনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি আবার ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া, পরমহংস মহাশয়ের উপদেশ ও সাহায্যে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্র বাবুকে 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "ও সুরেশ, তুমি বেশী মদ খেয়ে ঢলাঢলি করবে কেন? তুমি মায়ের ভক্ত; যখনই মদ খাবে, মাকে নিবেদন করে, তাঁর প্রসাদ করে খাবে। আর তারপর, মনের আনন্দে ভজন করবে"। তদবধি সুরেন্দ্র সর্ব্বদাই মাকে মদ নিবেদন করিয়া, স্বয়ং প্রসাদ

গ্রহণ করিতেন এবং তৎপর ভজনানন্দে মগ্ন হইতেন। তখন তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত; মায়ের নামে প্রাণের উল্লাসে, তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত।

সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই পরমহংসদেবকে কলিকাতায় নিজ বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব হরিকথা শ্রবণ ও উৎসবানন্দ উপভোগ করিতেন। দুই একবার তিনি তাঁহাকে কাঁকুড়গাছিতে নিজ বাগান-বাটীতেও লইয়া গিয়াছিলেন। কখন কখন রামচন্দ্র ও মনোমোহনের বাড়ীতেও তাঁহার শুভাগমন হইত। এই উপলক্ষে, কলিকাতার বহুলোক শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন ও পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ পাইত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চাকুরীজীবী; রবিবার ভিন্ন অবসর পাইতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা রবিবার দিন দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইয়া, পরমহংস-দেবের উপদেশ ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। ফলে, ঐ দিবস দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তসমাগমে আনন্দ-মেলা বসিয়া যাইত।

সুরেন্দ্র বাবু, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত, সকল সময়েই অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহ এবং অর্থানুকূল্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যগণ সমবেত হইয়া, দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে সন্ন্যাসী-মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (২৫শে মে, ১৮৯০ খৃঃ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের দেহত্যাগ হয়।

কেদারনাথ চাটার্জ্জি

(১৮৮০ শেষ)

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চাটার্জ্জি সর্ব্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার বাড়ী কাঁচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে; বয়স পঞ্চাশের মত হইবে। কেদার অত্যন্ত প্রেমিক লোক, পরম ভক্ত। তিনি সরকারী আফিসে একাউণ্টেণ্ট-(Accountant)এর কর্ম্ম করিতেন। ঈশ্বরীয় কথা শুনিলেই, তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। কেদার দীর্ঘকাল ঢাকায় ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বদাই আলাপ হইত। আবার নিত্যই বহু ভক্ত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া, হরিকথা শ্রবণ ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। কেদার প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে কর্ত্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কেদারের গোপীভাব। তাই তাঁহাকে দেখিলে, শ্রীরামকৃষ্ণের কখন কখন বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হইত।

আমরা অনেক সময়ে নিজের অন্তরের ভাবই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। ফলে, ভাবের ঘরে চুরি ও ভণ্ডামি করিয়া, নিজের দুঃখের বোঝা বাড়াইয়া থাকি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ

সাধন-প্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে, যথাযথভাবে নিজের ও অপরের অন্তরের কথা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন এবং যাহাকে যে ভাবে প্রয়োজন উপদেশ দানে, তাহার উপযুক্ত পথে ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেন। আবার জগজ্জননীর হাতের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন বলিয়া, মা ভাবাবেশে তাঁহার মুখে যখন যাহা প্রয়োজন বলাইয়া লইতেন। ভক্তিমান্ কেদার অতি উন্নত-চরিত্র হইলেও, তাঁহার মন কিয়ৎপরিমাণে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ছিল। তাঁহাকে নিজ মনের অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, "কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে, মুখে বল্‌লে কি হবে যে, আমার এতে মন নাই? এগিয়ে পড়, চন্দন কাঠের পর আরও আছে; রূপার খনি—সোণার খনি—হীরে মাণিক! একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে, মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে"।

লাটু

(১৮৮০ শেষ—১৮৮১ প্রারম্ভ)

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশব সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাম ও মনোমোহন, তৎপর সুরেন্দ্র, কেদার প্রভৃতি গৃহী ভক্ত তাঁহার সহিত মিলিত হন। ক্রমে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে, তাঁহার আবাল্য ব্রহ্মচারী ত্যাগী যুবকগণ একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছাপরা জিলা নিবাসী লাটু বা রাখ্‌তুরাম নামক একটী দরিদ্র বালক, চাকুরীর উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া, শ্রীযুত রামচন্দ্রের বাড়ীতে কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বালক হইলেও, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি লাটুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। অল্প কয়েক দিন রামবাবুর বাড়ীতে বাস করিয়াই, সে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা জানিতে পারিল এবং তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইল। এক দিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, বালক দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, কলিকাতার অপরিচিত রাস্তা সমূহ অতিক্রম করিয়া, বহুকষ্টে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইল এবং দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে গমন করিল। পরমহংসদেব তখন ঘরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। পশ্চিম-দেশীয় বালক লাটু ইতিপূর্ব্বে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে জটা, তিলক, গেরুয়াধারী বলিয়াই জানে। শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশ-ভূষাতে অপর সাধারণের ন্যায় লক্ষ্য করিয়াও, সে কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে নিকটে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লাটু আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, তথাপি ইনিই সেই পরমহংস কিনা, এই বিষয়ে তাঁহার সংশয় রহিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, সে সিমুলিয়ার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী হইতে আসিতেছে। তিনি বালককে সাদরে নিজ গৃহ মধ্যে বসাইয়া, শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। তৎপর তিনি তাহার সহিত আলাপে

রত হইলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়াই, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে আপনার করিয়া লইলেন এবং লাটুও বুঝিতে পারিল, যাঁহার কথা সে শুনিয়াছিল,—ইনিই সেই পরমহংস। বিকাল বেলা বালক কলিকাতা ফিরিতে উদ্যত হইলে, পরমহংসদেব তাহাকে বলিলেন, "আর হেঁটে যেও না; এবার তুমি নৌকা বা গাড়ী করে যাও। আমি পয়সা দিচ্ছি"। লাটু বলিল, "না মহাশয়, আমার কাছেই পয়সা আছে"। শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঠিক আছে তো?" লাটু অমনি পকেট নাড়িল এবং ঝন্ ঝন্ করিয়া পয়সার শব্দ হইল। অনন্তর, বালক সেদিনকার মত বিদায় লইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাবধি লাটুর মন অনুক্ষণ দক্ষিণেশ্বরেই পড়িয়া থাকে। তজ্জন্য দুই তিন দিবস পরেই, সে পুনরায় তথায় গমন করিল। সকাল বেলা রওনা হওয়ায়, তাহার সেখানে পৌঁছিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। লাটুকে দেখিয়া, তিনি আনন্দিত হইলেন। তাহার জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে আহার করে নাই জানিতে পারিয়া, তিনি তাহাকে বলিলেন, "তা বেশ, ভালই হয়েছে; এখানে প্রসাদ পাও"। অতঃপর তাহার জন্য আরও একখানা পাতা ও জল লইয়া, তাহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। লাটু বিহারী বালক, বাঙ্গালীর পক্ক অন্ন গ্রহণ করে না; স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করে। তাই সে বলিল, "মহাশয়, আপনি এত কষ্ট

করিতেছেন কেন? আমি খাব না"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "তা কি হয়! তোমার খেতেই হবে। গঙ্গাজলে রান্না, তার ওপর আবার মায়ের প্রসাদ। এতে কোন দোষ হবে না। বস, প্রসাদ খাও"। ওখানে আহার করিতে লাটুর কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যদি আপনার প্রসাদ হয়, তবে খাব"। শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পমাত্র প্রসাদ মুখে দিয়া, আপনার পাতা হইতে কিছুটা ভাত ও ডাল-তরকারী লাটুকে প্রদান করিলেন এবং লুচি-মিষ্টান্নাদি যোগে তাহাকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তৎপর কয়েক ঘণ্টা কাল শ্রীরামকৃষ্ণের সহবাসে আনন্দে অতিবাহিত করিয়া, লাটু কলিকাতায় ফিরিল।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অনেক সময়েই, লাটুর সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ফল ও মিষ্টান্ন প্রেরণ করিতেন। পক্ষান্তরে, লাটুও দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সুযোগ পাইলে, বিশেষ আনন্দিত হইত এবং কখন কখন দুই এক দিবস সেখানে বাসও করিত। ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। লাটু মাতাপিতৃহীন বালক; বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন অন্য কেহই ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিলেন।

একদা রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "রাম, লাটু ছেলেটী বড় শুদ্ধ-সত্ত্ব; আমার কাছে থাক্‌তে ভালবাসে। ওকে এখানে রেখে দাও"। রাম

তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মত হইয়া, বালকের সৌভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তদবধি লাটু দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া, একান্ত নিষ্ঠার সহিত অবিরাম জপধ্যান ও পরমহংসদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। অনেক সময়েই তিনি ইষ্টচিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। বালক সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু নিজ সাধন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাগুণে অনেকানেক দিব্য দর্শন ও ভাবাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের চিরকুমার ত্যাগী শিষ্যগণের মধ্যে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নিকট আগমন করেন। ইঁহার অদ্ভুত ত্যাগ-তপস্যা ও আধ্যাত্মিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়াই, স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে ‘স্বামী অদ্ভুতানন্দ’ নামে ভূষিত করিয়াছিলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের শেষ জীবন ৺কাশীধামে অতিবাহিত হইয়াছিল। অহর্নিশ ধ্যানধারণার ফলে, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পাইলেও, তিনি ঐকালে দিবারাত্র ধ্যান-ধারণা লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। আহার-নিদ্রার প্রতি কোন কালেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অনেক সময়ে তিনি একমুষ্টি ছোলা খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেন। এই নিমিত্ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ জীর্ণ হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার পায়ে একটা ঘা হয় এবং উহাতেই তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল (১১ বৈশাখ, ১৩২৭ সাল) ৺কাশীধামে শরীর ত্যাগ করেন। আধ্যাত্মিক জগতে অনুভূতির স্থান সর্ব্বোচ্চে। স্বামী অদ্ভুতানন্দের আক্ষরিক বিদ্যা না থাকিলেও, তিনি লোককে

সরল ভাষায় নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিমূলক সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী 'সৎকথা' নামক পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাখাল চন্দ্র ঘোষ

(১৮৮১ প্রারম্ভ)

একদিন রামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন, ৺জগদম্বা একটী বালককে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 'এই লও, এইটী তোমার পুত্র'। তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি! আমার আবার ছেলে?' তখন ৺জগন্মাতা ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, 'সাধারণ ছেলে নয়, ত্যাগী ছেলে, মানসপুত্র'। ইহার কিছুকাল পরে, রাখাল চন্দ্র ঘোষ নামক একটী অল্পবয়স্ক যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করেন। ইহাকে দেখিয়াই রামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বালক, জগজ্জননী-দত্ত মানসপুত্র।

রাখাল তখন সবে মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন ঘোষ চব্বিশ পরগণার বসিরহাটে, সিকরা গ্রামের সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। ধনাঢ্য পিতা এই তরুণ বয়সেই পুত্রকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাখাল বিবাহ করিয়াও, সংসারে লিপ্ত হইলেন না। তাঁহার স্বভাবটী কচি ছেলের মত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেই, তিনি তিন চারি বৎসরের বালকের ন্যায়

হইয়া যাইতেন এবং কখন কখন তাঁহার কোলে-কাঁধে চড়িয়া নানাভাবে খেলাধূলা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে মাতার ন্যায় বাৎসল্যভরে ক্ষীর-সর-ননী ভোজন করাইতেন। আবার প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহাকে শাসন করিতেও ছাড়িতেন না। রাখালের শিশু-বালকবৎ আচরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেম-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া, উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইত।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট পুত্রের যাতায়াতের কথা জানিতে পারিয়া, রাখালের পিতা প্রথমতঃ তাহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিজে সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক পরমহংসের নিকট গমন করেন, তখন ঐ বিষয়ে তাঁহার কোনই আপত্তি রহিল না।

রাখালের স্ত্রী অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন এবং কখনও স্বামীর ধর্ম্মাচরণে বাধা প্রদান করেন নাই। বস্তুতঃ যে বিবাহ-সূত্র সাধারণতঃ লোকের সংসার-বন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয়, তাহাই রাখালের সকল বন্ধন মোচনের কারণ হইয়াছিল। তিনি সিমু-লিয়ার মনোমোহন মিত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু যে সর্ব্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার একান্ত অনুগত ছিলেন, এই কথা পাঠকের জানা আছে। আবার পরমহংসদেব নিমন্ত্রিত হইয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন। প্রথম দিবস শ্রীযুক্ত মনোমোহনই ভগ্নীপতি রাখালকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখালচন্দ্রের একটি পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীপুত্রের মমতা, পার্থিব সুখভোগ অথবা পিতার ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন।

রাখাল বিবাহিত ছিলেন বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী জীবন যাপন সম্বন্ধে প্রথমে একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই যখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। অনুক্ষণ ঈশ্বরচিন্তার ফলে রাখালচন্দ্রের এরূপ তন্ময়তা আসিয়াছিল যে, অনেক সময়ে পরমহংসদেবকেই তাঁহার আহার বিহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। তিনি বালককে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কয়েক দিবস তাঁহার দর্শন না পাইলেই, অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। এমন কি তাঁহার অদর্শনে, তিনি সময়ে সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। উত্তর কালে শ্রীযুক্ত রাখালই 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চাল-চলন রাজার ন্যায় ছিল বলিয়া, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে রাজা-মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সকলের মধ্যেই তাঁহার অন্তর্মুখী ভাব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কৌতুক-পরায়ণতা অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্রে উহা বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জ্বালামুখী, আবু-

পাহাড় প্রভৃতি স্থানে অনেক কাল তপস্যায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা হরিনাথ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তখন ভিক্ষাবৃত্তি, অনশন, অর্দ্ধাশনে তাঁহাদের দিন কাটিত।

যাঁহারা বহু শুভ সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, পার্থিব ভোগসুখে বিরত থাকিয়া লোককে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রেরিত করাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধ অথবা ঈশ্বর-কোটী নামে অভিহিত করিতেন। আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে, তিনি বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) প্রমুখ ছয় জনকে মাত্র এই শ্রেণীর মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) ইঁহাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের প্রশংসা করিয়া, এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়"। হাস্য-কৌতুকের সময়েও, ভক্ত ও দর্শকগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তর্মুখী ভাব লক্ষ্য করিতেন। তিনি লোক বুঝিয়া, যাহাকে যেমন প্রয়োজন, ঠিক সেইরূপ উপদেশ দিতে সুনিপুণ ছিলেন। পাপী, তাপী, অসহায়, ছোটবড় সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তাঁহাকে অতি আপনার জন বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি ও তপস্যা-প্রিয় লোক ছিলেন, অথচ তাঁহার ন্যায় হাস্যকৌতুক-পরায়ণ রসিক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য শিষ্য, মানসপুত্র রাখাল, কঠোর সাধনা করিয়া, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে বহু দিব্য দর্শন ও ব্রহ্মানুভূতির আস্বাদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি বিজন ভুবনেশ্বর-বনানীর পার্শ্বে যতিজনের তপস্যার অনুকূল এক বৃহৎ মঠ স্থাপন করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমাধিযোগে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার শিক্ষা, উপদেশ ও পদাশ্রয়ে বহু নরনারী শান্তি ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

হৃদয়রামের শেষকথা

(১৮৮১ জুন)

লোক-চরিত্রে বিপরীত ভাব সমূহের সমাবেশ, একাধারে ও এককালে পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিলে, কর্ম্মের গতি ও সংস্কার-প্রভাবের জটিলতার কথা স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয় এবং আমরা গীতায় উক্ত 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ' কথাটির অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আজীবন মাতুলের ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ এবং সেবা করা সত্ত্বেও, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়রামের চরিত্রে কোন কালেই ত্যাগের ভাবটী ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। কর্ম্মপাশ তাঁহাকে ওষ্ঠেপৃষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার অন্তরে বিষয়-বুদ্ধিটিই প্রবল রহিল। দিনের পর দিন,

যতই পরমহংসদেবের ভাবভক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ততই লোক-সমাগম বাড়িতে লাগিল। যাহারা পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিত, হৃদয় তাহাদের নিকট হইতে প্রায়ই কৌশলে টাকাকড়ি এবং এটা-সেটা আদায় করিতেন। পরমহংসদেব নিজে টাকাকড়ি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, হৃদয়রাম যে ঐরূপ করিতেন, তাহাও তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তজ্জন্য সময়ে সময়ে মাতুলের সহিত হৃদয়ের মনোমালিন্য উপস্থিত হইত এবং তিনি মাতুলকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করিতেও ছাড়িতেন না। ক্রমশঃ হৃদয়ের উদ্ধত ব্যবহার এত বাড়িয়া চলিল যে উহা পরমহংস-দেবের অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বালক-স্বভাব পরমহংসদেব একদিন ৺জগন্মাতাকে বলিলেন, "মা, আমার সকল সংসার-বন্ধন দূর করে দিয়ে, এ আবার কোন্ যন্ত্রণায় ফেলেছিস্ ?"

স্নানযাত্রার দিবস দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণে প্রতি বৎসর ঐ দিবস কালীবাটীতে সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঐ উৎসব দিবস সমাগত হইলে, মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ও পূজাপাঠে কালীবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। রাণী রাসমণির দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত মথুরের মধ্যম পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ সেই দিন পুত্রকন্যাগণ সহ কালীবাটীতে আসিয়াছিলেন। হৃদয় যখন কালীমন্দিরে পূজায় বসিয়াছেন, সেই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা সেখানে উপস্থিত হইলে, মেয়েটিকে দেখিয়া

হৃদয়ের অন্তরে কি একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্র দ্বারা উহার চরণযুগল পূজা করিলেন। ক্রমে বালিকার পিতামাতা এই কথা জানিতে পারিলেন। শূদ্রা কুমারীর পক্ষে ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ নিশ্চিত অকল্যাণ-জনক বিবেচনা করিয়া, ত্রৈলোক্যনাথ কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্রোধান্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে কালীবাটীর কার্য্য হইতে অবসর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সময়েই হৃদয়ের সেবার প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "হৃদু না থাকলে কি আর এতকাল এ শরীর থাকতো? ওর সেবাতেই শরীরটা এখনো রয়েছে"। এবংবিধ সেবার দ্বারা হৃদয় চিরকালের জন্য তাঁহার স্নেহ ও কৃপার অধিকারী হইয়াছিলেন। মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়া, তিনি কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগান-বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পরমহংসদেব হৃদয়ের জন্য প্রত্যহ যদু মল্লিকের বাগান-বাটীতে আহার্য্য অন্নাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয়রামের শেষ-কালটা বড় কষ্টে কাটিয়াছিল। ঐকালে তিনি মাতুলের দেব-সঙ্গে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, উদরান্ন সংস্থানের নিমিত্ত তাঁহাকে কাপড় ফিরি করিয়া বেড়াইতে হইত।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮১ নবেম্বর)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ উত্তর কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ আজন্ম ধর্ম্মপিপাসু, আবার বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সদ্‌গুণরাজির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, শৈশবেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ কালেই তিনি দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার মনে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বত্যাগ ও মুনি-ঋষিদিগের ন্যায় নিস্পৃহ জীবন যাপনের পরিকল্পনা আসিত। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, সংযম ও দয়া অতুলনীয়। ভিক্ষুক ফকির, বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার নিকট অভাব জানাইলে, তিনি বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে উত্তম বস্ত্রাদি যাহা সম্মুখে পাইতেন, তাহাই বিলাইয়া দিতেন।

যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথের জ্ঞান-পিপাসা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ভাল ওস্তাদের নিকট নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। কলেজে প্রবেশ করিয়া, তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি অনবরত পাঠও

আলোচনা করিতে লাগিলেন। জগতের অন্তরালে অবস্থিত সত্বার অনুসন্ধান, নরেন্দ্রনাথের জন্মগত অধিকার। বাল্যকাল হইতে এই পর্য্যন্ত, নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস কোন কালেই তাঁহার বাদ যায় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা ও প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মতামত, তাঁহার মনে সংশয়ের স্থষ্টি করিল এবং তিনি কতকটা নাস্তিক মত পোষণ করিতে লাগিলেন। তথাপি নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও উচ্চ আদর্শ, কখনও তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায় নাই।

কিছুদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তিনি কালপ্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। ঐ কালের শিক্ষিত দশজনের ন্যায়, নরেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই কেশব বাবুর গভীর ধর্ম্মভাব ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া, সাকার উপাসনা ও মূর্ত্তিপূজা কুসংস্কার জ্ঞানে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে' যোগদান করিলেন। কিন্তু তাহাতে নরেন্দ্রনাথের পিপাসা মিটিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ধ্যান-ধারণায় দিন কাটাইতেন এবং শিক্ষিত সমাজে ধার্ম্মিক ও উচ্চস্তরের সাধক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই নিমিত্ত নরেন্দ্র মহর্ষির উপদেশানুসারে নিত্য নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইকালে তিনি পাড়ছাড়া সাদা ধুতি পরিতেন, নিরামিষ ভোজন এবং ভূশয্যায় শয়ন করিতেন। মহর্ষির উপদিষ্ট ধ্যানাভ্যাস দ্বারাও নরেন্দ্রনাথ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরের অশান্তি দিন দিন

বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে তিনি ধ্যানকালে নিত্যই জ্যোতির দর্শন পাইতেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল না। ঈশ্বর-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন, "যিনি নিজে ঈশ্বরের দর্শন পান নাই, তিনি কি করিয়া অপরকে তাঁহার সন্ধান দিতে পারিবেন? এমন লোকের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা বৃথা!" তাই নরেন্দ্রনাথ আবার এক দিবস মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন?" দেবেন্দ্রনাথ সহসা নরেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কেবলমাত্র এই কথা কয়টি বলিলেন, "বৎস, তোমার চক্ষু দুইটী ঠিক যোগীর চক্ষুর মত"। মহর্ষির নিকট আপন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, নরেন্দ্রনাথ আরও অশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না? এ কেমন কথা!"

ইতিমধ্যে একদিন পরমহংসদেব ভক্তগণ সহ সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে আসিলে, উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত, সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশী এবং আত্মীয়। নরেন্দ্রনাথ তাঁহারই পুত্র। তাই সুরেন্দ্র ভজন-সঙ্গীত গাহিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। পরমহংসদেব যুবক নরেন্দ্রের আকৃতি, প্রকৃতি ও সঙ্গীতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং রামবাবুও সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ, একদিন একে তোমাদের সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেও"। রামবাবু নরেন্দ্রের আত্মীয়, এবং কিছুকাল তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া

পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মপিপাসার কথাও জানিতেন। তাই একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "নরেন, যদি বাস্তবিকই তোমার মনে ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা থাকে, যদি তুমি ভগবান্‌কে জানিতে চাও, তবে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের নিকট গমন কর। তিনি তোমায় প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভগবানের সন্ধান দিতে পারিবেন"। ইহার কয়েক দিন পর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র গাড়ী করিয়া নরেন্দ্রনাথকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। নরেন্দ্রের দুই তিন জন বন্ধুও ঐ দিবস তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্রকে দেখা অবধি, পরমহংসদেব তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কারণ, প্রথম দর্শনেই তিনি যুবকের অন্তর্মুখী ভাব ও অদ্ভুত চলন-বোলন লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ অতি উচ্চদরের সত্ত্বগুণী আধার এবং অমানুষিক আধ্যাত্মিক শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। সকলকে বসিতে দিয়া, পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে একটি গান গাহিতে বলিলে, তিনি "মন চল নিজ নিকেতনে" ব্রাহ্মসমাজের এই গানটি গাহিয়াছিলেন। গান শেষ হইয়া গেলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে হাতে ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দায় লইয়া গেলেন এবং প্রাণের আবেগে কত কি বলিতে লাগিলেন, যেন নরেন্দ্র তাঁহার কতকালের পরিচিত। পরমহংসদেব বলিলেন, "এতকাল পরে আসতে হয়? আমি যে তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছি। আর কতকাল বিষয়ী

লোকের সঙ্গে কথা কইব ? এদের কথা শুনতে শুনতে আমার কাণ ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে"। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে বারান্দায় রাখিয়া, গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কতকগুলি মাখন, মিশ্রি ও সন্দেশ লইয়া যাইয়া, তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের কথাবার্ত্তা ও আচরণে নরেন্দ্রনাথের মনে হইল, লোকটি নিশ্চয়ই উন্মাদগ্রস্ত। কারণ, উন্মাদ ভিন্ন আর কে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত এইরূপ আচরণ করিতে পারে ? তথাপি নরেন্দ্রের মন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তিনি সঙ্গীত কালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, উন্মাদ হইলেও ইনি যথার্থই ঈশ্বরার্থে সর্ব্বত্যাগী। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি একটা প্রাণের আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস গৃহে ফিরিবার সময়, নরেন্দ্র পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন।

এইরূপে নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সূত্রপাত হইল এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ফলে, ক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। একদিন নরেন্দ্র পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ভগবান্‌কে কি দেখা যায় ? আপনি কি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন ?" ইহার উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "হাঁ, তাঁকে দেখা যায়, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি, যেমন তোমাকে সামনে দেখছি ও

কথা বলছি, ঠিক তেমনি করে। আর যদি কেউ তাঁকে দেখতে চায়, তাকেও দেখাতে পারি। কিন্তু কে আর তাঁকে দেখতে চায়? লোকে সংসার, স্ত্রী, পুত্র এসবের জন্য কেঁদে আকুল হয়। তাঁর জন্য আর ক'জন তেমনি করে কাঁদে? ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে, তিনি দেখা দেন"। পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া, নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে আশা ও পুলকের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যা হোক্, এতদিন পরে অন্ততঃ একজন মানুষ পাওয়া গেল, যিনি ভগবান্‌কে দর্শন করেছেন"। কিন্তু নরেন্দ্রের যুক্তি ও সংশয়বাদী মন, পরীক্ষা না করিয়া কোন কালেই কিছু গ্রহণ করিত না। তিনি পদে পদে পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহার প্রতি নরেন্দ্রের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ যখন পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন করেন, তখন তিনি কলেজে এফ্., এর দ্বিতীয় বর্ষে পড়িতেছেন এবং তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা কখনও তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে দিত না। ফলে, তাঁহার মোটেই অবসর থাকিত না। তিনি ব্যায়াম ও সঙ্গীত চর্চ্চা, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি আলোচনা, কলেজের সভা-সমিতিতে যোগদান এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সুবিধা হইত না। পক্ষান্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুকাল তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলেই, নরেন, নরেন করিয়া পাগল

হইতেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য বার বার খবর পাঠাইতেন। তাঁহাকে না দেখা পর্য্যন্ত, তিনি শান্ত হইতেন না। এমন কি, কখন কখন স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সকলের আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আবার আধ্যাত্মিকতার হানি হইবে বলিয়া, শিষ্যগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও ঐসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিতেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও তেজস্বিতা সম্বন্ধে তিনি এরূপ বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, ঐসকল দ্রব্য তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ভোজন করাইতেন। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে, অনেক সময়ে তিনি ঐ সকল দ্রব্য কাহারও সঙ্গে তাঁহার নিকট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "যা তা খেলেও নরেনের আধ্যাত্মিকতার কোন হানি হবে না"। *

একদিন শ্রীযুক্ত কেশব, বিজয় ও নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সকলে উঠিয়া গেলে পর, তিনি বলিলেন, "যে একটি শক্তি পূর্ণতা লাভ করাতে কেশব জগদ্‌বরেণ্য হয়েছে, নরেনের মধ্যে সেইরূপ আঠারটি শক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পেলাম। কেশব, বিজয় প্রভৃতির অন্তরে

---

* ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।২৯

যেন জ্ঞানের প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বল্‌ছে। কিন্তু জ্ঞান-সূর্য্যের পূর্ণ বিকাশে নরেনের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে”। পরবর্ত্তী কালে পরমহংসদেবের এই কথাটি নরেন্দ্রনাথের কার্য্য-কলাপ দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের বি, এ, পরীক্ষার অল্পকাল পরেই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, সহসা এক রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পরলোক গমন করেন।

কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। যথেস্ট উপার্জ্জন করিলেও, বিশ্বনাথ কখনও অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন না; বরং সর্ব্বদাই তাঁহার কিছু-না-কিছু ঋণ থাকিত। কারণ, তিনি আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণ ও দয়া-দাক্ষিণ্যে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। জগতের যেমন ধারা, এইবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি যাহারা এতকাল তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারাও শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল। অভাব অনটন ও আত্মীয়গণের দুর্ব্ব্যবহারে বসতবাটীখানা পর্য্যন্ত উৎসন্ন হইতে চলিল; নরেন্দ্রনাথ বিষম সংসার-পরীক্ষায় পতিত হইলেন।

তখনও নরেন্দ্রের বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। যে নরেন্দ্রনাথকে ইতিপূর্ব্বে দিনেকের তরেও পরিবারের অভাব অভিযোগের কথা ভাবিতে হয় নাই, তাঁহাকেই সহসা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ভরণ-পোষণের চিন্তায় বিব্রত হইতে হইল। তিনি কোন দিন অনশনে, কোন দিন বা অর্দ্ধাশনে, রৌদ্র-বৃষ্টি

মাথায় করিয়া নগ্নপদে, চাকুরীর আবেদন হস্তে, আফিসে আফিসে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! অদৃষ্টের কি পরিহাস, চাকুরী জুটিল না। এই ঘোর দুর্দ্দিনে নরেন্দ্রের বন্ধুগণের মধ্যেও অনেকেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা নিজ নিজ আমোদ-প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত রহিল। নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কার্য্যকুশলা ছিলেন। তিনি শত অভাব-অভিযোগ এবং দুর্ভাবনার মধ্যেও, নিজ কায়ক্লেশে অতিশয় তৎপরতার সহিত, সকল দিক সামলাইয়া চলিলেন।

ক্রমাগত কয়েক মাস চেষ্টা করিয়াও যখন নরেন্দ্রনাথ অন্ন-চিন্তার সমাধান করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ সংশয়-মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীটা নিশ্চিতই শয়তানের গড়া, কোন মঙ্গল-হস্ত ইহার পশ্চাতে নাই। কিন্তু আস্তিক্যবুদ্ধি জন্ম হইতেই যাঁহার মজ্জাগত, তিনি কি করিয়া উহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবেন? তদুপরি পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, তিনি ইতিপূর্ব্বে দুই চারি দিন যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, উহারাও তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কারণ, অমিতবীর্য্য নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিয়া, তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক মতামত গ্রাহ্য করিবেন না বুঝিতে পারিয়া, এক দিবস পরমহংসদেব নরেন্দ্রের শরীর পদ দ্বারা স্পর্শ করিলে, যুবক কি এক অদ্ভুত ভাবে অভিভূত হইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে কোথায় লয় হইয়া যাইতেছে; তিনি নিজেও যেন উহাতে লীন হইতে চলিয়াছেন।

তাই নরেন্দ্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা রয়েছেন"। আর এক দিবস, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে কিছুতেই নরেন্দ্রকে বিশ্বাস করাইতে না পারিয়া, পরমহংসদেব ভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্র দৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুতে চিন্ময় ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের এই অনুভব কয়েক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

পরমহংসদেবের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে, নরেন্দ্রের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা আরও দুই চারি দিন ঘটিয়াছিল। ফলে, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় আস্তিক্য-বুদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি পরমহংসদেবের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন। কাজেই ঘোর দুরবস্থায় পড়িয়া, ভগবানের সঙ্গে অভিমান করিয়া, বাহিরে কতকটা নাস্তিক মত পোষণ করিলেও, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের অন্তস্তলে আস্তিক্য-বুদ্ধির দৃঢ় ভিত্তি কোন কালেই টলে নাই, একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

এদিকে বন্ধুগণ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতেও ছাড়িল না। এমন কি, পরমহংসদেবের নিকট যাইয়াও তাহারা সময়ে সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রামকৃষ্ণও তাঁহাকে

ভালরূপেই জানিয়াছিলেন। বারেকের তরেও, তিনি নরেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না।

কিছুদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের অন্তরের সংশয়-মেঘ কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের ভাব পাইয়া, প্রথম হইতেই নরেন্দ্র নিরাকারে একান্ত আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের সাকারে বিশ্বাস ও ভাবভক্তি, অনবরত নানা সাকার রূপ দর্শন ও অহরহঃ ৺জগন্মাতার নিকট আত্মনিবেদন লক্ষ্য করিয়া, নরেন্দ্রের মনে সাকারে বিশ্বাসের ক্ষীণ রেখাপাত হইলেও, তিনি এখন পর্য্যন্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। অভাব অনটনের তাড়না একদিন তাঁহার মনে হইল, "রামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কন; মা কালী তাঁহার কথা রক্ষা করেন; আজ তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া, তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের নিকট এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব, যাহাতে পরিবারের (মাতা ও ভ্রাতাদের) অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হয়"। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, ইহার জন্য রামকৃষ্ণকে ধরিয়া বসিলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ্ নরেন, তুই মাকে মানিস না, তাই তোর এত কষ্ট। আমি ত ওসব কথা মাকে কখনো বলি না, তা তুইও জানিস। তবে এক কাজ কর, তুইই আজ সন্ধ্যার পর কালীঘরে যেয়ে, মাকে প্রণাম করে, এই কথা বল। আমি নিশ্চয় করে বলছি, আজ তুই মাকে প্রণাম করে যা চাইবি, মা প্রসন্ন হয়ে তোকে তাই দিবেন"। নরেন্দ্রনাথের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সন্ধ্যারতির পর, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে

বলিলেন, "এইবার কালীঘরে যেয়ে, মাকে তোর প্রার্থনা জানা।" নরেন্দ্রনাথ কালীমন্দিরে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় শুদ্ধসত্ত্ব আধারে ত্যাগ, প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি ছাড়িয়া, মায়ের নিকট অন্নবস্ত্র চাহিবার মত হীনবুদ্ধি কি করিয়া স্থান পাইবে? মন্দিরে যাইতে যাইতেই তাঁহার মন বদলাইয়া গেল; তিনি অন্নবস্ত্রের কথা এককালে ভুলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র মাকে প্রণাম করিয়া, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন এক অদ্ভুত ভাবে আবিষ্ট হইল; তিনি বাহিরের জগৎ ভুলিয়া, মাকে চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। কিছুক্ষণ পর, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলে, রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সকল কথা জানিতে পারিয়া, পুনঃ পুনঃ মোট তিনবার তাঁহাকে কালীমন্দিরে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। মন্দিরে যাইতে না যাইতেই, নরেন্দ্র মায়ের নিকট অন্নবস্ত্র চাহিতে লজ্জা ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন; মায়ের সম্মুখে যাইয়াই তিনি অন্য মানুষ হইয়া যান; মায়ের নিকট কেবল বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। নরেন্দ্র তৃতীয়বার বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে, রামকৃষ্ণ রসিকতা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তা আমি কি করব, বাপু? তুই মাকে এই সামান্য একটী কথাও বলতে পারলি না, তবে তোর দুঃখকষ্ট কি করে দূর হবে? তোর অদৃষ্টে সংসার-সুখ নাই, তার আমি কি করব?" নরেন্দ্র তখন রামকৃষ্ণকে ধরিয়া

বসিলেন, “না মহাশয়, আমার হইয়া, আজ আপনাকে মায়ের নিকট এই কথা বলিতেই হইবে”। নরেন্দ্র সাকারে বিশ্বাসী হইয়াছেন, মা কালীকে মানিয়াছেন দেখিয়া, রামকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আব্দার রক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, “যা, মায়ের ইচ্ছায় কখনো তাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না”। ৺জগন্মাতার কৃপায়, বাস্তবিকই, অতঃপর আর কখনও নরেন্দ্রনাথের মাতা ও ভ্রাতাদিগের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হয় নাই। ক্রমে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতার চাঁপাতলায় একটি নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে মনোনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে চারি মাসের অধিক ঐ চাকুরী করা সম্ভব হইল না।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, পরমহংসদেবকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনয়ন করা হইলে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন এবং শশী, কালী, শরৎ প্রভৃতি যুবকগণকেও, নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরমহংসদেবের দেহত্যাগের সময় পর্য্যন্ত, ক্রমাগত আট নয় মাস কাল অনবরত তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, যুবকগণের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। কিন্তু তাঁহার অদর্শনের পর, নিরাশ্রয় যুবকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। লাটু, তারক প্রমুখ তিন চারি জনের যাইবার স্থান ছিল না। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ

করিয়াই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থানুকূল্যে বরাহনগরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পত্তন হইল।

জ্ঞাতিগণের উৎপীড়ন হইতে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, নরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেন সত্য, কিন্তু বাড়ী থাকিয়াই তিনি পুনরায় যুবক গুরুভ্রাতাদিগের অন্তর বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। ফলে, রাখাল, শশী, কালী, শরৎ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন প্রভৃতি সকলেই, একে একে আসিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করিলেন। নরেন্দ্রও শীঘ্রই গৃহত্যাগ করিয়া মঠে চলিয়া আসিলেন।

তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে, সাধক ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত কতটুকু ব্যাকুল হন, সকল বাধাবিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া, কি ভাবে তাঁহার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পরমহংসদেব 'খানদানি চাষা' সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেন। "একবার দেশ-শুদ্ধ অনাবৃষ্টি হয়েছে। বর্ষাকাল, কিন্তু জলের সঙ্গে দেখা নাই। চাষারা কিন্তু তবু চাষ দিতে ছাড়লে না। সারাদিন মাঠগুলো রোদ্দুরে খা খা করে। ধানের চারাগুলো গজিয়েই শুকিয়ে যেতে লাগল। চাষারা নিরুপায় হয়ে খাল, বিল, নদী থেকে নানাভাবে ক্ষেতে জল আনতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকেই রোজ খানিকটা করে নালা কাটত। কেউ বা তাদের চেয়ে একটু বেশী কাজ করত। একদিন এক চাষার ভারি ভাবনা হল। সে ভাবলে, 'তাইতো, শস্য না হলে, ছেলেপুলে সব উপোষ করে মরবে।

না, তা হতে দিব না'। পরদিন ভোরবেলা, সে কোদাল নিয়ে সকলের আগেই মাঠে হাজির। চাষা কোদাল চালিয়েছে, তার কাজের বিরাম নাই। সারাদিনের রোদ্দুরটা তার মাথার উপর দিয়েই গেল। সারাদিন তার মাথার ঘাম বেয়ে বেয়ে পায়ে পড়েছে; শরীরেই বা কত শুকিয়ে গেছে। চাষার হুঁস নাই, খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে গেছে। গিন্নি এসে তাকে কত করে বল্লে। তারপর মেয়ে এলো; কিন্তু চাষা তাদেরে তাড়িয়ে দিলে। সে বাড়ী এল না। সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময়ে চাষার নালা-কাটা শেষ হয়েছে। নদী থেকে তার ক্ষেতে কুলু কুলু করে জল আসতে লাগল। তাই দেখে চাষার ভারি আনন্দ হল। তারপর বাড়ী গিয়ে, নেয়ে খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাতে লাগল।" নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরু-ভাইরা ঠিক এইরূপ রোক ও ব্যাকুলতার বশবর্ত্তী হইয়া, ঈশ্বরের সাকার, নিরাকারাদি বিভিন্ন ভাব অচিরে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং বরাহনগরের মঠে তাঁহাদের অত্যুগ্র তপস্যা আরম্ভ হইল। *

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, স্বামী বিবেকানন্দ সমাধি অবলম্বন করিয়া, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পরবর্ত্তী জীবনের কথা পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে—'উপসংহারে'—বর্ণিত হইয়াছে।

হরীশ কুণ্ডু ও ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৮১ শেষভাগ)

গড়পারের হরীশ কুণ্ডু ও বরাহনগরের ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রায় সম-সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করেন। উহারা উভয়েই বিবাহিত ছিলেন। হরীশের স্ত্রী-পুত্র বর্ত্তমান আছে। ভবনাথ সবেমাত্র অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন; বরাহনগরেই একটী স্কুলে মাষ্টারি করেন। বিবাহিত হইলেও, হরীশ ও ভবনাথ উভয়েরই বিষয়াসক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কয়েক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াই, হরীশের বিষম সংসার-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। এই কালে হরীশ অধিকাংশ সময়ই পরমহংসদেবের সেবা ও জপধ্যানে অতিবাহিত করিতেন।

হরীশ অতিশয় সরল ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন। এই নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। আবার তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। পরিবারের ভরণ-পোষণ অনায়াসে সঙ্কুলান হইয়া যাইত। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দক্ষিণেশ্বর বাসেও কোনই আপত্তি করিতেন না। তবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে একবার বাড়ী যাইয়া স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া আসিবার কথা বলিতেন। কিন্তু হরীশ কখনও তাহাতে রাজী হইতেন না।

এদিকে হরীশের সতত দক্ষিণেশ্বর বাস, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়বর্গের ভাবনার কারণ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, হরীশ নিশ্চয়ই হঠাৎ এক দিবস সংসার-ত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইবেন। ফলে, আত্মীয়গণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, কখনও তাঁহাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুরোধ, আবার কখনও বা ভৎর্সনা করিতেন। হরীশ তাঁহাদের সকল ভৎর্সনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার স্ত্রী দীর্ঘকাল স্বামীর অদর্শনে উদ্বিগ্না হইয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি বাড়ী যাওয়া দূরের কথা, একটুও বিচলিত হইলেন না; স্থির চিত্তে ইষ্ট-চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়েই ভক্তগণের নিকট হরীশের স্থির-বুদ্ধি এবং শান্ত ও পবিত্র স্বভাবের প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "সেয়ান যারা, জ্যান্তে মরা,—যেমন হরীশ"।

হরীশের শেষ জীবন বড় কষ্টে কাটিয়াছিল। তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এক অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ফলে, হরীশ পাগল হইয়া যান। উন্মাদ অবস্থায়ই তাঁহার শরীর যায়।

ভবনাথ নরেন্দ্রের বন্ধু। কিন্তু নরেন্দ্র সিংহের ন্যায় তেজস্বী, আর ভবনাথ মৃদু-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহাদের বিপরীত স্বভাব লক্ষ্য করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "এদের স্বভাব যেন পুরুষ-প্রকৃতি। নরেন্দ্র পুরুষ, আর ভবনাথ প্রকৃতি। নরেন্দ্রের ন্যায় ভবনাথও যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মসমাজে

যাতায়াত করিতে থাকেন এবং নিরাকারের ধ্যান করিতেই ভালবাসিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পর, ভবনাথ প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কালীবাটীতে রাত্রিবাসও করিতেন। তাঁহার পিতামাতা এবং আত্মীয়গণ তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে বাধা দিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। ভবনাথ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আমিষ আহার এবং তাম্বূলাদি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া, রামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "সে কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হল আসল ত্যাগ"।

ভগবান্ লাভই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আবার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগেই সহজে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ হয়, তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। বাস্তবিক, আহারের সহিত ভগবান্ লাভের তেমন কোন যোগাযোগ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, সময়ে সময়ে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য ভক্তদিগকে বলিতেন, "শূকর-মাংস খেয়েও যদি কারো ঈশ্বরে মন থাকে, তবে সে-ই ধন্য। আর হবিষ্য করেও যার কামিনী-কাঞ্চনে মন যায়, তাকে ধিক্!"

ভবনাথ অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার মন-মুখ এক ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সরলতা ও পবিত্রতার কথা ভক্তগণকে

বলিতেন। একদা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, স্ত্রীর উপর আমার এত টান হয় কেন?" ৺জগদম্বার ভুবনমোহিনী মায়া প্রভাবেই যে স্ত্রীকে জীবন-মরণের সাথী এবং এত আপনার জন বলিয়া বোধ হয়, এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। সংসারের জন্য ভবনাথের অল্প-বিস্তর অর্থচিন্তা করিতে হইত। পাছে তিনি সংসারের ভাবনায় জড়িত হইয়া পড়েন, তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বদা অনাসক্ত জীবন যাপনে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বলিতেন, "সংসারে বীরের মত থাকবি। ঘোম্‌টা দিয়ে কান্নাতে ভুলে যাস নে। আর সব সময় মনটা ভগবানে স্থির রাখ্‌বি। বীরপুরুষ রমণীর সঙ্গে থাকে, অথচ রমণ করে না। স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা বল্‌বি"।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে হরিনাম মাহাত্ম্য আলোচনা হইতেছিল, এমন সময়ে ভবনাথ বলিলেন, "হরিনামে আমার যেন গা খালি হয়"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যিনি পাপ হরণ করেন, ভার হরণ করেন, তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন"।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরেই, ভবনাথ অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন।

তারকনাথ ঘোষাল

(১৮৮১—৮২)

শ্রীযুক্ত তারকের বাড়ী চব্বিশ পরগণার বারাসতে। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষাল আইন-ব্যবসায়ী এবং রাণী রাসমণির আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন। রামকানাই বাবু মা কালীর ভক্ত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে গমন করিতেন। সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিতও তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তৎপ্রদত্ত ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া, পরমহংসদেব চিরকালের জন্য গাত্রদাহ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তারকনাথ ধ্যানপ্রবণ ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ, তিনি যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন এবং কেশব বাবুর পত্রিকা পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানিতে পারেন। পুনরায় দিল্লীতে অবস্থান কালে, জনৈক বন্ধুর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধির কথা শুনিতে পাইয়া, তারক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। তৎপর কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে, একদিন পরমহংসদেব কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাড়ীতে শুভাগমন করিলে, তারক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। কেহ কেহ ১৮৮০ বা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দকে এই ঘটনার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তারকনাথ সর্ব্বদাই ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সাধকগণ কিরূপে সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বাপর অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সমাধি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তারকনাথ দক্ষিণেশ্বরের পথ জানিতেন না। তজ্জন্য তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত পরবর্ত্তী শনিবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের সহিত গঙ্গাতীরে পায়চারি করিতেছিলেন। তারক অগ্রসর হইয়া পরমহংসদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাদের পরিচয় লইলেন এবং তাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তারকের নিকট রাম ও নরেন্দ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম বা নরেন্দ্র কাহারও সহিত তারকের পরিচয় ছিল না। তাঁহাদের প্রতি পরমহংসদেবের প্রীতির ভাব লক্ষ্য করিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, "মহাশয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে তাঁহারা অবশ্যই ভাল থাকিবেন"। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া, নিজ গৃহের বারান্দায় একটী মাতুরের উপর বসিলেন এবং কথা-প্রসঙ্গে তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ?" তারক বলিলেন, 'নিরাকারে'। শ্রীরামকৃষ্ণ—"শক্তিও মান্‌তে হয় তো !"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরের দিকে

অগ্রসর হইলেন। তারক এবং অন্যান্যেরাও তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। মা কালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তারক ব্রাহ্মণ-কুমার হইলেও, ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করেন, নিরাকারে তাঁহার বিশ্বাস। তাই দেবদেবীর মূর্ত্তিকে তিনি ইট-পাথরের চেয়ে বেশী কিছু মনে করিতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণত হইলেও, তিনি দেবীকে প্রণাম করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে হইল, "এমন হীন-বুদ্ধি কেন ? ভগবান্ যদি সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন, তবে এখানেই বা নাই কি করিয়া ?" অমনি তারক মাকে প্রণাম করিলেন।

মন্দির হইতে ফিরিয়া, তারক ও তাঁহার বন্ধু বিদায় লইতে উদ্যত হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তারককে বলিলেন, "একদিন হঠাৎ একবার এলে, তাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না। সর্ব্বদা আসতে হয়। আজ রাত্রি এখানে থেকে যাও"। বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি-বাস করিবেন বলিয়া, তারক পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাই পরমহংসদেবের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও, তাঁহার পক্ষে সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে থাকা সম্ভব হইল না।

পরদিন সন্ধ্যায়, তারক পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। অতঃপর ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে, পরমহংস মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ তারককে একপাশে ডাকিয়া, তাঁহার জিহ্বাগ্রে কি লিখিয়া দিলেন। ফলে, তাঁহার মন মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্তরে প্রবিষ্ট হইল

এবং তিনি সমাধিস্থ হইয়া দিব্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের জীবৎকালে, তারক আরও দুইবার, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে এইরূপ দিব্য আনন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

তারকনাথ কিছুকাল কলিকাতার 'মেকিনন ম্যাকাঞ্জি' আফিসে চাকুরী করিয়াছিলেন। বিবাহিত হইলেও, সংসারের মলিনতা তাঁহাকে কোন কালেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। সর্ব্বদাই তাঁহার উদাস-ভাব ছিল। তিনি সংসারের মায়া চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে আশ্রয় লইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের বর্ত্তমান কালেই তারকের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। সুতরাং তাঁহার যে একটু-মাত্র সংসার-বন্ধনের কারণ ছিল, তাহাও আপনা হইতেই দূর হইল। তারক অনেক সময়েই ঈশ্বর-দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া, পরমহংসদেব একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের জন্য কাঁদলে, চোখের জল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সব পাপ ধুয়ে নিয়ে যায়"। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তারক 'স্বামী শিবানন্দ' নাম ধারণ করেন। বিবাহিত জীবনেও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত কারণে, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দের (বুড়ো গোপাল) পরেই, তিনি বয়সে মঠের সকলের চেয়ে বড়

ছিলেন বলিয়া, গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে 'তারকদা' বলিয়া ডাকিতেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ঐ সময়ে মহাপুরুষজী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, উভয়ে এক সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই, স্বামিজীর অনুরোধে, মহাপুরুষজী সংহলে যাইয়া প্রায় এক বৎসর ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৺কাশী অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করেন। মিশনের সভাপতি পদে বৃত হইবার পর, তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগে ভারতের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণগত-প্রাণ তারক আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বহু সহস্র তৃষিত ও পথহারা পথিককে সংসার-মরুতে ছায়া-শীতল মরূদ্যান ও শান্তিবারির সন্ধান দিয়াছিলেন। সাধু-ভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, মঠের পাচক ব্রাহ্মণ, চাকর, মালী, গোয়ালা, মুটে, মজুর প্রভৃতি ছোটবড় কেহই তাঁহার সহৃদয় কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। জীবনের শেষ তিন বৎসর, তিনি হাঁপানি প্রভৃতি কঠিন রোগে অনবরত ভুগিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি, কখনও তাঁহার মনের স্বভাব-সিদ্ধ প্রফুল্লতার একটুও হানি হইতে দেখা যায় নাই। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর, দ্বাদশ বৎসর রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী, তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন।

নৃত্যগোপাল বসু

(১৮৮১—৮২)

নৃত্যগোপাল বসু নামক একটি তেইশ চব্বিশ বৎসরের অবিবাহিত যুবক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। নৃত্যগোপাল রামচন্দ্র ও মনোমোহনের মাস্‌তুত ভাই; বাড়ী কলিকাতার আহিরীটোলায়। শ্রীযুক্ত রামই প্রথমে তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া আসেন। অনুক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তার ফলে, নৃত্যগোপাল অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব বালকের মত হইয়া গিয়াছিল। ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনে, তিনি মুহূর্ত্ত-মধ্যেই উল্লসিত ও ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন। এই নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কীর্ত্তন কালে, তিনি অনেক সময়ে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন কালের প্রায় মধ্যভাগে, গোবিন্দ পাল ও গোপাল সেন নামক বরাহনগরের দুইটী অল্পবয়স্ক যুবক, তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহাদের উভয়ে পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ বাল্যকালেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। একদিন গোপাল ভাবস্থ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "তোমার এখনো দেরী আছে; আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাক্‌তে পারছি না। তবে এবার যাই"। তিনিও তাঁহাকে ভাবের ঘোরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার আসবে তো?" গোপাল বলিলেন, "আচ্ছা, আবার আসব"। ইহার কয়েক দিন পরেই শুনা

গেল, গোপাল স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "বোধ হয়, গোপালই আবার নৃত্যগোপাল হয়ে জন্মেছে"। শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিলে, নৃত্যগোপাল অনেক সময়েই ভাবস্থ ও নির্ব্বাক হইয়া যাইতেন। এই জন্য পরমহংসদেব কখন কখন ভক্তগণের নিকট যুবকের উচ্চ ভাবের প্রশংসা করিতেন।

জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তিনি প্রৌঢ়া ছিলেন; বয়স একত্রিশ বত্রিশ হইবে। মহিলাটী নৃত্যগোপালের ভাব-তন্ময়তা ও বালক-ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহাকে আদর করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া যাইতেন। এই কথা জানিতে পারিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্যগোপালকে বলিয়াছিলেন, "ওরে, তুই সেখানে বেশী যাস নে। কখনো বা এক আধ বার গেলি। ভক্ত হলই বা। মেয়ে-মানুষ কিনা, তাই সাবধান। সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখতে নাই। জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোকশিক্ষার জন্য ত্যাগীর এসব কর্ত্তে হয়। সন্ন্যাসী জগদ্-গুরু"।

নৃত্যগোপাল কখনও বিবাহ বা সংসার করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে তিনি 'স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, ভবানীপুরের মনোহরপুকুরে মহানির্ব্বাণ-মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা ও আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বহু লোক ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বলরাম বসু

(১৮৮২)

কৃষ্ণরাম বসু দয়া-দাক্ষিণ্য ও দেব-দ্বিজে ভক্তির জন্য তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বসু তাঁহারই পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে তাঁহার নিবাস ছিল। ধনাঢ্য জমিদার গৃহে জন্ম গ্রহণ করায়, কোন কালেই বলরামের অর্থচিন্তা করিতে হয় নাই। বলরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত, বালেশ্বর জিলার কোঠার গ্রামে এবং ৺বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহাদের দেবসেবা ও অন্নসত্র ছিল। বলরাম দিবসের অধিকাংশ সময়, দেবতার সেবাপূজা ও জপতপে অতিবাহিত করিতেন এবং সাধু-সজ্জনের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে ভালবাসিতেন। তজ্জন্য তিনি খুল্লতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত নিমাইচরণের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া, প্রায়ই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। বলরামের পিতাও বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, ধর্ম্ম ও তীর্থবাসে মন দিয়াছিলেন। একবার উড়িষ্যা অঞ্চলে নিজ জমিদারীতে বাসকালে, কেশব বাবুর সংবাদপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সমূহ পাঠ করিয়া, বলরামের মন তাঁহাতে আকৃষ্ট হইল। তিনি স্থির করিলেন, অতঃপর কলিকাতা আসিলে, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া

যাইবেন। রামদয়াল চক্রবর্ত্তী নামক একটী যুবক বলরাম বাবুদের কলিকাতার বাড়ীতে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত রামদয়াল বলরামের পুরোহিত-বংশীয় এবং বন্ধু। তিনি কিছুকাল যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ঈশ্বরানুরাগ ও মধুর হরিকথায় মুগ্ধ হইয়া, রামদয়াল বন্ধু বসুজ মহাশয়কে কলিকাতায় আসিয়া সাধুটীকে দর্শনের নিমিত্ত পত্র দ্বারা আহ্বান করিলেন। ভক্তিমান্ বলরাম পূর্ব্বেই তাঁহাকে দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; বন্ধুর পত্র পাইয়া তাঁহার সংকল্প দৃঢ় হইল। শীঘ্রই এক সুযোগে, তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং কলিকাতা পৌঁছিবার পরদিনই বন্ধুর সহিত রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

সেই দিন কেশব সেন মহাশয় সদল-বলে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। কাজেই সেখানে লোকের ভিড় লাগিয়া গিয়াছিল। বলরাম যাইয়া দেখিলেন, কেশব বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া, নিবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেছেন; আর ঘরে লোক ধরে না। কিছুক্ষণ পরে, কেশব প্রভৃতি সকলে জলযোগের নিমিত্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে গমন করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বসুজ মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার কি কিছু বলবার আছে? বল"। বলরামের প্রথম প্রশ্নই হইল, "মহাশয়, ভগবান্ কি আছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ, তিনি আছেন বই কি"।

বলরাম। তা হলে মানুষ কি তাঁর দর্শন পায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি তাঁকে আপনার ভেবে ডাকে, তবে মানুষ তাঁর দর্শন পায়। এমনি এক আধ বার ডেকে তাঁর দেখা না পেলেই, ভাবতে নেই যে তিনি নাই।

বলরাম। তবে তাঁকে এত করে ডাকি, কিন্তু তিনি দর্শন দেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে খুব আপনার জন ভেবে, ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়। তবে তিনি দেখা দেন। সন্তানের ওপর মায়ের যেমন আপনার-বোধ, তাঁকে কি কখনো তেমনি আপনার বলে তোমার বোধ হয়েছে ? কখনো তেমনি আপনার ভেবে তাঁকে ডেকেছ কি ?

বলরাম আপনার অন্তর খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোনই সাড়া পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, "তাইতো, আমি ত কখনো তাঁকে এত আপনার বলে ভাবতে পারি নাই"। তারপর বলিলেন, "আজ্ঞে না, তাঁকে সে রকম ভাবে কখনো ডাকি নাই"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর হাস্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আপনার চেয়ে আপনার ভেবে তাঁকে একবার ডেকে দেখো। নিশ্চয় বলছি, তিনি তোমাকে দেখা দিবেন। সংসারে তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই। মানুষ এক পা এগিয়ে গেলে, তিনি দশ পা তার কাছে এগিয়ে আসেন। প্রাণের ডাক হলে, ডাকতে না ডাকতেই তিনি শুনতে পান, কাছে এগিয়ে আসেন"।

বলরাম ইতিপূর্ব্বে এমন চমৎকার কথা আর কখনও শুনেন নাই। তিনি যেন বার বার ঐ কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন, "তাঁকে তেমনি আপনার ভেবে ডেকেছ কি? তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই। মানুষ এক পা এগিয়ে গেলে, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। ডাকতে না ডাকতেই তিনি শুনতে পান"। আর অনুক্ষণ তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "আমি ত কখনো তাঁকে এত আপনার বলে ভাবি নাই"। আজ বলরামের চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহার অন্তর নূতন আলোকে প্লাবিত হইল। অমৃতের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীযুক্ত বলরাম প্রসাদ গ্রহণান্তর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া, করযোড়ে বিদায় মাগিলেন। বিদায় কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আবার এসো"। প্রথম পরিচয়ে, অল্পক্ষণ মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন। তিনিও বলিলেন, "আসব বই কি"। অনন্তর বলরাম বন্ধুর সহিত রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন।

এখন হইতে বলরাম নানাবিধ উপহার সহ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, প্রায় প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সকলকেই তিনি তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। বলরামের পরিবারের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই পরম বৈষ্ণব ও ভক্তিমান্ ছিলেন। কাজেই অনতিকাল মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের

সহিত তাঁহাদের একটী ঘনিষ্ঠ প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্ন অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করিতেন। কারণ, তাঁহার অর্থ সদুপায়ে অর্জ্জিত; আর সাধু-সজ্জনের সেবা ও দান-দক্ষিণায় তাঁহাদের ত্রুটী ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আগমন করিলে, অনেক সময়েই ভক্তগণসহ বলরামের গৃহে অবস্থান করিয়া, তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিতেন। শ্রীযুক্ত বলরাম পরমহংসদেবের দেহত্যাগ কাল পর্য্যন্ত, মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং তৎপর প্রায় চারি বৎসর জীবিত থাকিয়া, ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ শ্রীগুরুর অভয় পাদপদ্মে মিলিত হন।

পরম বৈষ্ণব বলরাম জীব-হিংসায় একান্ত বিরত ছিলেন। এমন কি, তিনি মশা-মাছি মারিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। এই জন্য অনেক সময়ে, ইহাদের উপদ্রবে তাঁহার ইষ্টচিন্তার ব্যাঘাত ঘটিত। ইহাদিগকে বধ করা উচিত কিনা, এই বিষয়ে একদিন তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইল। ঠিক ঐ দিবস, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বালিশের খোল হইতে ছারপোকা মারিতেছেন। বলরামকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বালিশে অনেক ছারপোকা হয়েছে, এদের কামড় মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, ইষ্টচিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়"। বলরামের সংশয় দূর হইল। তিনি কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেক দিন থাকলে হুঁস

চলে যায়। মনে হয়, বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়, বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। আবার সর্ব্বদা ঈশ্বরের নামগুণ কীর্ত্তন করলে, ক্রমে ভক্তি হয়; তাঁতেই মন আসক্ত হয়”।

বাবুরাম ঘোষ

(১৮৮২ প্রারম্ভ)

আঁটপুর হুগলী জেলার একখানি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ ঘোষের পুত্র বাবুরাম ঘোষ অল্পবয়স্ক যুবক; কলিকাতার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তিনি জোড়াশাঁকোর কোন হরিসভাতে একবার মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখে রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধির কথা শুনিতে পাইয়াছেন। বাবুরাম, বলরাম বসু মহাশয়ের নিকট-আত্মীয় এবং রাখালের সহপাঠী। তিনি জানিতেন, রাখাল সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। বাবুরাম এক শনিবারে তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন। পথে আর একটী ভক্ত, রামদয়াল চক্রবর্ত্তীও তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। বাবুরামের আকৃতি যেমন সুন্দর, স্বভাবটীও তেমনি পবিত্র ও মধুর; বুদ্ধি কচি ছেলের বুদ্ধির মত সরল। নৌকায় বসিয়া রাখাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “আজ রাত্রি সেখানে থাকবে তো?” বাবুরাম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সাধুর কুটীরে কি থাকার সুবিধা হইবে? তাই বলিলেন,

"সেখানে কি থাকার সুবিধা হবে ?" রাখাল উত্তর করিলেন, "তা' হতে পারে"। সঙ্গে সঙ্গেই বাবুরামের ভাবনা হইল, তা' হলে আমরা রাত্রিতে খাব কি ? তিনি বন্ধুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হলে আমরা খাব কি ? কিছু কিনে খাবার মত দোকান-পাট আছে তো ?" রাখাল বলিলেন, "তা' কোন রকম একটা সুবিধা করে নেওয়া যাবে"।

বাবুরাম, রাখাল ও রামদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সেখানে নাই। রাখাল যাইয়া তাঁহাকে কালীমন্দির হইতে লইয়া আসিলেন। ভাবস্থ রামকৃষ্ণ রাখালের হস্ত ধারণ করিয়া, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া তক্ত-পোষের উপর বসিলেন। অল্পক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাবুরামের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে, বাবুরামের হাতে ধরিয়া তাঁহাকে কাছে টানিয়া লইলেন এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাঁহার আপাদ-মস্তক বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বালকটী শুদ্ধ-সত্ত্ব।

নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে আসেন নাই। অনেক দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই ভাবিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কথা মনে পড়িল। তাই তিনি অধীর হইয়া রামদয়ালকে বলিতে লাগিলেন, "অনেক দিন নরেনকে দেখি নাই, তাকে একবার আসতে বলো। দেখো, যেন ভুলে না যাও"।

রাত্রির আহারের পর রাখাল, বাবুরাম ও রামদয়াল শয়ন করিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি মাতৃ-চিন্তায় বিভোর। আবার নরেন্দ্রের কথাও বার-বার মনে পড়িতেছে। কিছুতেই তাঁহার কথা ভুলিতে পারিতেছেন না। তখন চৈত্র মাস। সাধুর অসুবিধা হইবে ভাবিয়া, বাবুরাম ও রামদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহের বারান্দায় শয়ন করিয়াছিলেন। চক্ষে একটু ঘোর লাগিয়া আসিতে না আসিতেই, পাহারাওয়ালার চীৎকারে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইত্যবসরে শ্রীরামকৃষ্ণ,—সর্ব্বদা যেমন করিতেন,—তিন চারি বৎসরের বালকের মত কাপড় বগলে করিয়া, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, ঘুমিয়েছ ?" রামদয়াল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, না মহাশয়"। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে নরেন্দ্রের কথা বলিতে লাগিলেন, "তাকে আসতে বলো কিন্তু। নরেন্দ্রের স্বভাব বড় পবিত্র। তার ভিতর নারায়ণের প্রকাশ দেখতে পাই। তাই তাকে না দেখে থাকতে পারি না। আমার বুকে যেন গামছা নিঙ্ড়াচ্ছে। দেখো, তাকে যেন আসতে বল, ভুলে যেও না"।

এইরূপে এক রাত্রির মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েক বার রামদয়ালকে ডাকিয়া, নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলিলেন। নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া, বাবুরাম স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "লোকটা নিশ্চয় একেবারে প্রাণহীন। নইলে এত ভালবাসা, তবুও আসে না ?"

সকাল বেলা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে পঞ্চবটী, কালীমন্দির প্রভৃতি দেবালয়ের সকল স্থান দর্শন করিলেন এবং তৎপর গৃহে ফিরিবার জন্য বিদায় লইলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "আবার এসো"।

কালীবাটীর মনোরম দৃশ্য, গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি, পঞ্চবটীর নীরবতা, সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও আপন ব্যবহার বাবুরামের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। এখন হইতে তিনি অবসর পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, যাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন, বাবুরাম তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার পবিত্র অন্তরের কথা বলিতে যাইয়া, পরমহংসদেব বলিতেন, "ইহার হাড় ক'খানা পর্য্যন্ত শুদ্ধ"। প্রেমিক বাবুরাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'স্বামী প্রেমানন্দ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বরাহনগরে মঠের প্রথম পত্তন হইতেই, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীগুরুর সেবাপূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক মান্দ্রাজে প্রেরিত হইলে, স্বামী প্রেমানন্দ মঠের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহ ত্যাগের পর, রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রায়ই মিশনের কার্য্যহেতু ভারতের নানা স্থানে যাইতে হইত। কারণ, ঐ সময়ে মিশনের কেন্দ্র ও কার্য্য দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুপস্থিতি কালে, প্রেমানন্দই বেলুড় মঠের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঠাকুর-পূজা হইতে আরম্ভ

করিয়া গো-সেবা, বাগান-করা প্রভৃতি সব রকমের কাজ নিজ হাতে করিয়া, তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণকে ঐ সকল কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। নিত্য নিয়মিত জপধ্যান ও শাস্ত্রপাঠ করিয়া, যাহাতে তাঁহারা সাধু-জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়েও তাঁহার সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত। আবার, 'বেলুড় মঠে' সমাগত ভক্ত ও দর্শকগণ তাঁহার আদর-যত্ন ও অমায়িক ব্যবহারে সহজেই ধর্ম্মপথে পরিচালিত ও রামকৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত হইত। স্নেহ ও প্রীতি গুণে সকলকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়া, উত্তর কালে স্বামী প্রেমানন্দ মঠের মাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, পূজাপাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়া, লোকের প্রাণে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিতে, স্বামী প্রেমানন্দ অদ্বিতীয় ছিলেন। ভক্তসেবা ও উৎসবাদি কার্য্যে তাঁহার বড়ই প্রীতি ছিল। ঐ উপলক্ষে কোনও স্থানে নিমন্ত্রিত হইলে, তিনি মঠের সাধুগণ সহ তথায় যাইয়া, উপস্থিত সকলের অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং অনেকবার ঢাকা ও ময়মনসিংহের নানা স্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে, ঐ অঞ্চলের উচ্চনীচ সকল বর্ণের হিন্দু, এমন কি মুসলমানগণের মধ্যেও, শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল। স্বামী প্রেমানন্দের জ্ঞান ও প্রেমের বন্যা, বাস্তবিকই, পূর্ব্ববঙ্গকে বিশেষভাবে প্লাবিত করিয়াছিল। শেষবার পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ কালে কচুরী-পানার আবির্ভাবে গ্রাম্য পুষ্করিণী সমূহের জল

দূষিত হইয়া, নানা মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে দেখিয়া, এক দিবস স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং পুকুরে নামিয়া, কচুরী-পানা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। স্বার্থপর গ্রামবাসী পূর্ব্বে এই বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও, তাঁহার প্রদর্শিত মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অনেকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইবার স্বামী প্রেমানন্দ উৎসব উপলক্ষে, ক্রমাগত দুই তিন মাস কাল এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইকালে দিবারাত্র অবিরাম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও অনিয়মিত আহার-নিদ্রার ফলে, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, মঠে ফিরিয়া যান। ক্রমে তাঁহার অসুখ কালাজ্বরে পরিণত হইল। নিয়মিত ঔষধ-পথ্য সেবন ও বায়ু পরিবর্ত্তনের ফলে, দীর্ঘ দেড় বৎসরে তাঁহার শরীর সারিয়া উঠিল ; কিন্তু অল্পকাল সুস্থ থাকিয়াই, তিনি পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জার কবলে পতিত হইলেন। এই অসুখে কয়েক দিন মাত্র ভুগিয়াই স্বামী প্রেমানন্দ ১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ (ইং ৩০শে জুলাই, ১৯১৮) মরজগৎ হইতে চিরবিদায় লইলেন।

নিত্যনিরঞ্জন সেন

(১৮৮২ প্রারম্ভ)

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন সেনের নামও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার বাড়ী ছিল চব্বিশ পরগণার রাজারহাট বিষ্ণুপুর। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক নিত্য-

নিরঞ্জন প্রথমে কলিকাতায় আহিরীটোলার ভূতুড়ে দলের সভ্য ছিলেন। তাঁহার মধ্যে সহজেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। তজ্জন্য দলের লোকেরা তাঁহার সাহায্যে প্রেতাত্মা আকর্ষণ করিয়া, নানা অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিত। নিরঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের কথা শুনিতে পাইয়া, একদিন অপরাহ্ণে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাবেলা ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনের সহিত পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় অনেক কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভূতুড়ে দলের কথা জানিতে পারিয়া, তিনি প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিলেন, "দেখ, যে সর্ব্বদা 'ভূত-ভূত' করে, সে ভূতই হয়ে পড়ে। আবার ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে, লোক ভগবান্ পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তার কোন্‌টা ভাল ?" নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, "যদি হতেই হয়, তবে ভগবান্ হওয়াই ভাল"।

রাত্রির অন্ধকারে পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় ফিরিতে কষ্ট হইবে বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কালীবাড়ীতেই রাত্রিবাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি পরমহংসদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার ফলেই, নিরঞ্জনের প্রাণে বেশ একটা আপনার-বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে তিনি কয়েক দিবস পরেই, পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া

উঠিলেন। তিনি তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও নিরঞ্জন, দেখতে দেখতে দিন যে চলে যায় রে! তুই কবে ভগবান্ লাভ করবি? তাঁকে লাভ না করলে যে, জীবনই বৃথা। তোর ভাবনা যে আমাকে অস্থির করে তুলেছে? তুই কবে তাঁর পদে সবটা মন দিয়ে দিবি, কবে তাঁকে লাভ করবি, তাই বল?" ইহাতে নিরঞ্জনও বিচলিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি আমার কে? একদিনের পরিচয়েই আমার জন্য এত ভাবনা, আমার হিতের জন্য পাগল!" নিরঞ্জন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, পর দিবস গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপার্থিব ভালবাসায়, একাদিক্রমে তিন দিবস পরম আনন্দে তাঁহার নিকট বাস করিয়া, গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাস করিতেন; দক্ষিণেশ্বর গমনের কথা বাড়ীর কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার খোঁজ না পাওয়ায় বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিলে, মামা তাঁহাকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহা নীরবে সহ্য করিলেন।

ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি ভূতুড়ে দলের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে নানাভাবে শিক্ষা দান করিয়া, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের মন এত পবিত্র ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "নিরঞ্জনে

এতটুকু অঞ্জন (মলিনতা) নাই"। এই কথা স্মরণ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল, 'স্বামী নিরঞ্জনানন্দ'।

নিরঞ্জনের দেহ সবল ও সুগঠিত এবং আচরণ বীরের ন্যায় ছিল। একদা তিনি নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন ; এমন সময়ে আরোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ, কথায় কথায় পরমহংসদেবের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহাতে নিরঞ্জন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে আরোহিগণের কথায় প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কাণ দিল না। তাহারা পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিল। অবশেষে যুবক অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া, সমগ্র নৌকাখানি গঙ্গার মাঝখানেই ডুবাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। নিরঞ্জনের উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, নৌকার সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। নিরঞ্জনের মুখে উক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত জানিতে পারিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্ দেখি, তুই আজ ক্রোধের বশে কত বড় অন্যায় কাজটা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলি ?" গরীব মাঝি আর অন্যান্য আরোহীরা কি তোর কোন অনিষ্ট করেছিল ? ক্রোধের প্রশ্রয় দিতে নাই। ক্রোধ চণ্ডাল"।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ১৩১১ সনের ২৭শে বৈশাখ (মে, ১৯০৪ খৃঃ) হরিদ্বারে শরীর ত্যাগ করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই, তিনি দুরারোগ্য রক্তামাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে কতকটা সুস্থ হইয়া, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য হরিদ্বারে গমন করেন। সেখানে হঠাৎ বিসূচিকা রোগের আক্রমণে তাঁহার দেহান্ত হয়।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(১৮৮২—ফেব্রুয়ারী)

ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। মহেন্দ্রনাথ কয়েক দিন যাবৎ বরাহনগরে ভগিনীর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মহেন্দ্র ভাবুক লোক, তাহাতে আবার বসন্তের মৃদু-মন্দ হাওয়া। তিনি মধ্যে মধ্যে বরাহনগরের এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে যান। আজ রবিবার, অবসর আছে; তাই বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ সঙ্গীটী বলিল, "গঙ্গার ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে। সে বাগানটী কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন"।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গী রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়া, বরাবর পরমহংসের গৃহে গমন করিলেন। মহেন্দ্র দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তক্তপোষে বসিয়া, সহাস্য বদনে হরিকথা কহিতেছেন। আর ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার

কথামৃত পান করিতেছে। সন্ধ্যা হইলে ভক্তেরা উঠিলেন। মহেন্দ্রও সঙ্গীকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। ইচ্ছা, সমস্ত বাগান-বাড়ীটী বেড়াইয়া দেখিবেন। একে জ্যোৎস্না ও বসন্তের মলয়ানিল, তদুপরি গঙ্গা-প্রবাহের কুলু কুলু ধ্বনি, আর চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ মুহূর্ত্তে মহেন্দ্রনাথের মনে স্বপ্ন-জাল বিস্তার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আহা! কি চমৎকার স্থান, কেমন সুন্দর মানুষ, আর কত মিষ্ট কথা! ইতিমধ্যে নীরবতা ভাঙ্গিয়া, মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নহবৎ হইতে রোশনচৌকির সুমধুর তান দিগন্তে ভাসিয়া চলিল।

মহেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী পদচারণ করিতে করিতে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া, পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বৃন্দে-ঝি সেখানে দাঁড়াইয়াছিল; মহেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, পরমহংস মহাশয় ঘরের ভিতরেই আছেন। বৃন্দের কথায় তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি একাকী তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন ঘরে অন্য কেহ নাই। মহেন্দ্র করজোড়ে প্রণাম করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন ও তাঁহাদের পরিচয় লইলেন। রামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সন্ধ্যাকালে ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আজও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলেন। মহেন্দ্র ভাবিলেন, সাধুর ইষ্টচিন্তায় ব্যাঘাত হইতেছে। তাই তিনি অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন। বিদায়

কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আবার এসো"। অল্পক্ষণের পরিচয় হইলেও, মহেন্দ্রনাথ পরমহংসের সামান্য দুই চারিটী কথার প্রভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে যেন পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, "আবার এসো, আবার এসো, আবার এসো"। মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, শীগ্‌গীরই আবার আস্‌তে হবে"।

প্রাণের টানে, মহেন্দ্রনাথ পরদিন প্রাতঃকালেই পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ রামকৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীর খবর লইলেন। তারপর কেশব বাবুর অসুখের কথা উঠিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, মহেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার ছেলেপুলেও হইয়াছে জানিতে পারিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "তোমার লক্ষণ সব ভাল ছিল। সংসার-বন্ধন না থাকলেই বেশ ভাল হত"। মহেন্দ্রের পরিবারটী কেমন, বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আজ্ঞে ভাল, তবে অজ্ঞান'। রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আর তুমি বুঝি জ্ঞানী ?"

অনন্তর সাকার, নিরাকার, প্রতিমা-পূজা ইত্যাদি বিষয়ে, তাঁহাদের মধ্যে অনেক কথা হইল। রামকৃষ্ণকে প্রথম দিন দর্শনের পরেই, তাঁহার ঈশ্বরীয় কথায় মুগ্ধ হইয়া মহেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, পরমহংস মহাশয় নিশ্চিতই বহু পুস্তক পাঠ করিয়া ঐ সকল কথা ও ভাব আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দে-ঝির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, পরমহংস বস্তুতঃ

তেমন কিছু পড়াশুনা বা শাস্ত্র-পাঠাদি কোন কালেই করেন নাই; বলিতে গেলে, তিনি নিরক্ষর; অথচ তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও চাল-চলন দেখিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরাও স্তম্ভিত হইয়া যান। দ্বিতীয় দর্শন দিনে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মহেন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিলেন, আজীবন বিদ্যাভ্যাস ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি আলোচনা করিয়া তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, নিরক্ষর পরমহংসের জ্ঞানের তুলনায় তাহা কছুই নয়; সূর্য্যালোকে নিষ্প্রভ প্রদীপের সমান।

মহেন্দ্রনাথের প্রাণে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি বিনীত শিষ্যের ন্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণকে পর পর নানা প্রশ্ন করিয়া, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বর-লাভের উপায় সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলেন। মহেন্দ্রনাথ পাকা ইংরাজী-শিক্ষিত লোক। কলেজে পড়াশুনার পর, বি, এ, পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতা শ্যামবাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; আইন পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেন নাই; আবার, পূর্ব্বে কখন কখন রিপণ, সিটি ও মেট্রোপলিটান কলেজে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ এতকাল কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যাকেই জ্ঞান বলিয়া জানিতেন। বই না পড়িয়াও যে, লোক জ্ঞানী হইতে পারে, একথা কখন তাঁহার কল্পনায়ও আসে নাই। মহেন্দ্র তর্ক করিতে পটু, শিক্ষার অভিমানও যথেষ্ট ছিল। আবার, পাশ্চাত্য ভাবের বন্যায় দেশের শিক্ষিত দশ জনের ন্যায়, তিনিও প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাস হারাইয়া

নিরাকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন এবং কেশব বাবুর সমাজে যাতায়াত করিতেন। সাধু-সন্ন্যাসীতেও তাঁহার একেবারেই আস্থা ছিল না। কিন্তু পরমহংসের পাল্লায় পড়িয়া এক দিনেই তাঁহার সকল ভ্রম ঘুচিল। বার বার অঙ্কুশাঘাত পাইয়া, তাঁহার যুক্তিতর্ক, অভিমান, অহঙ্কার চিরতরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর, মহেন্দ্রনাথ অবসর পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরমহংসদেবের নিকট তত্ত্বকথা শুনিতেন। দিনের পর দিন, মহেন্দ্র তাঁহার মধুর চরিত্র ও ঈশ্বরীয় কথায় নূতন আলোক পাইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও ইষ্টের আসন অধিকার করিলেন। রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিনে, মহেন্দ্র প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে দুই এক রাত্রি বাস করিয়া, তত্ত্বকথা শ্রবণ-মনন ও গুরুসেবা করিতেন। সুযোগ পাইলে কখন বা তিনি মাসাবধি পরমহংসদেবের নিকট বাস করিতেন। এইরূপে অল্পদিনেই মহেন্দ্রনাথের জীবন-ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার অনুক্ষণ ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মাষ্টার মহাশয় নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাষ্টার, মহিন্দর, বা মহিন্দ-মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই মাষ্টার মহাশয়ের রোজ-নামচা বা দিনলিপি রাখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি যে-দিন পরমহংস-দেবের নিকট উপস্থিত থাকিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার

উক্তি সমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সাধারণতঃ সেই দিন রাত্রিতেই নিজ দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি পাঁচখণ্ড 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় দক্ষহস্তে তাহারই নিখুঁত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ভাষা, সরল ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ এবং উদার ধর্ম্মমত সম্বলিত এই কয়েকখণ্ড কথামৃত চিরকাল সমগ্র বিশ্বে সমাদর পাইবে এবং মাষ্টার মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিবে। কেবল মাত্র পাঁচখণ্ড কথামৃত লিপিবদ্ধ করাতেই মাষ্টার মহাশয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম জীবনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গ ও নিজ শুভ-সংস্কার গুণে, তাঁহার চরিত্র এত মহৎ হইয়াছিল যে, তাঁহার নিস্পৃহ, ধ্যান-তন্ময় জীবনাদর্শ ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, কেহ কেহ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অনেকে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন এবং বহুলোক সৎগৃহস্থের জীবন যাপন করিয়া, অনন্ত কল্যাণ, ত্যাগ ও শান্তির পথে চলিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ ছিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত দীর্ঘশ্মশ্রু, তাঁহার গম্ভীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার লম্বিত পক্ককেশ ও শুভ্র শ্মশ্রু আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার চক্ষু দুইটীও অতি সুন্দর ছিল।

১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ় (জুলাই, ১৮৫৪ খৃঃ) কলিকাতার শিবনারায়ণ দাসের গলিতে মহেন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুপ্ত যেমন ভক্তিমান্ ছিলেন,

পুত্রের মধ্যেও তেমনি ভক্তির ভাবটী বিশেষ প্রকট হইয়াছিল। মহেন্দ্র উপযুক্ত বয়সে কেশব বাবুর এক সম্পর্কিতা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী নিকুঞ্জা গুপ্তাও বেশ ভক্তিমতী ছিলেন এবং পরমহংসদেব ও শ্রীমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর, শ্রীমা কখন কখন তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া মাসাবধি বাস করিয়াছেন। ১৩৩৯ সনের ২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন, ১৯৩২ খৃঃ) মাষ্টার মহাশয় কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

যোগীন্দ্রনাথ

(১৮৮২)

অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক যোগীন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর গ্রামের শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র। তিনি খৃষ্টান পাদরি-সাহেবের স্কুলে প্রবেশিকার প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তাঁহার স্বভাবটী অতিশয় কোমল, আকৃতি, যোগিজন-সুলভ। যোগীন্দ্রনাথ যখন পাঁচ ছয় বৎসরের বালক, তখন হইতেই স্বভাবতঃ তাঁহার মনে হইত, সংসার নিতান্ত অনিত্য; ইহা কাহারও স্থায়ী বাসস্থান নয়। খেলাধূলার মাঝখানেও তিনি অনেক সময়ে এই কথা স্মরণ করিয়া উদাস-ভাব অবলম্বন করিতেন এবং পূর্ব্ব-পরিচিত কত অজানা রাজ্যের কথা যেন স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার মনে উদিত হইত। উপবীত ধারণের পর বালক গায়ত্রী জপ ও দেবদেবীর

পূজায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। পূজা ও ধ্যানে কখন কখন একাসনে তাঁহার দুই তিন ঘণ্টা কাল কাটিয়া যাইত।

যোগীনের পিতা শ্রীযুক্ত নবীন প্রায় প্রত্যহ রাসমণির কালীবাড়ীর বাঁধা ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। সর্ব্বদা যাতায়াতের ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। যোগীন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে রাসমণির উদ্যানে যাইয়া, গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোগীন্দ্র এইরূপে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী গৃহে লোকের ভিড় দেখিয়া, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, গ্রামের লোকেরা যাঁহাকে কালীবাড়ীর পাগলা-ঠাকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তিনি এক-ঘর লোকের সহিত সরল ও মধুর ভাষায় ঈশ্বরীয় কথা বলিতেছেন। যোগীন্দ্র ইতিপূর্ব্বে কখনও ভক্তিতত্ত্বের এরূপ সরল ও উদার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন নাই। আবার ভগবৎ প্রেমে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লাস ও মুহুর্মুহুঃ ভাব দর্শন করিয়া, যোগীনের মনে হইল, ইনি যথার্থই ঈশ্বর-প্রেমিক। গ্রামের লোকেরা অযথা ইঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।

একদিনের দুই চারিটী কথা শুনিয়াই, যোগীন্দ্র পরমহংসকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পরদিবস অপরাহ্নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে যোগীনের পরিচয় লইলেন এবং তিনি শ্রীযুত নবীনের পুত্র

জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন। কারণ, নবীন বাবু অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। পূজাপাঠ ও জপতপেই তাঁহার দিন কাটিত। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে ভাগবৎ-পাঠাদি শ্রবণ করিতে, কখন কখন তাঁহাদের বাড়ীতে গমনও করিয়াছিলেন। পরিচয়ের পর, পরমহংসদেব বালকের অঙ্গ-লক্ষণ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালক ত্যাগের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা ওখানে যাতায়াত করিতে বলিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথও প্রায় প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

নবীন বাবু সম্পন্ন জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালবশে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি, ধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুবাগ বশতঃ, তিনি নিজেও বিষয়কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন। সুতরাং, পুত্র যোগীন্দ্রনাথই পরিবারেব একমাত্র ভরসা-স্থল হইয়া দাঁড়াইলেন। সংসারের অভাব-অনটনে বিচলিত হইয়া, যুবক পাঠ ত্যাগ করিয়া, চাকুরীর খোঁজে কানপুবে তাঁহার মেসো-মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার চাকুরীর সুবিধা হইল না। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পর, অবিবাহিত জীবন যাপন ও ভগবান্-লাভই যোগীনের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার কোন কর্ম্ম না থাকায়, তিনি দিবারাত্র ধর্ম্মচিন্তা, পূজাপাঠ ও জপতপে ডুবিয়া রহিলেন। তাঁহার সতত গম্ভীর ভাব ও আরক্তিম নয়ন শীঘ্রই

মেসো-মহাশয়ের চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তিনি যোগীন্দ্রের পিতাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত নবীন বিশেষ-চিন্তিত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পুত্রের বিবাহ স্থির করিলেন এবং তাঁহার মাতা অত্যন্ত অসুস্থ, এইরূপ একটা মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। বিবাহের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে বাড়ী পোঁছিয়া, যোগীন্দ্রনাথ পিতার কাণ্ড দেখিয়া অবাক—মাতা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন, অথচ বাড়ীতে বিবাহের ধূমধাম। যোগীন্দ্র অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই একবার পিতাকে বলিয়াছিলেন। এইবারও তিনি তাঁহাকে স্পষ্ট ঐ কথা জানাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "নিজের ভাবনাতেই অস্থির করে তুলেছে, তার ওপর আবার স্ত্রীর ভাবনা; তার খাওয়া-পরার কথা আমি ভাবতে পারব না"। শ্রীযুক্ত নবীন কন্যার পিতার নিকট বাক্যাবদ্ধ; অথচ পুত্র কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হন না। তজ্জন্য বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। যোগীনের মাতা বলিলেন, "স্ত্রীর জন্য তোর একটুও ভাবতে হবে না, আমরা তার সব ভাবনা ভাবব। তুই শুধু বিয়ে করে আমাদের কথাটা রক্ষা কর"। অবশেষে জননীর আকুল ক্রন্দনে যোগীন্দ্রের মন টলিল। তিনি, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মাতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিলেন।

পুত্রের বিবাহের কিছুকাল পরেই, অভাব-অনটনে জর্জ্জরিত হইয়া, যোগীন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত

নানাভাবে পীড়াপীড়ি ও গালমন্দ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মাতা বলিলেন, "বৌ পালবার ক্ষমতা নাই, তবে বিয়ে করেছিলি কেন?" কথাগুলি যোগীন্দ্রের হৃদয়ে শেলের মত বাজিল; তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। যে মায়ের চোখের জল দেখিতে না পারিয়া, তিনি শুধু তাঁহারই সান্ত্বনার জন্য বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই কিনা তুই দিন পর বলিতেছেন, "বৌ পালতে পারবি না, তবে বিয়ে করেছিস কেন"? সংসার তাঁহার নিকট অরণ্যের তুল্য বোধ হইল। তিনি নিতান্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিবস যোগীন্দ্র কথায় কথায় পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া, বিবাহের পর তিনি লজ্জায় আর তাঁহার নিকট গমন করেন নাই। একদিকে সংসারের অড়না ও মাতার অনুযোগ, অন্যদিকে দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়া, যোগীন্দ্র হতাশ হইলেন; তাঁহার অশান্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহার জন্য চিন্তিত হইলেন এবং কালীবাটীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে পর পর কয়েক দিন খবর পাঠাইলেন; কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ কিছুতেই তাঁহার নিকট আসিলেন না। যোগীন্দ্র কানপুর যাওয়ার পূর্ব্বে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কয়েকটী জিনিষ ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। জিনিষ ক্রয়ের পর কিছু পয়সা উদ্বৃত্ত ছিল; তিনি তাহা এপর্য্যন্ত ফেরৎ দিতে পারেন নাই। কখন কখন পয়সার কথা ভুলিয়া যাইতেন; আবার

মনে হইলেও লজ্জা করিয়া কালীবাটীতে যাইতেন না। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এক উত্তম্ কৌশল অবলম্বন করিয়া, যুবককে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। তিনি তাঁহার একটী প্রতিবেশীর নিকট বলিয়া দিলেন, "তোমাদের গ্রামের নবীন রায়ের ছেলে কেমন লোক! অনেক দিন হতে আমার কিছু পয়সা তার কাছে রয়েছে; কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে না কেন, বল দেখি। তাকে তুমি আমার পয়সা কটা ফিরিয়ে দিতে বলো"। প্রতিবেশীর নিকট পরমহংসদেবের তিরস্কারের কথা জানিতে পারিয়া, যোগীন্দ্রের মন দুঃখ ও অভিমানে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন, "বে করেছি বলে, আমি কি এতই হীন হয়ে পড়েছি যে, তাঁর পয়সা রেখে দেব। আজই যেয়ে পয়সা কটা ফেলে দিয়ে আস্‌ব"। যোগীন্দ্রনাথ অপরাহ্নে কালীবাটীতে পরমহংসদেবের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি ছোট খাটটীর উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, পরমহংসদেব বালকের ন্যায় কাপড়-বগলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বিয়ে করেছিস, তাতে কি হয়েছে, আমিও ত বিয়ে করেছি; তাতে ভয়ের কি আছে? সংসারে থাকিস, আর সংসার ছেড়ে আসিস, তোর ধর্ম্মহানি হবে না। তোর স্ত্রী কখনও তোর ধর্ম্মপথে অন্তরায় হবে না"। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যোগীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কোথায় পয়সার জন্য অনুযোগ, আর কোথায় অহেতুক কৃপা। অরুণ উদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তাঁহার নিরাশার ভাব অন্তর্হিত হইল; তিনি

পরমহংসদেবের ছল বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পয়সার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না দেখিয়া, যোগীন্দ্র গৃহে ফিরিবার কালে ঐ কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব তাঁহার কথায় বিশেষ মনোযোগ করিলেন না। একটা টিনের ভাঙ্গা বাক্স দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ বাক্সটার ভিতর রেখে দে"।

এখন হইতে যোগীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ প্রায় প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিয়া, তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা গুণে উত্তরোত্তর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিরীহ-প্রকৃতি যোগীন্দ্র-নাথের কোমল ভাবের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোরতার খাদ মিশ্রিত করিয়া, তাঁহার চরিত্র সুন্দর রূপে গড়িয়া তুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যত্নপর ছিলেন। একদিন তিনি জামা-কাপড়ের মধ্যে একটা আরশুলা দেখিতে পাইয়া, উহাকে বাহিরে লইয়া যাইয়া বধ করিবার নিমিত্ত যোগীনের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু যুবক আরশুলাটী না মারিয়া, উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যোগীন ঘরে ফিরিয়া আসা মাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, ওটাকে মেরেছিস ত?" তিনি উত্তর করিলেন, "না, ছেড়ে দিয়েছি"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোকে আরশুলাটা মারতে বললাম, তুই মারলি নে কেন? যা বলব, তাই করবি; তা না হলে, পরিণামে অনেক গুরুতর বিষয়েও নিজের বুদ্ধিতে চলে, শেষটায় অনুতাপ করতে হবে"।

অন্য এক দিবস যোগীন্দ্রনাথ নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছিলেন। তিনি পরমহংসের নিকট গমন করিতেছেন

জানিতে পারিয়া, একজন আরোহী কথায় কথায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। নিরীহ-প্রকৃতি যোগীন্দ্রনাথ আরোহীটীর অজ্ঞতার কথা ভাবিয়া, নীরবে তাহার সকল কটূক্তি সহ্য করিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, ঘটনাটী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বলিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন, তিনি ঐ কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের শিথিল প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন, "আমাকে নিন্দা করলে, আর তুই চুপ করে বসে বসে সব কথা শুনলি! ধিক্ তোকে! শাস্ত্রে কি বলে জানিস? গুরু-নিন্দা-কারীকে বধ করবে, অথবা তার সামনা থেকে সরে পড়বে। গুরু-নিন্দা শুনতে নেই। আর তুই কিনা নীরবে আমার অপমান সহ্য করলি"।

একবার যোগীন বাজার হইতে একটী লোহার কড়া ক্রয় করিতে যাইয়া, দোকানদারের উপরেই কড়াটী ভালরূপে দেখিয়া দিবার ভার দিলেন। দোকানীর কি আর ধর্ম্মভয় আছে, না সে ধর্ম্মের দোহাই মানে? যোগীন্দ্র কড়াটী লইয়া বাড়ী ফিরিলে দেখা গেল, উহার একদিকে ফাটা রহিয়াছে। এই বিষয় জানিতে পারিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভক্ত হবি ত বোকা হবি কেন? দোকানদারকে কখন বিশ্বাস করতে নেই। ওরা কি আর ধর্ম্ম করতে বসেছে। ওদের বিশ্বাস করাটাই বোকামি। কিছু কিনতে হলে, নিজে ভাল করে দেখে শুনে নিতে হয়। আর যাতে ফাউ মেলে, ফাউটুকুও ছাড়তে নেই; চেয়ে নিতে হয়"।

যোগীন্দ্রনাথের মন সহজেই সংশয়াপন্ন হইত। তিনি কখন কখন শ্রীরামকৃষ্ণকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে ছাড়িতেন না। যোগীন্দ্র মধ্যে মধ্যে কালীবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাত্রিবাস করিতেন। এক দিবস তিনি পরমহংসদেবের গৃহে শয়ন করিয়াছেন; মধ্যরাত্রিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন, পরমহংসদেব গৃহে নাই। শ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন এবং কালীবাটীর নহবতে বাস করিতেন। যোগীন্দ্রের মনে সংশয়ের উদয় হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে, সকলের অলক্ষিতে, শ্রীমায়ের নিকট গমন করিয়া থাকিতে পারেন ভাবিয়া, তিনি বারান্দায় যাইয়া নহবতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর, শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিক হইতে গৃহে আসিলেন। যোগীনকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, এখানে কি চাস ?" ইহাতে যুবক যারপরনাই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। পরমহংসদেব যোগীনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বেশ করেছিস, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তারপর বিশ্বাস করবি"। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন ভক্ত এবং ভাবী শিষ্যগণকেও, ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া গুরু-গ্রহণে উৎসাহিত করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির হইতে নিয়মিত ভাবে যে প্রসাদ পাইতেন, একদিন তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায়, তিনি চিন্তিত হইয়া নিজেই কালীবাটীর খাজাঞ্চির নিকট ঐ বিষয়ে খোঁজ করিতে গেলেন।

এই সময়ে যোগীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে হইল, "কি আশ্চর্য্য! এখন পর্য্যন্ত ইনি প্রসাদের লোভটা ছাড়তে পারেন নি। নিজে ত বড় একটা প্রসাদ খান না, তবুও উহা আনতে ছাড়েন না। যজমেনে বামুন কিনা, তাই এখনো সামান্য চালকলা-বাঁধাটা ভুলতে পারেন নি; অভ্যাসটা র'য়ে গেছে"। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহে ফিরিয়া, যোগীনের নিকট বলিতে লাগিলেন, "দেখ, রাসমণি মন্দিরের জন্য এতসব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, যাতে ভক্ত ও সাধু-সেবা হয়। এখানে তার যতটুকু আসে, তা ঠিক ঠিক ভক্ত ও সাধু-সেবায় লাগে। কারণ, যাঁরা ভগবান্‌কে পেতে চায়, তাঁরাই এখানে আসে। রাণীর উদ্দেশ্যও এতে অন্ততঃ কতকটা সিদ্ধ হয়। আর মন্দিরের পূজারীরা যা নেয়, তা যেমন-তেমন করে, ন্যায়, অন্যায়, কত ভাবে খরচা করে। তার জন্যই ত আমি এত হিসাব করে প্রসাদটা আনি"। এত সামান্য ব্যাপারেও শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া, যোগীন্দ্র বিস্মিত হইলেন এবং আপন নিবুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া, অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন।

'কিরূপে কাম দমন করা যায়', যোগীন্দ্রনাথ একদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "খুব হরিনাম করবি, দিনরাত তাঁর কথা ভাববি, আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করবি"। কিন্তু যোগীন্দ্র এই সরল উপদেশটীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। পরমহংসদেবের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

অবশেষে একদিন তাঁহার মনে হইল, "পরমহংসদেব যখন বলেছেন, একবার করে দেখি, কি হয়"। তার পর হইতে, তিনি খুব হরিনাম করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে যোগীন্দ্র অল্পদিনেই বেশ সুফল লাভ করিয়াছিলেন। কাম-জয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকগণকে বলিতেন, "বর্ষাকালে বন্যার জল বাঁধ মানে না; মুহূর্ত্তে বাঁধ-টাধ সব কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি জানবি, যৌবনে কামের বেগ অনেক সময়ে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। তা বলে মন ভাঙ্‌তে নেই। যদি কখন মনে একটু-আধটু কু-ভাব আসেই-বা, অমনি ওটাকে তাড়িয়ে দিবি। ওগুলোকে শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। বসে বসে ওসব কথা ভাবলে, কি ফল হবে? আরো ওসব চিন্তা বেড়ে যাবে। ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে কাম একেবারে যায় না। তাঁর দর্শনের পরেও, যতদিন শরীর থাকে, ওগুলো একটু-আধটু থেকে যায়। কিন্তু তখন ওদের জোর কমে যায়, মাথা তুলতে পারে না"।

শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপাভাজন যোগীন্দ্রনাথ, উত্তর কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, 'স্বামী যোগানন্দ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত ঈশ্বর-চিন্তার ফলে, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষে ভেদ-বুদ্ধি এককালে লোপ পাইয়াছিল এবং পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর, তিনি শ্রীমার সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাধিবান্ যোগী যোগীন্দ্রনাথ, ১৩০৫ সনের ১৫ই মাঘ অপরাহ্নে মর-জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়া অভয়-পদে আশ্রয় লাভ করেন।

প্রতাপ চন্দ্র হাজরা

(১৮৮২)

জটিলা-কুটিলাকে বাদ দিলে লীলা-পোষ্টাই হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-পোষ্টাইয়ের জন্যও, হাজরার মত একজনের প্রয়োজন ছিল। হাজরার পূর্ণ নাম ছিল প্রতাপ চন্দ্র হাজরা; বাড়ী কামারপুকুরের নিকট মড়াগোড় গ্রামে। সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, তিনি হৃদয়রামের বাড়ী সিহোড় গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন এবং তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৬।৪৭ হইবে।

হাজরার বাড়ীতে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদির ভরণ-পোষণের মোটা-মুটি বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু প্রায় হাজার টাকা দেনার দায়ে এবং কতকটা আপন স্বভাব বশতঃ, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আবার মধ্যে মধ্যে বাড়ীতেও যাইতেন। জ্ঞানলাভ না হইলেও, হাজরার জ্ঞানের অভিমানটী বড় বেশী ছিল। তিনি কখন কখন 'সোঽহং সোঽহং' করিতেন। আবার বলিতেন, এক ব্রহ্মই সকল জীবের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন; সাধন করিলে যে-কেহ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। তর্ক পাইলে, হাজরা তাহাতে ডুবিয়া থাকিতেন; আর অন্য সময়ে, পরমহংসদেবের গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর হাজার টাকা ঋণের চিন্তাটিও তাঁহার মনে প্রবল ছিল। কোন অবস্থাপন্ন লোক

পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

হাজরা অহঙ্কারী; তাঁহার শুষ্ক জ্ঞানীর ভাব। তাই তিনি অনেক সময়ে পরমহংসদেবের যুবা-ভক্তগণের নিকট ভক্তি ও সাকার উপাসনার নিন্দা করিয়া, তাঁহাদের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেন! তিনি বলিতেন, "তাঁকে পূজা করে আর কি হয়? তাঁর জিনিষ দিয়েই ত তাঁকে পূজা?" পরমহংসদেব যে মধ্যে মধ্যে ভক্তগণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, ইহা হাজরা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি কখন কখন ইহার বিকৃত ব্যাখ্যাও করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি পরমহংসদেবকে মহা-পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন; আবার অনেক সময়ে, তাঁহার প্রতি হাজরার অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব আসিত। তখন তিনি প্রকাশ্যে ভক্তগণের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ হাজরার নিরাকার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় সায় দিতেন। আবার, ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা এতটা তলাইয়া দেখিতেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার কথাবার্ত্তা, জপ-তপ ও ভাব-ভঙ্গিতে ভুলিয়া যাইতেন। এইরূপে হাজরা ভক্তগণের মনে সংশয় জাগাইয়া দিলে, সেই সংশয় দূর করিবার জন্য পরমহংস-দেবকে অনেক সময়েই বেগ পাইতে হইত। এই সম্পর্কে তিনি একদিন তাঁহাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা ইত্যাদিতে ব্রহ্মেরই প্রকাশ রয়েছে। প্রথম অবস্থায়, তাঁর নামগুণ গান ও সাধন-ভজন দ্বারাই তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এর জন্য

তাঁকে সাকার মূর্ত্তিতে ভক্তি করারও প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান হলে, এর তেমন প্রয়োজন থাকে না"। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা পাশেই বসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, এরা এখনো ভক্তি নিয়ে আছে। এখনো এরা তত উচ্চ অবস্থা লাভ করতে পারেনি। এদের কাছে আর কখনো 'সোঽহং' ইত্যাদি কথা বলো না। ওরকম করলে, ওদের ভাবে গোল বেঁধে যেতে পারে"।

শ্রীরামকৃষ্ণই হাজরাকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু হাজরা সময়ে সময়ে অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার কার্য্যে গোল বাঁধাইতেন। মূলতঃ, তাঁহার অন্তরে পরমহংসদেবের প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, হাজরা মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি বুকের উপর রাখিয়া, উহার দিকে চাহিয়া চাহিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩০৬ সনের চৈত্রমাসে ৬২।৬৩ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

অধর চন্দ্র সেন

(১৮৮৩—মার্চ্চ)

শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র সেন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল কলিকাতার শোভাবাজার বেনেটোলায়। পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া, তিনি এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া

তাঁহাকে দর্শন করিলেন। ইহার পর, পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট যাতায়াতের ফলে, অধরচন্দ্র ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিলেন। আফিসের কর্ম্ম শেষ করিয়া, তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন। এইরূপে কেবলমাত্র পরমহংসদেবকে একবার দর্শন করিবার জন্য, প্রতিদিন তাঁহার প্রায় দুই টাকা গাড়ীভাড়া খরচ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণও অধর বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার উপদেশে, শ্রীযুক্ত অধর দিন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এক দিবস অধর বাবু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার জনৈক বন্ধুর পুত্রশোকের কথা পরমহংসদেবকে নিবেদন করিলে, তিনি প্রথমে আপন মনে 'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে' এই গানটী গাহিলেন; তারপর পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতি স্বজন-বিয়োগে শোক হওয়াটা যে কত স্বাভাবিক, সেই কথা বলিতে বলিতে, সংসারে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, গৃহ, ধন ইত্যাদি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখদায়ক এবং ঈশ্বর-লাভেই পরম শান্তি, ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি অধরকে পুনরায় বলিলেন, "তুমি যে ডিপুটী হয়েছ, নিশ্চয় জেনো, এও তাঁরই অনুগ্রহ। তাঁকে কখনও ভুলে যেও না। জেনে রেখো, সকলেরই এক পথে যেতে হবে। এখানে মাত্র দু'দিনের জন্য আসা। এ যেন আমাদের কর্ম্মস্থল, এ যেন বাড়ী থেকে এসে কলকাতায় কর্ম্ম করা"।

শ্রীযুক্ত অধর প্রায়ই পরমহংসদেবকে ভক্তগণসহ আপন বাড়ীতে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার মুখ হইতে মধুর ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। পরমহংসদেবের উপস্থিতিতে, তাঁহার বাড়ীতে উৎসবের ধূম পড়িয়া যাইত। পাড়ার লোকেরাও আসিয়া সেখানে জুটিত। আবার, শ্রীযুক্ত অধরের গণ্য-মান্য বন্ধুগণও, কখন কখন এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনান্তে, অধর সকলকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণকে পাইলে, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। পরমহংসদেব দীর্ঘকাল তাঁহার বাড়ীতে আগমন না করিলে, তিনি তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার ভক্তিতে পরমহংসদেবও সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। অধরের বাড়ীতে এক দিবস বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিম বাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

একবার অধর বাবু কয়েক দিন পরমহংসদেবের নিকট যাইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি অনেকগুলি সভা-সমিতির কাজে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর, তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "কিগো, মিটিং, স্কুল এ-সব নিয়ে এতদিন ভুলে ছিলে বুঝি"। অধর বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, সব চাপা পড়ে গিছ্‌লো, ক'দিন আসতে পারিনি"। ইহার কিছুক্ষণ পরে, পরমহংসদেব অধরকে বলিয়াছিলেন, "দেখ,

প্রাণ-মন এক করে, তাঁর আরাধনা করা উচিত। শরীরের কি কিছু ঠিক আছে ?—এই আছে, এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়"।

ডিপুটী হইয়াও, অধর বাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি একবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যানের কার্য্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও, ঐ পদ লাভ করিতে পারিলেন না। এই প্রসঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, নিবৃত্তিই ভাল ; ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, আর যা কিছু সবই অবস্তু। পরমহংসদেব প্রথমে বলিলেন, "এখানে এত আসা-যাওয়া, এত ত্যাগের কথা শোনা, তবু তোমার বাসনার নিবৃত্তি নাই। তিনশ' টাকা মাইনে, এই-বা ক'জনের আছে। তাতেও নিবৃত্তি নাই ; হাজার টাকার জন্য লালায়িত। একটা চাকুরীর জন্য, কেন মিছেমিছি এই হীন-বুদ্ধি লোকগুলির কাছে এত দৌড়াদৌড়ি করলে ? এত দেখে শুনেও তোমার এই হয়েছে ? সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যে ?"

কাহাকে কি ভাবে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ মনে আপনা হইতেই উদিত হইত এবং তিনি লোককে সেই ভাবেই উপদেশ দিতেন। অধরকেও তিনি জীবন অনিত্য, কখন কি হয় বলা যায় না, সময় থাকিতে ভগবান্‌কে ডাকা উচিত, এইরূপ কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। অধর কিন্তু সকল সময়ে এই কথাগুলির অর্থ গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিতেন

না; বরং কখন কখন তিনি প্রবৃত্তির বশে বলিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ পরম বৈষ্ণবগণের জীবনেও ত ত্যাগের সহিত ভোগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যানিধি গলা পর্য্যন্ত প্রেমের সুরা-পান করেছিলেন; আর এক গ্রাস খেলেই মাতাল হয়ে যেতেন"।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অধরের জিহ্বাগ্রে কি একটী মন্ত্র লিখিয়া, তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। তাঁহার কৃপায়, অধর নানা দিব্য দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব অধরকে ঘোড়ায় চড়িতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু অধর কার্য্যানুরোধে ঘোড়ায় চড়া ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহার জীবৎকালেই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, এক দিবস ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া, অধরের শরীর-ত্যাগ হয়। শুনা যায়, তিনি দিব্য ভাবের আবেশে ঘোড়ার উপর হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কেন অধরকে ঘোড়ায় চড়িতে বারণ করিয়াছিলেন এবং কেনই বা তিনি নিত্য তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, অধরের দেহত্যাগে ভক্তগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অধরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, রামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ বালকের ন্যায় মায়ের নিকট কাঁদিয়াছিলেন।

শরৎ চন্দ্র ও শশীভূষণ

(১৮৮৩—অক্টোবর)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের নাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে চির-পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের পূর্ব্ব-নাম ছিল শশীভূষণ ও শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত শশী ও শরৎ এক পরিবারের ছেলে; শরৎ, শশীর খুল্লতাতপুত্র। কলিকাতা হ্যারিসন্ রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে ইঁহাদের বাস ছিল। যুবকদ্বয়ের অন্তরে শুভ-সংস্কার ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রবল থাকায়, বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা পূজা, সদ্গ্রন্থপাঠ ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। শশী ও শরৎ যখন হাইস্কুলে পড়েন, সেই সময়ে কেশব বাবুর ধর্ম্ম প্রচারের ফলে, উত্তর ভারতের অনেক স্থানে এবং কলিকাতার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, পল্লীতে পল্লীতে, শিক্ষিত যুবকগণ সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছিল। শশী এবং শরৎও উহার প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। যৌবনে পদার্পণ করিয়া, তাঁহারা উভয়েই ঐরূপ একটী ব্রাহ্ম-সমিতিতে যোগদান করিলেন। একবার কেশব বাবুর সমাজ-গৃহে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ঈশ্বরীয় কথা ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদের সমিতির কয়েকটী যুবক পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সমিতির বাৎসরিক উৎসবের দিনে তাঁহারা সমবেত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করিবে। সমিতির ঐ উৎসব উপলক্ষে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের

অক্টোবর মাসের কোন এক দিবস ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলে, পরমহংসদেবের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়।

শশী ও শরৎ বন্ধুগণ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের পরিচয় লইলেন এবং তাঁহারা কেশব বাবুর সমাজে যাতায়াত করেন জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক, যাহাতে যুবকগণ আসন্ন জীবন-সংগ্রামে অন্ততঃ কতকটা জয়ী হইতে পারে, একেবারে মোহ-গর্ত্তে ডুবিয়া না যায়, তজ্জন্য পরমহংসদেব তাহাদিগকে নানা ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্‌তে হয়, তা না হলে আটায় হাত জড়িয়ে যায়। চারা গাছে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নইলে ছাগল গরুতে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। আবার ইট বা টালীতে কাঁচা অবস্থায় যে ছাপ দিয়ে দেয়, পোড়াবার পর তা আর মুছে যায় না। তেমনি যদি তোমরা ভগবানে ভক্তি লাভ করে সংসারে প্রবেশ কর, তবে আর সংসার তোমাদিগকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারবে না। এখনকার বাপ-মা ছেলেদের কচি বয়সেই বিয়ে করিয়ে দেয় ; তাতে এদের সর্ব্বনাশ হয়। কলেজে থাকতে থাকতেই, ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে যায়। আর কলেজ থেকে বেরুতেই, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' তাদেরে বুদ্ধিহারা করে। তারা পেটের দায়ে, টাকার জন্য চার দিকে ছুটাছুটি করে। অনেক কষ্টে হয়ত বা ত্রিশ চল্লিশ টাকার চাকুরী যোগাড় হল। তারপর অভাবের তাড়নায়, পরিবার পোষণের চিন্তায় জীবনপাত"।

বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি, উপস্থিত যুবকগণের কাহারও কাহারও মনঃপূত হইল না। তাহাদের মধ্যে দুই একজন ইহার প্রতিবাদ করিতেও ছাড়িল না। সে যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি কিন্তু, শরৎ ও শশীর প্রাণে বেশ একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার করিল। কিন্তু, তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ মনোভাব গোপন রাখিয়া, তাঁহাদের অবসর মত পৃথক্ ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অবশ্য, তাঁহাদের মনোভাব পরস্পারের নিকট দীর্ঘকাল গোপন রহিল না। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে, শরৎ ও শশীর চরিত্রের উপর এই ভাবময় পুরুষের প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অবস্থান কালে, শ্রীযুক্ত শশী বি, এ এবং শরৎ মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিলেন। ঐকালে, নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য যুবকগণের ন্যায়, তাঁহারাও শ্রীগুরুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, পরমহংসদেবের শরীর-ত্যাগের পর, শশী ও শরৎ বরাহনগর মঠে যোগদান করিয়া, তপস্যায় রত হন। বিরজা-হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পর, শশীর নাম হইল 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' ; আর শরৎ হইলেন 'স্বামী সারদানন্দ'। বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পত্তন হইলে, মঠের গুরু-ভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-বশে, দূরবর্ত্তী তীর্থ সমূহ ভ্রমণ ও তপস্যায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্থিরভাবে দশ বৎসরের অধিক কাল মঠে অবস্থান করিয়া, শত অভাব অনটনের মধ্যেও

একান্ত নিষ্ঠার সহিত, নিত্য শ্রীগুরুর দেহাবশেষ ও প্রতিকৃতির সেবা ও পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐকালে, তিনিই মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। একমাত্র তাঁহার অদম্য উৎসাহেই, নিত্যপূজা ও মঠের ভাইদের আহারাদি নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্ম্মমত প্রচার এবং আর্ত্ত ও পতিতের সেবার নিমিত্ত, তাঁহার গুরুভ্রাতাদের অনেককেই ভারতের স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মঠ ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে গমন করেন এবং সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর সেখানেই বাস করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে, গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে চিকিৎসার্থ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই, ২১শে আগষ্ট বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, সমাধিযোগে তাঁহার শরীর-ত্যাগ হয়।

এদিকে স্বামী সারদানন্দ, প্রায় দশ বৎসর কাল তীর্থে তীর্থে ও নির্জ্জনে তপস্যার পর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে, ইংলণ্ড হইয়া আমেরিকা গমন করেন। সেখানে দুই বৎসর বেদান্ত প্রচার করিয়া, তিনি স্বামিজীর আদেশে পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিলে, স্বামিজী তাঁহার হস্তে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও প্রচার-কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বামী সারদানন্দ অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত জীবনের শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল, মিশনের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র (১৮ আগষ্ট,১৯২৭) নিশাযোগে মহাপ্রয়াণ করেন।

শ্রীমৎ সারদানন্দের প্রকৃতি এত গম্ভীর ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে, স্বতঃই হিমাচলের মহান্ ও শান্ত ভাব এবং অতলস্পর্শ সমুদ্রের কথা দর্শকের মনে উদিত হইত। তিনি যে কেবল একজন উন্নত মহাপুরুষ এবং অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তিনি একজন সুলেখক এবং সুবক্তাও ছিলেন। অবিরাম কর্ম্মের মধ্যেও, তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে, রামকৃষ্ণ-জীবনের যে সুগভীর চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। পাপী-তাপী এবং অসমর্থের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও অম্লান বদনে সাহায্য, এখনও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের হৃদয়ে, তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর, স্বামী যোগানন্দ শ্রীমায়ের সেবার ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার দেহান্ত হইলে, স্বামী সারদানন্দ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমার অদর্শনে ভক্তগণ শোকে মুহ্যমান হইলে, তিনি তাঁহার অমায়িক ভালবাসা দ্বারা তাঁহাদের প্রাণে শান্তি দান করিয়া, মায়ের অভাব-জনিত দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ বাল্যকাল হইতেই শান্ত-প্রকৃতি, পরদুঃখ-কাতর ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি অন্তরে

কত উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ পোষণ করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত কথা হইতে বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। একবার পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে চাও ?" ইহার উত্তরে শরৎ বলিয়াছিলেন, "আমি ভগবান্‌কে কোন নির্দ্দিষ্ট রূপে দর্শন করিতে চাই না। সর্ব্বভূতে তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিব, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "এ-ত শেষ কথা ; সাধক জীবনের পরিণতি"। শরৎ পুনরায় বলিলেন, "ঐ অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত, আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিব না"।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

(১৮৮৩ শেষ)

বেলঘরিয়ার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরতের (স্বামী সারদানন্দ) সমপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কোনও সময়ে, হরিপ্রসন্ন বন্ধুদ্বয়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। একদিন পরমহংসদেব কথাপ্রসঙ্গে হরিপ্রসন্নকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েমানুষ যদি খাঁটি সোণা হয়, যদি ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তাদের দিকে তাকান ভাল নয়"। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া, বালকের

ত্যাগের ভাব পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু, কয়েক দিন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিবার পরেই, তিনি নানা কারণাধীন আর দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের এগার বার বৎসর পরে, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া, 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে অভিহিত হইলেন। তখন মঠ বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল এবং স্বামিজী প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া, বর্ত্তমান বেলুড় মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইতে ছিলেন মাত্র। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া, কিছুকাল সরকারী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কারণে, তাঁহার তত্ত্বাবধানেই মঠবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। চাকুরী-জীবনে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিলেও, তিনি শরৎ, শশী প্রমুখ বন্ধুগণ হইতে কোন কালেই একেবারে বিচ্ছিন্ন হন নাই। মঠ যখন আলমবাজারে অবস্থিত, সেই সময়ে স্বামী সুবোধানন্দের মুখে মঠের অভাবের কথা শুনিয়া, তিনি কয়েক মাস নিয়মিত ভাবে, মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা করিয়া মঠে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী, রামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় সঙ্ঘগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সঙ্ঘের অধিনায়ক পদে বৃত হইয়াছেন।

কালীপ্রসাদ চন্দ্র

(১৮৮৩ শেষ)

পণ্ডিত ও বাগ্মী হিসাবে স্বামী অভেদানন্দকে অনেকেই জানেন। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদের পিতা আহিরীটোলার নিমুগোস্বামী লেনে বাস করিয়া, কলিকাতার কোন স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার জননী মা কালীর প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন কালীপ্রসাদ। কালী স্কুলে পাঠ্যাবস্থায়ই সংস্কৃত ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ঐ কালেই তিনি ভট্টী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য, গীতা, পাতঞ্জল দর্শন এবং শিবসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অত্যন্ত প্রীতি ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ, বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার অন্তরে জ্ঞান-পিপাসা ও যোগ-সাধনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সতর বৎসর বয়সে যখন কালী বুঝিতে পারিলেন, উপযুক্ত গুরু বিনা যোগ-সাধন অসম্ভব, তখন তিনি সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে, দক্ষিণেশ্বরের যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা জানিতে পারিলেন। ক্রমে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, যুবকের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, এক রবিবারে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কালী দক্ষিণেশ্বরের পথ জানিতেন না; ঐ স্থান কতদূর তাহাও যুবকের জানা ছিল না। আবার

এই সম্বন্ধে কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। তজ্জন্য, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সেখানে পোঁছিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

ঐ দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার রাত্রিতে ফিরিবার কথা ছিল। কালী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি তিনি অবিলম্বে কালীমন্দিরের নিকটে যাইয়া, পরমহংস মহাশয়ের খোঁজ লইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি এবং রাত্রতে ফিরিবার কথা যেন, কালীর মস্তকে বজ্রাঘাত করিল। একে শ্রান্ত ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, তদুপরি পাথেয় একটী পয়সাও সঙ্গে নাই; আর ওখানে স্নানাহারের সম্ভাবনাই বা কোথায়? আবার বাড়ীতে পিতামাতাকে কিছু বলিয়া আসেন নাই। যুবক হতাশ হইয়া, মন্দিরের বারান্দায় সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে, অপর একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংসদেব আছেন কি?" কালী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। যুবকের নাম শশী। তিনি কালীপ্রসাদকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া, কালী-মন্দিরের প্রসাদ পাইলেন। তৎপর, কালী ও শশী নানা বিষয় আলাপে সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলেন। রাত্রি নয়টার পর, শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। কালী তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সেখানে রাত্রিবাস করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে, কালী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যোগ-সাধনের কৌশল জানিতে চাহিলে, তিনি যুবককে উত্তরের

বারান্দায় লইয়া যাইয়া একখানা খাটের উপর বসাইলেন এবং নিজ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বাগ্রে কিছু লিখিয়া দিয়া, বক্ষে হস্ত প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে কালী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং শীঘ্রই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা-হীন দেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হইল। অল্পক্ষণ পরে, শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় কালীর বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া, তাঁহার অসাড় দেহে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে যোগ সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদে, কালীর হৃদয়ে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল। যুবক তাঁহার প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কালী ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শাস্ত্র-পাঠ, ধ্যান-ধারণা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে, ধ্যানকালে তিনি কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিতেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই, শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে বলিয়াছিলেন, "তুই পূর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলি"। আবার যুবককে দেখিলে, অনেক সময়ে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপনা হইত এবং তিনি আপনাকে শ্রীমতী রাধা বলিয়া মনে করিতেন। পরমহংসদেবের শেষ অসুখের সময়, কালীও গুরুদেবের শ্রীচরণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর, তিনি বাড়ীর সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, গুরুভ্রাতাদিগের সহিত বরাহ-নগর মঠে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি আপন গৃহদ্বার

রুদ্ধ করিয়া, স্বাধ্যায় ও তপস্যায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। তজ্জন্য মঠের ভাইগণ, তাঁহার ঘরটীকে 'কালী তপস্বীর ঘর' বলিত। প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান দিনরাত পাঠ করিতেন। অতঃপর কালী কৌপীন, বহির্ব্বাস ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া, শ্রীযুক্ত রাখাল, তারক, হরিনাথ, গঙ্গাধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদিগের ন্যায় পদব্রজে কাশী, এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করেন। ইহার পর, তিনি তাঁহাদেরই ন্যায় পুনরায় দ্বারকা, প্রভাস, কাঞ্চী, রামেশ্বর প্রভৃতি মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্যভারত অঞ্চলে, স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার দুইবার সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীযুক্ত কালী বাবুরামের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। বাবুরামকে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়া, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণের পর, কালী 'স্বামী অভেদানন্দ' নামে ভূষিত হইলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তাঁহার সহিত তিন মাস ও তৎপর আরও নয় মাস লণ্ডনে বেদান্তের অমোঘ বাণী প্রচার করিয়া আমেরিকা গমন করেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে প্রায় পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচার করিয়া, স্বামী অভেদানন্দ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদেশে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি আর সে দেশে গমন করেন নাই। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর

আমেরিকা বাসের মধ্যে, তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একবার মাত্র এদেশে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ক্রমাগত সাত মাস কাল তিনি সিংহল ও ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি পুনরায় লণ্ডন হইয়া আমেরিকার কর্ম্মস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া, স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একবার কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ মাস কাল বরফাবৃত তিব্বত দেশ ভ্রমণের পর, তিনি সুস্থ শরীরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছু কাল পরে, তিনি 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী' নামক একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্ত প্রচার করিতে থাকেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন।

দুর্গাচরণ নাগ

(১৮৮৩—৮৪)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ-মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"। আর শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ বলিতেন, "নাগ-মহাশয়কে বাঁধতে যেয়ে, মহামায়া বিপদে পড়েছেন। তিনি এত ছোট হয়ে যান যে, মহামায়া তাঁকে বাঁধতেই পারেন না"। বাস্তবিকই নাগ-মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ যুগ-যুগান্তরে ক্বচিৎ দুই একজন দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণের মধ্যে ইনি শীর্ষস্থানীয়।

গৃহী হইলেও, নাগ-মহাশয় সাধারণ সন্ন্যাসীরও অধিক ত্যাগী ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ। ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে মাতৃবিয়োগ ঘটায়, তাঁহার পিসীমাতা তাঁহাকে লালন পালন করেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত দুর্গাচরণ অতিশয় সুশীল, বিনীত ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার সত্য ও ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং প্রবল জ্ঞান-পিপাসা ছিল। ঢাকা সহর দেওভোগ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিদ্যার্জ্জনে অনুরাগ বশতঃ, বালক দুর্গাচরণ এক দিবস পিসীমাতার অজ্ঞাতসারেই ঢাকা গমন করিয়া, একটী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং পরদিন হইতে নিয়মিতভাবে স্কুলে যাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, ঢাকা যাতায়াতে প্রতিদিন তাঁহার দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইত। ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্র সমান-ভাবে মাথায় করিয়া, তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল এই স্কুলে যাতায়াত ও পাঠ করিয়াছিলেন। এই দেড় বৎসরের মধ্যে, তিনি মাত্র দুই দিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন।

নাগ-মহাশয়ের পিতা শ্রীযুত দীনদয়াল দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় কুমারটুলী পল্লীর এক গদিতে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। দুর্গাচরণ কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই, বালকের পিসীমাতার আগ্রহে, দীনদয়াল তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। কিন্তু দুর্গাচরণ স্বাভাবিক বৈরাগ্য বশতঃ, পত্নীকে কালসাপের মত ভয় করিতেন এবং

দূরে সরিয়া থাকিতেন। বিবাহের পাঁচ মাস পরেই, তিনি ডাক্তারি পড়িবার জন্য কলিকাতায় পিতার নিকট চলিয়া গেলেন। প্রায় দেড় বৎসর ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, দুর্গাচরণ পুনরায় ডাক্তার ভাদুড়ীর নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে তাঁহার পত্নী দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এখন আর তাঁহার সংসারের বন্ধন-ভয় রহিল না।

ইতিমধ্যেই দুর্গাচরণ হোমিওপ্যাথিতে বেশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি গরীব-দুঃখীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাহাদের ভরসা-স্থল হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে, নাগ-মহাশয়ের একটী বন্ধু জুটিল। বন্ধু সুরেশ চন্দ্র দত্ত, কেশব বাবুর ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সহিত সমাজে যাইয়া, নাগ-মহাশয় মধ্যে মধ্যে কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতেন। আবার জনৈক বৃদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর উপদেশে, তিনি গভীর রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরের শ্মশানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। এইরূপে ধ্যানাভ্যাসের ফলে, তিনি এক দিন একটা শুভ্র জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীযুক্ত দীনদয়াল পুত্রের উদাস-ভাব লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং দেশে পত্র লিখিয়া, অবিলম্বে তাঁহার বিবাহ স্থির করিলেন। এই সংবাদে নাগ-মহাশয় যন্ত্রণায় অধীর হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মভীরু দুর্গাচরণের পক্ষে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা সম্ভব হইল না। সুতরাং বিবাহকে

বিষবৎ বোধ করিলেও, তিনি পিতার আদেশে পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহিত হইলেও, তাঁহার জীবনে কখনও পত্নীর সহিত কোনরূপ দেহসম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয়বার বিবাহের পর, নাগ-মহাশয় কলিকাতা ফিরিয়া ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ না থাকায়, তাঁহার ব্যবসা অনেকটা পরোপকার-ব্রতে পরিণত হইল। তিনি নিজ ব্যয়ে দরিদ্র রোগীদিগের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। আবার কাহারও শীতবস্ত্রাদির অভাব দেখিলে, আপন অঙ্গ হইতে জামা-চাদর খুলিয়া, তাঁহাকে দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীযুক্ত দীনদয়াল পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে অনেক সময়েই অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং তাঁহাকে গালাগালি করিতেন; কিন্তু তাহাতেও নাগ-মহাশয়ের আচরণে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গেই নাগ-মহাশয় অনবরত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। ফলে, তিনি অনুক্ষণ ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন, ভগবানের কৃপা-লাভ সুসাধ্য হয় না জানিতে পারিয়া, এইকালে তিনি গুরু-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ঘটনাক্রমে, শীঘ্রই তাঁহাদের কুলগুরু পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী শক্তিসাধক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ভগবানের দর্শন লাভের নিমিত্ত নাগ-মহাশয়ের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি দিবসে আপন কর্ম্ম ও পাঠে ব্যস্ত থাকিতেন এবং সমস্ত রাত্রি

গঙ্গাতীরের শ্মশানে জপধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। একদা তিনি সুরেশ বাবুর নিকট, পরমহংসদেবের কথা জানিতে পারিয়া, অবিলম্বে বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন। তখন চৈত্র মাস; বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বন্ধুদ্বয় দক্ষিণেশ্বরের পথ জানিতেন না; তাই রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরবাটীর সুন্দর সংস্থান শীঘ্রই তাঁহাদের শ্রান্তি হরণ করিল। সেখানে সংসারের কোলাহল নাই। উদ্যানের বৃক্ষলতা মৃদুমন্দ সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত। আর সমগ্র উদ্যানখানি পুষ্পের সৌরভে ভরপূর। চারিদিকেই সুচারু দৃশ্য, তদুপরি গঙ্গার কুলু কুলু প্রবাহ; যেন 'দেবগণের নিভৃত লীলাভূমি', সংসার-দাবদগ্ধ পথিকের জুড়াইবার স্থান। নাগ-মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু পরমহংসদেবের গৃহে যাইয়া, কিছুক্ষণ তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ও উপদেশামৃত পান করিলেন। তৎপর তাঁহারই আদেশে, পঞ্চবটীতে কিঞ্চিৎ ধ্যান ও মন্দিরাদি দর্শন করিয়া, তাঁহারা কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। বিদায় কালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আবার এসো, এলে গেলেই ত আমাদের মধ্যে পরিচয় হয়"।

পরমহংসদেবের আকর্ষণে নাগ-মহাশয় ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কখন কখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। নাগ-মহাশয় এতকাল যে আধ্যাত্মিক ভাব সমুহ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের

উপদেশ ও সঙ্গগুণে, তাহা অল্পকালে এবং অনায়াসে লাভ করিলেন। ক্রমে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও ইষ্টের আসন অধিকার করিলেন। তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চারের ফলে, একদিন নাগ-মহাশয় সংসার ত্যাগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে, পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবানে মন থাকলেই হল। গৃহে থাকলেও তোমাকে দোষ স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে"। শ্রীরামকৃষ্ণ নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার বন্ধু সুরেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "দেখেছিস, এ লোকটা যেন আগুন; জ্বলন্ত আগুন"। পরমহংসদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নাগ-মহাশয় গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শুনিতে পাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও ভক্তকে বলিতেছেন, "দেখ, ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, দালাল, এদের ঠিক ঠিক ধর্ম্ম লাভ করা বড় কঠিন"। তিনি আবার ডাক্তারদিগের বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিলেন, "এতটুকু ঔষধে মন পড়ে থাকলে, কি করে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারে"। বাস্তবিক, অনেক সময়ে রোগীদের মূর্ত্তি ধ্যানপথে উদিত হইয়া, নাগ-মহাশয়ের ইষ্টচিন্তার ব্যাঘাত ঘটাইত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যে বৃত্তি ঈশ্বর লাভের পথে প্রবল অন্তরায়, তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে প্রয়োজন কি?" ঐ দিনই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া, ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তকাদি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিলেন।

নাগ-মহাশয় অত্যন্ত কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি বার মাস একখানা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া রাখিতেন এবং সকল সময়েই নগ্নপদে চলিতেন। শেষকাল পর্য্যন্তও, তিনি বাড়ীতে চাকর রাখিতে দেন নাই; নিজেই বাজার হইতে অথবা যখন যেভাবে প্রয়োজন, সমস্ত মোট মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেন। কখন নৌকায় উঠিলে, তিনি মাঝিকে নৌকা বাহিতে দিতেন না; নিজেই ঐ কার্য্য করিতেন। জিহ্বার সুখ-লিপ্সা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া, নাগ-মহাশয় কখনও পাতে লবণ লইতেন না বা স্বাদু বস্তু ভক্ষণ করিতেন না। শ্রীরাম-কৃষ্ণের আদেশে তিনি গৃহবাসী হইলেও, তাঁহার অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনাকে দীনের দীন, হীনেরও হীন বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং সকল সময়েই করজোড়ে, জীবরূপী নারায়ণের সেবা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। 'তৃণাদপি সুনীচেন' কথাটী যেন তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'সর্ব্বদা জোড় হাত করিয়া থাকেন কেন', এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এক ভগবান্‌ই সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন; ভূতে ভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই"। জড় ও স্থাবর পদার্থ নিচয়ের মধ্যেও, তিনি চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ একটী গাছের পাতা ছিঁড়িলেও তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। একদা জনৈক ভক্তকে একটী আম্রপত্র ছিন্ন করিতে দেখিয়া, তিনি সমবেদনায় বলিয়াছিলেন, "আহা! এদেরও ত সুখদুঃখ বোধ

আছে"। নাগ-মহাশয়ের অতিমানব আচরণ সমূহ লক্ষ্য করিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিত। মশা, মাছি, পিপীলিকা ও উইপোকা মারা দূরের কথা, তিনি ছারপোকাদিগকে সযত্নে আপনার বিছানায় স্থান দিতেন। আবার কখন কখন ঝুড়িশুদ্ধ জীবিত মৎস্য ক্রয় করিয়া জলে ছাড়িয়া দিতেন। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত ছিল না।

যাঁহারা নাগ-মহাশয়ের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। অতি দীন-ভাবাপন্ন হইলেও, তিনি স্থল-বিশেষে পুরুষসিংহের ন্যায় আচরণ করিতেন। অন্যায় কার্য্যের প্রতি নাগ-মহাশয় সর্ব্বদা খড়গ-হস্ত ছিলেন এবং প্রয়োজনানুসারে উহার প্রতীকার করিতেও ছাড়িতেন না। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাদিগের নিন্দা করিয়া, কেহই তাঁহার নিকট অব্যাহতি পাইত না। স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য, স্বামিশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নাগ-মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করেন জানিতে পারিয়া, স্বামিজী নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার নিকট মহাকবি কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলার এই পঙ্ক্তিটী উল্লেখ করিয়াছিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতা মধুকর ত্বং খলু কৃতী"। অর্থাৎ তত্ত্বান্বেষণ করিতে করিতে, আমাদের জীবন বৃথায় চলিয়া গেল। আমাদিগের মধ্যে একমাত্র নাগ-মহাশয়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃতী সন্তান এবং তাঁহাকে যথার্থ জানিতে পারিয়াছেন। নাগ-মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার সম্বন্ধে

বলিতেন, "তাঁহার শরীরে কি মনে কখন কোনরূপ মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই; 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া, তিনি জৈব-ভাবের মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি দিনেকের তরেও তাঁহার শরীর দগ্ধ হয় নাই"। পাঠক ইঁহার বিস্তৃত জীবন-কথা শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'সাধু নাগ-মহাশয়' পাঠে অবগত হইতে পারেন।

১৩০৬ সালের ১৩ই পৌষ বুধবার ৫৪ বৎসর বয়সে নিজ বাটী দেওভোগ গ্রামে নাগ-মহাশয়ের শরীর-ত্যাগ হয়।

সুরেশ চন্দ্র দত্ত

(১৮৮৩—৮৪)

নাগ-মহাশয়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু, কলিকাতায় হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের পূর্ব্বে, সুরেশ বাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের সমাজে যাতায়াত করিতেন। সুরেশ দেবদেবী মানিতেন না; কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। আর নাগ-মহাশয় দেব-দেবী ও ব্রহ্ম দুই-ই মানিতেন। তাঁহার মত ছিল, ব্রহ্মজ্ঞান জীবের চরম লক্ষ্য হইলেও সহজ-সাধ্য নয়; জন্ম-জন্মান্তরের অভ্যাস, সুকৃতি ও তপস্যার ফলে, মানব উহা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দেবদেবীর চিন্তা দ্বারা ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া, অনভ্যস্ত মনের পক্ষে

সুসাধ্য। এই বিষয় লইয়া, অনেক সময়ই বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ঘোর তর্ক হইত। কিন্তু কখনও এই কথার মীমাংসা হইত না। সুরেশ বাবু নিত্যই নাগ-মহাশয়ের বাসায় আসিতেন এবং দুই বন্ধুতে মিলিয়া, কখন বাসায়, আবার কখন বা গঙ্গাতীরে যাইয়া, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, উপাসনা ও কীর্ত্তন করিতেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর, নাগমহাশয় দিনরাত জপধ্যান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, তখনও তিনি ভগবানের কোন রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। একদিন তিনি বন্ধুকে বলিলেন, "কেবল কথায় কথায় জীবন ত চলিয়া যাইতেছে; কিছু প্রত্যক্ষ না হইলে, জীবন ধারণ করা নিষ্ফল হইল।" ইতিমধ্যে, সুরেশ বাবু কেশব চন্দ্রের সমাজে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ও তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধির কথা শুনিতে পাইলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া নাগ-মহাশয়কে বলিলেন, "ওহে, দক্ষিণেশ্বরে একজন খুব ভাল সাধু আছেন, পরমহংস। তাঁকে দেখতে যাবে কি?" পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য নাগ-মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ জন্মিল এবং তিনি বন্ধুকে লইয়া, ঐ দিবসই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন।

নাগ-মহাশয়ের ন্যায় সুরেশ বাবুও শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহার উপদেশ ও সঙ্গগুণে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে, তিনি ভগবানের সাকার রূপ সমূহেও বিশ্বাসবান্ হইলেন। ফলে, বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যে মতভেদ ছিল, তাহা দূর হইল। নাগ-মহাশয়ের সহিত একসঙ্গে আট নয় বার

দক্ষিণেশ্বর গমনের পর, সুরেশ কার্য্যোপলক্ষে কোয়েটা চলিয়া যান। দেহত্যাগের পূর্ব্বে যখন পরমহংসদেব অসুস্থ হইয়া কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সুরেশ বাবু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, পুনরায় কলিকাতা আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, সুরেশ বাবু 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নাম দিয়া, তাঁহার উপদেশাবলী পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন। ইহাই পরমহংসদেব সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক। সুরেশ চন্দ্র দত্ত কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ'ই ঐ পুস্তকের মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১৮৮৪ প্রারম্ভ)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতায় জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া, কোন এক জমিদার সরকারে কাজ করিতেন। ভগবান্ বাস্তবিকই আছেন কিনা, এই বিষয়ে সর্ব্বদাই দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন উঠিত। একদিন ব্রাহ্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথের জীবন-কাহিনীতে, ঈশ্বরের কৃপা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী ঘটনা পাঠ করিয়া, তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্ হইলেন এবং উপযুক্ত গুরুলাভের নিমিত্ত, তাঁহার নিকট ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়, তিনি প্রথমতঃ কেশব বাবুর

সমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তাঁহার বেশ ভাল লাগিত। কিন্তু সেখানে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাইলেন না। এদিকে দিনের পর দিন, তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি বাড়িতে লাগিল। এমন কি, কোন কোন দিন তিনি সদ্‌গুরু ও ঈশ্বরলাভের চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিতেন, "হে ভগবান্, তুমি আছ, তবু তোমার দেখা পাই না কেন?" অবশেষে কাল্‌নার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবান্ দাস বাবাজীর কথা জানিতে পারিয়া, দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, কাল্‌না যাইয়া তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। একদিন সকাল বেলা, তিনি কাল্‌না গমন উদ্দেশ্যে ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, ষ্টীমার ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, অস্থির-চিত্ত দেবেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ মনে এক বন্ধুর বাটী গমন করিলেন। বন্ধুটী বাড়ীতে ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ অন্যমনে 'ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা' নামক একখানা বহি নাড়িতে লাগিলেন এবং হঠাৎ উহার ৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই কথাগুলি লিখা আছে দেখিতে পাইলেন, "পরমহংস রামকৃষ্ণ এই নিত্য এবং লীলা অর্থাৎ নির্গুণ এবং সগুণ অবস্থার সঙ্গে জল আর বরফের তুলনা দিতেন। জল অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম, অবতার তাঁহার ঘনীভূত এক এক খণ্ড বরফ সদৃশ। মূল পদার্থ অখণ্ড জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।" সহসা এই কথা কয়টী দেবেন্দ্রনাথের হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিল। তিনি ভাবিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস

হয়তো আমাকে ভগবানের সন্ধান দিতে পারিবেন"। পরমহংস রামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন, তাহা তিনি জানিতেন না। বাসায় ফিরিবার সময়, জনৈক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী-বাটীতে বাস করেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সেই দিনই যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন। দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন, দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার অতি নিকটে ; কিন্তু স্থানটী কোথায়, সেই সম্বন্ধে তাঁহার ঠিক ধারণা ছিল না। এই নিমিত্ত, তিনি পথের সন্ধান লইয়া, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। জটা-বল্কল-বিহীন পরমহংসের বেশ-ভূষা অপর সাধারণ মানবের ন্যায় হইলেও, দেবেন্দ্র অল্পক্ষণেই পরম-হংসদেবের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। প্রথমতঃ, পরমহংসদেব অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এমনি এমনি (বংশীধারী) ঠাকুর দেখতে এসেছ ?" বংশীধারী ঠাকুর অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিগ্রহ। তারপর তিনি বালকের ন্যায়, তাঁহার সহিত আরও কত কথা বলিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে সমাধি অবস্থায় পড়িয়া যাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ভাঙ্গা হাতখানা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। দেখ দেখি, হাড় ভেঙ্গেছে নাকি, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে"। আবার, পর মুহূর্ত্তেই, তিনি কচি বালকের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, আমার হাতটা কি সারবে ?" দেবেন্দ্রও হাতখানা

দেখিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, "হাঁ, সারবে বৈ কি, সেরে যাবে"। ইহার পর, পরমহংসদেব দেবেন্দ্র ও উপস্থিত ভক্তগণকে ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, প্রেমের উদয় হলে, ভগবানের নামে জগৎ ভুল হয়ে যায় ; ভক্ত আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়। ঝড় উঠ্‌লে, কোন্‌টা কি গাছ তা চেনা যায় না ; সব গাছই এক রকম দেখায়। তেমনি প্রেমের অবস্থা এলে, ভেদবুদ্ধি লোপ পায়"।

অনন্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন বাড়ী যেয়ে আর কাজ নাই। তুমি এখানেই প্রসাদ পাও। কোন সঙ্কোচ বোধ করো না। এখানে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণও প্রসাদ পান। ঠাকুরবাড়ী, সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই"। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "ওরে রামলাল, একে বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ দিস"। দেবেন্দ্র নিরামিষাশী ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার জন্য বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন দেখিয়া, তিনি যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অধিক জানিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ জন্মিল এবং শ্রীযুক্ত রামলালের সহিত আলাপ করিয়া, তিনি অনেক কথা জানিতে পারিলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর, দেবেন্দ্র একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার মন রামকৃষ্ণ-চিন্তায় ভরপূর ছিল। হরীশ প্রভৃতি ভক্তগণের শান্ত স্বভাব ও সরল ব্যবহার, তাঁহার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

তাই তাঁহার পক্ষে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। তিনি পুনরায় পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, দেবেন্দ্র একবার অনেক দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। অদ্য ম্যালেরিয়া তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করিল। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় তিনি এরূপ তন্ময় হইয়া ছিলেন যে, শরীরের দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ? কোন অসুখ করেছে কি ?" এই কথায়, শরীরের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ শরীরটা খুব খারাপ বোধ হচ্ছে। পাঁজরাটায় একটা ব্যথা হচ্ছে ; বোধ হয় একটু জ্বরও এসে গেছে"। পরমহংসদেব পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাঝে মাঝে জ্বর হয় নাকি ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "পূর্ব্বে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। মাঝখানটায় মাস তিন যাবৎ বেশ ভাল ছিলাম"। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রের জন্য চিন্তিত হইলেন। ইতিমধ্যে, বাবুরাম আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই, পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "এসেছিস, বেশ করেছিস। কিন্তু এখনই তোকে আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এর জ্বর হয়েছে। একে দিয়ে আসতে হবে"। বাবুরাম বাক্যব্যয় না করিয়া, গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন এবং একখানা নৌকা ডাকিলেন। তারপর, উভয়ে পরমহংসদেবের নিকট বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে

বলিয়া দিলেন, "বাড়ী গিয়ে একজন ভাল ডাক্তার দেখিও, আর জ্বর সেরে গেলে আবার এসো"।

প্রায় দেড়মাস কাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, দেবেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও, দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াই একসঙ্গে দেড় মাস কাল জ্বরে ভুগিয়াছিলেন বলিয়া, সুস্থ হওয়ার পরেও, তিনি কিছুকাল ভয়ে ভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, "সাধু দর্শনে লোকের কল্যাণ হয়। কিন্তু এ কে দর্শন করতে গিয়ে, আমার যত দুর্ভোগ। এ আবার কেমন সাধু?" অতঃপর, এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাটীতে আগমন করিবেন এই সংবাদ পাইয়া, দেবেন্দ্রনাথ কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, সহজেই তাঁহার অন্তরের ভয় দূর হইল। ইহার পর হইতে, দক্ষিণেশ্বর ও কলিকাতার স্থানে স্থানে পরমহংসদেবের সহিত বহুবার মিলিত হইয়া, তাঁহার উপদেশ ও সঙ্গগুণে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নানা ঈশ্বরীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একবার তিনি বৈরাগ্যবশে গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, পরমহংসদেব তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বারণ করিলেন। তৎপর, তিনি গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার ইটালী পল্লীতে অদ্যাপি দেবেন্দ্রনাথ স্থাপিত 'রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়' নামক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টান-পর্ব্ব Good Fridayর সময় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র পরমহংসদেব ও ভক্তগণকে লইয়া, নিজ বাটীতে মহোৎসব করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমনের কথা স্মরণ করিয়া, এখনও ভক্তগণ প্রতি বৎসর ঐ সময়ে 'রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে' উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

১৩১৮ সালের ২৭শে আশ্বিন, শনিবার, দেবেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অভয়পদে লীন হন।

হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৮৪)

শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বাগবাজারের বসুপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে মাতৃহীন ও কৈশোরে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বালক ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান ও নিয়মিত গায়ত্রী জপ, নিত্য গীতা, উপনিষদাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠ এবং স্ব-পাকে ভোজন করিয়া, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর জীবন যাপন করিতেন। সম্ভবতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, হরিনাথ তাঁহাদের প্রতিবেশী দীননাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পর, একদিন বালক দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরমহংসদেবকে দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। ঐ দিবস সেখানে লোকের ভিড় ছিল বলিয়া, পরমহংসদেব

তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া মধুর বাক্যে দুই চারিটী উপদেশ দিলেন এবং ছুটীর দিন ছাড়া অন্য এক দিবস পুনরায় তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। অতঃপর, হরিনাথ অবসর পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন; শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের নিমিত্ত তাঁহাকে নানাভাবে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন।

হরিনাথ যে নিত্য গীতা, উপনিষৎ পাঠ করিতেন, তাঁহার প্রত্যেকটী আচরণেই ইহা বেশ বুঝা যাইত। একদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকটেই একটী কুম্ভীর ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া তীরে উঠিয়া পড়িল। হরিনাথ শাস্ত্রে আত্মার অজ, নিত্য, শাশ্বত স্বরূপের কথা পাঠ করিয়াছেন। শরীর হত হইলেও, অবিনাশী আত্মা হত হন না। অতএব তিনি প্রথম শরীর-সংস্কার বশতঃ দুই এক পদ পশ্চাতে হটিয়া আসিলেও, আত্মার অমরত্ব স্মরণ করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে যাইয়া স্নান করিতে লাগিলেন।

বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া, হরিনাথ পুরুষকার-বাদী হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ঈশ্বরের কৃপার উপর তাঁহার তেমন আস্থা ছিল না। ইহা লক্ষ্য করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে তাঁহাকে একটী গান গাহিয়া শুনাইলেন, "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব? ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে?" কুশীলব মহাবীরকে বাঁধিলে, মহাবীর এই গানটী গাহিয়াছিলেন। গান গাহিতে গাহিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; আর হরিও ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল উপনিষদের

সেই শ্লোক, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'*। বেদান্তও যে ঐ একই কথা বলিয়াছেন ; আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, কেবল মাত্র তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিনাথের চরিত্রে আর একটী ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন ; এমন কি, অল্প-বয়স্কা বালিকাদিগকেও নিকটে আসিতে দিতেন না। এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার এই বিষয়ে কথা হইয়াছিল। পরমহংসদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, ঘৃণা দ্বারা বন্ধনেরই সৃষ্টি হয়, নারীজাতি সাক্ষাৎ ৺জগদম্বার অংশে জাত। তাঁহাদিগেতে মাতৃভাব আরোপ করিতে হয় এবং ঐ ভাবটী ঠিক ঠিক আরোপ করিতে পারিলে, অনায়াসে কাম-মোহ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার মূর্ত্তি হরিনাথ উত্তর কালে 'স্বামী তুরীয়ানন্দ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি 'বহতা পানি'র ন্যায় বহুকাল ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার অদ্ভুত প্রেম-সম্বন্ধ স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গলায় জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, "হরিভাই,

* নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
কঠোপনিষৎ ১।২।২৩ অথবা মুণ্ডক ৩।২।৩

তোমরা আমায় সাহায্য না করলে, আর কে আমায় সাহায্য করবে ?" তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার জীবনব্যাপী সদাচার-নিষ্ঠার দৃঢ় বন্ধন কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমেরিকার ন্যায় সুদূর ম্লেচ্ছ-দেশে যাইতেও রাজী হইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে, তিনি প্রায় তিন বৎসর আমেরিকায় বাস করেন। সেখানে, তপস্যা-প্রিয় স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর আদেশে নগরের কর্ম্ম-কোলাহল হইতে বহুদূরে কালিফোর্ণিয়ায় 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতে ভালবাসিতেন না। তথাপি তাঁহার ত্যাগ-পূত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া, বহু পাশ্চাত্য নরনারী পবিত্র ও শান্তিময় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের অধিকাংশ সময়ই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কাটিয়াছিল। তিনি মঠে উপস্থিত থাকিলে, নবাগত সাধু ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্ব্বদা শাস্ত্রপাঠ করাইতেন। তাঁহার অদ্ভুত তপস্যা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া, পশ্চিমাঞ্চলের সাধু সন্ন্যাসিগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যে আত্মাকে জড় দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কায়ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহার শেষ জীবনে বহুবার ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শরীর যাওয়ার পূর্ব্বে, তিনি পৃষ্ঠাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বহুবার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে কখনও ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিতে হয় নাই। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে, তিনি

স্থির আসনে উপবিষ্ট হইতেন এবং ডাক্তারেরা ইচ্ছানুযায়ী কাটা-চিরা করিত। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখবোধও হইত না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া, চিকিৎসকগণ এবং উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ২৪ বৎসর বয়সে বরাহনগর মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২১ শে জুলাই, ৺কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন। দিবারাত্র ব্রহ্মানুধ্যানে মগ্ন থাকিলেও, স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন অকপট স্বদেশ-হিতৈষী এবং কাব্যরসের রসিক ছিলেন।

গঙ্গাধর ঘটক

(১৮৮৪)

বসুপাড়ার গঙ্গাধর ঘটক (গঙ্গোপাধ্যায়) হরিনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। হরিনাথের ন্যায় গঙ্গাধরও, ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান, নিত্য গীতা, উপনিষৎ পাঠ এবং স্ব-পাকে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। আবার তাঁহারা দুইজনে এক দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায়ই একবার গঙ্গাধরের বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি গৃহত্যাগ করিয়া, একটী সাধুর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিছুকাল ভ্রমণের পর, পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন ; কিন্তু আর স্কুলে পড়িতে গেলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন হরিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছিলেন, তখন এক দিবস গঙ্গাধরও বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত

হইলেন। গঙ্গাধরকে দেখিয়া, পরমহংসদেব তাঁহার সহিত পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় নানা কথা আলাপ করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গঙ্গাধরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। হবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে ভাবিয়া, গঙ্গাধর সকল সময়েই অপরাহ্নে রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন এবং ফল ও মিষ্টান্ন ব্যতীত অন্য কোন প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। এক দিবস, তিনি ঘটনাক্রমে পূর্ব্বাহ্নেই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। আহারের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে, গঙ্গাধর পাকের যোগাড় করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "এখানে আবার পাক করা কেন? মা কালীর প্রসাদ খাবে। গঙ্গাজলে রান্না, তার ওপর মায়ের প্রসাদ; এতে কোন দোষ নেই। এ তোমার হবিষ্যান্নের চেয়েও পবিত্র"। গঙ্গাধর পরমহংসদেবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু মৎস্য-মাংস ভোজন করিলেন না। আহারান্তে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একটী পান খাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল না বলিয়া, তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পান-মাছে কি দোষ আছে? দেখ, নরেন সারাদিন পান চিবায়, আর মাছ-মাংস পেলেই খায়। কিন্তু তার মন কত উচ্চে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে পায়। তুমি তার সঙ্গে আলাপ করে দেখো"।

অনন্তর, গঙ্গাধর এক দিবস নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া, তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি ও কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা পূর্ব্বাপর একরূপই ছিল। গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকের ন্যায়, কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' নামে ভূষিত হন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া, উত্তরাখণ্ড ও তিব্বতে মানস সরোবরাদি বহু দুর্গম তীর্থে নিঃসঙ্গ ভাবে ভ্রমণ করেন। কেবলমাত্র বরফাবৃত তিব্বত প্রদেশেই, তিনি তিন বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন।

তিব্বত হইতে ফিরিবার পর, স্বামী অখণ্ডানন্দের করুণ হৃদয় আর্ত্ত, পতিত, অজ্ঞ ও নিরন্ন ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় ভরপূর হইয়া উঠিল। তিনি পর পর রাজপুতানা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারী পীড়িত জনগণের সেবায় প্রাণমন উৎসর্গ করিলেন। অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কল্পেও, তিনি অল্প আয়াস স্বীকার করেন নাই। তাঁহারই প্রচেষ্টায় উদয়পুরের অশিক্ষিত ভীলগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হয় এবং খেতড়ি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। লুপ্তপ্রায় বৈদিক শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পেও, তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে খেতড়ি রাজ্যে একটী বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যার প্রচলন করিতে পারেন নাই।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে (১৩০৩ বঙ্গাব্দে), মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন, "এইরূপ কাজের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত-মতান্তরে আসে যায় কি ? * * * কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম ; হাম আওর কুছ নেহি মাঙ্গতে হেঁ। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, even unto death. * * * ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম-ধাম সব রসাতলেও যায়, অহো ভাগ্য-মহোভাগ্যম্। * * * পুথি-পাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, প্রেমের কাছে সব ধূল-সমান। প্রেমই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমই ভক্তি, প্রেমই মুক্তি। এইতো পূজো, নরনারী-শরীর-ধারী প্রভুর পূজো। আর যা-কিছু 'নেদং যদিদম্ উপাসতে"। দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য্য শেষ হইয়া গেলে পর, স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদেই 'মহুলা' নামক গ্রামে একটী 'অনাথ আশ্রম' ও 'শিল্প বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। চৌদ্দ পনর বৎসর পর, ঐ আশ্রম মহুলা হইতে দুই মাইল দূরে সারগাছি গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। মহুলা ও সারগাছিতে, তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল পতিত ও দরিদ্র নারায়ণের সেবায় অতিবাহিত করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, স্বামী শিবানন্দের তিরোধান হইলে, স্বামী অখণ্ডানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘনায়কের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী (২৫ শে মাঘ, ১৩৪৩ সাল) রবিবার অপরাহ্ণে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে তাঁহার শরীরত্যাগ হয়।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

(১৮৮৪ শেষভাগ)

ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশব বাবুর কথা আলোচনা করিতে যাইয়া, আমরা ঐ কালের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে, পাঠককে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শতধা বিভক্ত বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহও, তখন একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ফলে, বহু লোক ব্রাহ্ম, আবার কতক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং অনেকে জড়বাদী ও নাস্তিক হইয়া দাঁড়ায়। নাট্য-সম্রাট গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ইহ-সর্ব্বস্ব জড়-বাদের প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া, আনন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। স্থূল-ভোগ্য বস্তুতেই তাঁহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে ঈশ্বর আছেন কিনা, এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিল। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গীতায় আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, আর্ত্ত হইয়াই অধিকাংশ লোক ঈশ্বর-ভজনা করিয়া থাকে। বিপদ যখন চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসে, তখন লোক একজন আশ্রয়দাতার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করে এবং ঈশ্বরে অনুরক্ত হয়। শ্রীযুক্ত গিরিশও নানা বিপদ এবং দুর্ভাবনায় পড়িয়া, ভগবানের শরণাপন্ন

হইলেন। ক্রমে, তাঁহার সকল দুশ্চিন্তা দূর হইল। কিন্তু ধর্ম্ম-ভাবটী চিরকালের জন্য রহিয়া গেল।

অনন্তর, গিরিশ কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনের সংশয় কিছুতেই দূর হইল না। সকলেই বলে, সদ্‌গুরুর কৃপা ও আশ্রয় ব্যতীত ভগবান্‌কে জানা যায় না। অথচ তাঁহারই তুল্য একজন মানুষকে কি করিয়া পরম দেবতা জ্ঞানে চরণে প্রাণমন সঁপিয়া দিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গুরুর আসন দান করিতে তাঁহার মন সরিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় ভক্তগৃহে আগমন করিতেন। এইকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতিবেশী দীননাথ বসুর বাড়ীতে একবার এবং রামকান্ত বসুর গলিতে বলরাম বাবুর পূর্ব্বতন বাড়ীতে পুনরায়, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন। প্রথম দিনে গিরিশ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধার ভাবই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইল। পরমহংসদেব 'চৈতন্য লীলা' অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত 'ষ্টার থিয়েটারে' গমন করিলে, গিরিশের সহিত তাঁহার তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব মানীকে সর্ব্বদাই মান দিতেন, আবার বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে গর্ব্বিতের দম্ভ নাশ করিতেন। গিরিশ তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; গিরিশও তাঁহাকে প্রত্যভি-বাদন জানাইলেন। ঐ দিবস গিরিশচন্দ্র কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিলেন।

তিনি পরমহংসদেবের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া, বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপে বলরাম বসু ও রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে এবং রঙ্গালয়ে আরও কয়েক বার সাক্ষাতের পর, গিরিশ বাবু পরমহংসদেবের নিরহঙ্কার ভাব এবং সরল বালকের ন্যায় ভগবানে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। অল্পকাল মধ্যেই গিরিশ পরমহংসদেবকে নিজ ইষ্ট জ্ঞানে, ইহকাল পরকালের সকল ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের আর আপনার বলিবার কিছুই রহিল না; তাঁহার অহঙ্কার একেবারে দূর হইল। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন; আবার শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার ভার লইলেন। পরমহংসদেবের দেবচরিত্র প্রভাবে, ক্রমশঃ গিরিশের চরিত্র সর্ব্ব প্রকারে উন্নত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বাভ্যাস সমূহ অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন। তথাপি ইহার পর, দুই একদিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া, গিরিশচন্দ্র নেশার ঝোঁকে পরমহংসদেবকে পর্য্যন্ত গালাগালি করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন পরমহংসদেবের বীরভক্ত।

পরমহংসদেব গিরিশের অনুরোধে, দুই চারি বার তাঁহাদের অভিনয় দর্শন করিতে ষ্টার থিয়েটারে গিয়াছিলেন। একদিন শ্রীযুক্ত গিরিশ তাঁহাকে একটী গোলাপ-ফুল উপহার দিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ উহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় এই বলিয়া ফিরাইয়া

দিলেন, "ফুলের অধিকার দেবতার, আর প্রয়োজন বাবুদের। ইহা লইয়া আমি কি করিব?" অপর এক দিবস গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যাইয়া, তাঁহার অপার মহিমার কথা ভাবিতে লাগিলেন, "এই অদ্ভুত মহাপুরুষ কে, যে ইঁহার চরিত্র-প্রভাবে আমার ন্যায় দাম্ভিকেরও মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইল"। আবার প্রকাশ্যে পরমহংসদেবকে বলিলেন, "আপনি কে তাই বলুন"। পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, "আমায় কেউ বলে, আমি রামপ্রসাদ; আবার কেউ বলে, আমি রাজা রামকৃষ্ণ। আমি এখানেই থাকি"। গিরিশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে দর্শন করেছি; আবার কি আমায় যা করি তাই করতে হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যা করছিলে, তাই করো। তাতে কি হবে?" ইহাতে গিরিশ বুঝিতে পারিলেন, নিজেতে ভগবানের যন্ত্রবুদ্ধি আনয়ন করিয়া কার্য্য করিলে, কোন কর্ম্মই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না।

সারদাপ্রসন্ন মিত্র

(১৮৮৪—ডিসেম্বর)

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাষ্টার মহাশয়ের) ছাত্র সারদা-প্রসন্ন মিত্র, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সারদাপ্রসন্নের বাড়ীতে ধন-জন ও দাস-দাসীর অভাব ছিল না। তিনি আজন্ম সুখের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই, পূজাপাঠ ও ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিশোর বয়সেই তিনি শতাধিক দেবদেবীর স্তোত্র ও প্রণাম

মুখস্থ করিয়াছিলেন। স্কুলের পড়াশুনায়ও, তিনি সর্ব্বদাই ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে না পারিয়া, সারদা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। ঐ কালে মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যান।

পরমহংসদেবের দর্শন এবং তাঁহার সহিত পরিচয় ও আলাপের পর, সারদার অন্তরের দুঃখ দূর হইল। এখন হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন। ক্রমে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশে যুবকের ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে লাগিল। দেহত্যাগের পূর্ব্বে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার নিমিত্ত কাশীপুর বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সারদা সবে মাত্র এফ্, এ পাশ করিয়াছেন। এতকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াতের ফলে, তাঁহার সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবক-গণের সহিত গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

সারদাপ্রসন্নের উদাস-ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। সুখের ক্রোড়ে পালিত হইলেও, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া, আপনার সুখ সুবিধা ও আরাম লইয়া ব্যস্ত থাকা, আপাত-মধুর ইন্দ্রিয়সুখের আশায় বিবাহ করা ইত্যাদি তাঁহার নিকট অত্যন্ত হেয় বোধ হইয়াছিল।

তাই তিনি আপন বিবাহের উদ্যোগের কথা জানিতে পারিয়া, একদিন কাহাকেও না বলিয়া, বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন এবং পদব্রজে ৺পুরীর দিকে রওনা হইলেন। অনশন, অর্দ্ধাশন ও নানাবিধ কঠোরতার মধ্য দিয়া পথ চলিয়া, সারদা কিছুকাল পরে ৺পুরীধামে উপনীত হইলেন। এদিকে পিতামাতা তাঁহার সন্ধান পাইয়া, উভয়েই ৺পুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া, পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দাসদাসীর ন্যায় সাধারণ গৃহকর্ম্ম করিতে, সারদা ঘৃণা বোধ করিতেন। কারণ, বাড়ীতে টাকা-পয়সা ও লোক-জনের অভাব না থাকায়, তাঁহাকে নিজের সামান্য কাজটুকুও নিজ হাতে কোন কালেই করিতে হয় নাই। কিন্তু পরমহংসদেবের পাল্লায় পড়িয়া, একদিনের একটী ঘটনায়ই, তাঁহার এই অভিমান ও সঙ্কোচের ভাব চিরতরে দূর হইয়াছিল। একদিন সারদা তাঁহার কয়েক জন বন্ধু সহ দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "হাত পা ধোব, কিছু জল নিয়ে আস"। পরমহংসদেবের আদেশ শুনিয়া, লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে এরূপ কাজের কথা বলিয়াছেন কিনা, অথবা কথাটা শুনিতে তাঁহার ভুল হইল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে সারদার মনে এই প্রকার অনেক চিন্তাই উদিত হইতে লাগিল। এদিকে সারদাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, পরমহংসদেব পুনরায় বলিলেন, "যাও, কিছু জল নিয়ে আস, পা ধোব"। সারদা কি করিবেন! উপায়ান্তর

না দেখিয়া, তিনি জল আনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পা ধোয়াইয়া দিলেন। এই একদিনের কষাঘাতেই, ছোট বা সাধারণ কাজের প্রতি তাঁহার ঘৃণা-বোধ একেবারে দূর হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পর আর কখনও ছোট কাজের প্রতি তাঁহার ঘৃণা বোধ হয় নাই। পরার্থে ত্যাগ ও প্রীতি পূর্ব্বক জীব-সেবাই, তাঁহার জীবনের মহান্ ব্রতরূপে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন উত্তর কালে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বাপর অতি কঠোর ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় তিনিও নিরাশ্রয় ভাবে উত্তরাখণ্ড ও মধ্যভারতের রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলের তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সম্পাদকতায়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র বাংলা মাসিক পত্র 'উদ্বোধন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদূর আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া, স্বামী ত্রিগুণাতীত স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সহরে একটী হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, ঐ মন্দিরে আমেরিকাবাসীর নিকট ধর্ম্মপ্রচার কালে, ভাব্‌রা নামক তাঁহার জনৈক বিকৃত-মস্তিষ্ক শিষ্য তাঁহার উপর একটী বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে, স্বামিজীর ডান পায়ের নীচ হইতে কোমর পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায় এবং প্রায় এক পক্ষ কাল ভুগিয়া, তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। বোমা নিক্ষেপে যে কেবলমাত্র তাঁহার প্রাণ নাশ হইয়াছিল, তাহা নহে; ভাব্‌রারও সঙ্গে সঙ্গেই

মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং অপর কয়েক ব্যক্তি অল্প-বিস্তর আহত হইয়াছিল। বিকৃত-মস্তিষ্ক ভাব্রার ধর্ম্মবাই ছিল। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া, সে এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, প্রায় এক বৎসর কাল হিন্দু-মন্দিরেও বাস করিয়াছিল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপদেশ ও সহবাসে তাহার মস্তিষ্কের বিকারও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে, সে এইরূপ পাগলামি করিয়া, গুরুঘাতী হইয়া, জগৎ হইতে বিদায় লইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত কিন্তু বোমার যন্ত্রণা ভুলিয়া, অবোধ শিষ্যের জন্যই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐরূপ অসুস্থ অবস্থায়, অসহ্য যন্ত্রণা কালেও, তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আহা! নির্ব্বোধ বেচারী, কোথায় সে?"

তুলসীচরণ দত্ত

(১৮৮৪—৮৫)

তুলসীচরণ দত্ত নামে বসুপাড়ার একটী সতর আঠার বৎসরের যুবক, শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর গৃহে প্রথমবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তুলসী হরিনাথের প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিলেন। হরিনাথ একদিন তুলসীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন অন্যত্র গিয়াছিলেন বলিয়া, যুবকদ্বয় তাঁহার দেখা পাইলেন না। ইহার কিছুকাল পরে, তুলসী আর এক দিবস একাকী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর; শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন ভোজনে রত এবং শ্রীমা

তাঁহাকে পরিবেশন করিতেছিলেন। তুলসী পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঐ অবস্থায়ই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকের সহিত কথা বলিতে বলিতে, তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটীর দিকে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও মধুর আলাপে, যুবক এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রাণে যেন এক আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। অতঃপর শ্রীযুক্ত তুলসী অবসর পাইলেই, দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চরিত্রে ত্যাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছুকাল পরে, তুলসী তাঁহার কৌমার-বৈরাগ্যবান্ শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তীর্থভ্রমণ ও তপস্যায় রত হন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম 'স্বামী নির্ম্মলানন্দ'। শ্রীমৎ অভেদানন্দজীর আহ্বানে, স্বামী নির্ম্মলানন্দ একবার আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে দেশে অধিক দিন বাস করেন নাই; মাত্র দুই বৎসর কাল তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়া, ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

স্বামী নির্ম্মলানন্দের উদ্যোগে, দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেকগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তিনি অনেক কাল ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার 'বিবেকানন্দ মিশন' নামক একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছেন।

সুবোধ চন্দ্র ঘোষ

(১৮৮৫ মধ্যভাগ)

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ীর নিকটেই শঙ্কর ঘোষের লেন। শ্রীযুক্ত শঙ্কর ঘোষ সেখানে বাস করিতেন এবং তাঁহার নামানুসারেই রাস্তাটীর ঐ নাম হইয়াছিল। ঘোষজ শঙ্কর স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাইয়া, স্বয়ং ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ীর সেবাপূজার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর বাবুর নাতি সুবোধ চন্দ্র ঘোষ সতর আঠার বৎসরের যুবক। সুবোধ এলবার্ট কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। বাল্যকালে মাতার নিকট রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প শুনিয়া, সুবোধের চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা, দেবদেবী ও ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সুবোধের পিতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ঘোষ ধার্ম্মিক ও ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি হিন্দু-সন্তান হইলেও, ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। আবার কখন কখন পুত্রকন্যা-গণকেও সমাজে লইয়া যাইতেন।

কৃষ্ণদাস বাবু সাধু-মহাত্মার জীবনী ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তজ্জন্য ঐ জাতীয় কোন পুস্তক পাইলেই, তিনি উহা ক্রয় করিতেন এবং স্বয়ং পুস্তকখানা পাঠ করিয়া, পুত্র-কন্যাগণকেও উহা পড়াইতেন। পিতার পুস্তকাবলী মধ্যে "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" নামক একখানা পুস্তক পাইয়া, সুবোধ উহার আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য যুবকের বিশেষ আগ্রহ জন্মিল।

তিনি পূর্ব্বেই পিতার নিকট শ্রীযুত কেশব সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের কথা শুনিয়াছিলেন। তাই, তিনি তাঁহার নিকট পরমহংসদেবকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণদাস অবসর-মত পুত্রকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সুবোধ অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার অধিক বিলম্ব সহ্য হইল না। এক দিবস, তিনি প্রতিবেশী ও সহপাঠী ক্ষীরোদ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া, পিতামাতার অজ্ঞাতসারেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন। তখন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন বা জুলাই মাস। যুবকদ্বয়ের মধ্যে কেহই দক্ষিণেশ্বরের পথ জানিত না; কাজেই পথ ভুল করিয়া রাস্তায় তাঁহাদের অনেকটা ঘুরিতে হইয়াছিল।

সুবোধ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া, তিনি বন্ধুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিলেন। ক্ষীরোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছ?" ক্ষীরোদ বলিলেন, "কলকাতা থেকে"। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, "ও বাবুটী অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে আস না?" সুবোধ অগ্রসর হইয়া, পরমহংসদেবকে প্রণাম করিলেন এবং তিনি বালককে তাঁহার খাটের উপরে বসিতে বলিলেন। সুবোধ কিন্তু তথায় বসিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এই কাপড় পরে স্কুলে গিয়েছি, কত লোককে ছুঁয়েছি, প্রস্রাব করেছি; আপনার বিছানায় বসব না"। পরমহংসদেব বালকের কথায় কাণ দিলেন না; বলিলেন, "কাপড়ে কি আসে যায়?" তিনি

তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সহিত কত আলাপ করিতে লাগিলেন ; যেন অনেক দিন পরে দেখা হইয়াছে। সুবোধকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালক তাঁহার অত্যন্ত আপনার জন, ত্যাগের অধিকারী। তিনি তাঁহাকে শনি-মঙ্গলবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে বলিলেন। সুবোধও তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরবর্ত্তী শনিবারে সুবোধ ও তাঁহার বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় ৩টা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহ লোকে পূর্ণ ছিল। বালকদ্বয়কে দ্বারে দেখিতে পাইয়া, পরমহংসদেব সমবেত ভক্তগণকে একটু বসিতে বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং উহাদিগকে নিকটবর্ত্তী শিবমন্দির-শ্রেণীর সম্মুখে লইয়া যাইয়া, সিঁড়ির উপর বসাইলেন। তৎপর তিনি নিজ অঙ্গুলি দ্বারা উভয়ের জিহ্বাগ্রে একটা মন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং বুকে ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতে বলিলেন। বন্ধুদ্বয় চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। শীঘ্রই সুবোধ অনুভব করিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়া, তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় একটা কি যেন মস্তকের দিকে উঠিয়া গেল। ক্রমে তিনি জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর মূর্ত্তি সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দে মগ্ন হইলেন! কিছুক্ষণ পরে, শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বালকদ্বয়ের মস্তক ও বক্ষে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহারা উভয়েই সহজ অবস্থা লাভ করিলেন। সুবোধ ছেলেবেলায় মাতার নিকট নানা দেবদেবীর কথা শুনিয়া, কখন

কখন তাঁহাদের বিষয়ে একটু আধটু চিন্তা করিতেন। তজ্জন্য সহজেই তাঁহার দেবদেবীর দর্শন লাভ হইল। তাঁহার বন্ধু ক্ষীরোদ ধ্যানকালে কিছু দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহারও অন্তর আনন্দে উল্লসিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় দর্শন দিনে সুবোধ বুঝিতে পারিলেন, পরমহংসদেব কৃপা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সকল ভার লইয়াছেন। সেই দিন হইতে, যুবক তাঁহার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবসর পাইলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে কথাবার্ত্তা ও গল্পচ্ছলে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। অনেক সময়ই, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী বালকগণকে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত করিয়া দিতেন। সুবোধকেও তিনি নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী প্রভৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের (মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের) বাসা সুবোধের বাড়ীর নিকটে ছিল। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব সুবোধকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেন। কিন্তু সুবোধ সেখানে যাইতেন না। সুবোধ অতিশয় সরল ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "আপনি আমাকে মহেন্দ্র বাবুর নিকট যেতে বলেন; তিনি ত সংসারী লোক, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে আবার ধর্ম্ম শিখতে যাব কি?" ইহাতে পরমহংসদেব বালককে সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "সে (মাষ্টার) সর্ব্বদা এখানে আসে, তুমি গেলেও এখানকার কথাই বলবে"। অতঃপর, সুবোধ

এক দিবস মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া সদালাপ চলিল। তাঁহার প্রতি সুবোধের মনোভাব জানিতে পারিয়া, মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমরা সামান্য মানুষ ; অন্যকে দেবার মত আমাদের কিছুই নাই, একথা ঠিক। তবে কিনা, তাঁর কাছে যা শুনেছি, তাই লোককে একটু আধটু বলি। তা ছাড়া, অন্য কথা আর কোথায় পাব ? যারা সমুদ্রের ধারে বাস করে, তারা সমুদ্রের জলই কলসী ভরে তুলে রাখে ; আর কেউ চাইলে, ঐ জলই খানিকটা দিয়ে থাকে. এই পর্য্যন্ত"।

বাল্যকাল হইতেই সুবোধের মনে ত্যাগের ভাব প্রবল ছিল। কখন কখন সন্ন্যাসিগণের দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের ছবি তাঁহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিত। একবার সুবোধের পিতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,"আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব,বিবাহে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। মিছামিছি কেন একটা লেঠা জুটাইবেন ?" শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর, সুবোধের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট গৃহ কারাগার তুল্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে যাহা দিত, সুবোধ তাহাই আহার করিতেন এবং যেখানে রাত্রি হইত, সেখানেই শুইয়া পড়িতেন। এইরূপে কিছুকাল ভ্রমণের পর, তিনি ৺কাশীধামে পৌঁছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে

কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করিয়া, গুরুভ্রাতাদিগের সহিত তপস্যা ও তীর্থভ্রমণে নিযুক্ত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তাঁহার নাম হইল 'স্বামী সুবোধানন্দ'। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি 'খোকা মহারাজ' নামেই সুপরিচিত। বাস্তবিক, শেষ বয়সেও তাঁহার স্বভাবটী কচি খোকার মত ছিল। তিনি বালকের ন্যায় মঠের সর্ব্বত্র আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তিনি বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন।

দক্ষঋষি

দক্ষঋষি নামে পরিচিত জনৈক ব্রাহ্ম ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য এবং খুব সরল-প্রকৃতি ছিলেন। পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহাকে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার নাম হয় 'স্বামী জ্ঞানানন্দ'। তিনি তৎকালীন রামকৃষ্ণ শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীতে 'দক্ষ মহারাজ' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। দক্ষ মহারাজ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ ও পাঞ্জাব অঞ্চলে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর, ৺বৃন্দাবনে আগমন করেন। ৺বৃন্দাবনে থাকা কালে, তিনি উন্মাদগ্রস্ত হন এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে কোথাও আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইত না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কলিকাতার কোন এক রাস্তার উপর (ফুটপাথে) তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্ণ, নারায়ণ, ছোট নরেন প্রমুখ বালকগণ

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, অনন্ত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। ফলে, সকলে যাহাতে ঐ শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই যত্নপর ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ শিক্ষকের কার্য্য করিতেন বলিয়া, বহু বালকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইত। ঐ সকল বালকের মধ্যে কাহারও অন্তরে একটু ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিলেই, তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। এইরূপে, মাষ্টার মহাশয় যে কয়টী শুদ্ধ-সত্ত্ব ও সরল-স্বভাব বালককে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ, নারায়ণ, ছোট নরেন প্রভৃতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাখাল (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এবং বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ও মাষ্টার মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি এই দুইটী বালককে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান নাই। তাঁহারা অন্য লোকের সহিত সেখানে গিয়াছিলেন। সর্ব্বদা স্কুলের বালকগণকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন বলিয়া, ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ মহেন্দ্রনাথকে 'ছেলে-ধরা মাষ্টার' নামে অভিহিত করিয়া, তাঁহার সহিত রহস্য করিতেন।

নারায়ণ—১৮৮৪। নারায়ণ কলিকাতার কোন এক সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সতর আঠার বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। তাঁহার

স্বভাবটী অতিশয় সরল ও পবিত্র ছিল। তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নারায়ণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। নারায়ণকে দেখিলেই, তাঁহার বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত। কখন কখন তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে আদর করিয়া, স্বহস্তে ফল, মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেন। যুবকের বাড়ীর লোকেরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া মোটেই পছন্দ করিত না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছেন জানিতে পারিলে, তাহারা তাঁহাকে খুব মারপিট করিত। তথাপি নারায়ণ মধ্যে মধ্যে পলাইয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বাড়ীর লোক অত মেরেছে, তবু তুই কেন এসেছিস ?" আবার অপর এক দিবস রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ্, তুই এক কাজ কর, একটা চামড়ার জামা তৈরী করে নে, তা হলে মারলে বেশী লাগবে না"।

যাহারা ভগবান্‌কে পাইতে চায়, সাধনের অবস্থায় তাহাদের নিকট কামিনী দাবানল-স্বরূপ, কালসাপের তুল্য। এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নারায়ণকে বলিয়াছিলেন, "মেয়ে-মানুষের গায়ের হাওয়া পর্য্যন্ত লাগাবি না। যাতে তাদের হাওয়া গায় না লাগে, তার জন্য মোটা কাপড় গায় দিয়ে থাকবি। আর মা ছাড়া সকলের কাছ থেকেই, আট হাত, নয় দু'হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত তফাতে থাকবি"। নারায়ণ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

দ্বিজ—১৮৮৪। দ্বিজের বাবা ও তাঁহার ভাইয়েরা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের নিষেধ না মানিয়া, প্রায়ই মাষ্টার মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। দ্বিজের পিতা কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে ম্যানেজার ছিলেন। একদিন তিনি পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া, তাঁহার সরল ও মধুর বাক্যালাপে মুগ্ধ হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এরা এখানে এলে, ভয়ের কোন কারণ নেই। এতে আপনি কিছু মনে করবেন না। এদের আমি জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকতে বলি, তা হলে এরা সংসারে লিপ্ত হবে না; ভগবানের নামে শান্তিতে দিন কাটাবে"। এইরূপে দ্বিজের পিতার সহিত পরমহংসদেবের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছেলেকে দেখেই বাপ কেমন তা বুঝা যায়। ছেলে ভাল হলে, বাপও ভাল লোক হয়। নইলে ভাল ছেলে হবে কি করে?" দ্বিজের পিতা পরমহংসদেবের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, অতঃপর পুত্রের দক্ষিণেশ্বর গমন বিষয়ে উদাসীন হইয়াছিলেন।

হরিপদ—১৮৮৪। হরিপদ বেশ কথকতা জানিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, প্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি সুর করিয়া বলিতে পারিতেন। খুব ধ্যান করিতেন বলিয়া, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদাই আরক্তিম হইয়া থাকিত। একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "অত নয় রে, অতটা করিস না"। হরিপদ ঘোষ-

পাড়ার একটী মেয়েকে মা বলিয়া ডাকিতেন। পরমহংসদেব যেমন সর্ব্বদা ভক্তগণকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেন, হরিপদকেও তিনি তাঁহার পাতান মায়ের সম্বন্ধে সেইরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

তেজচন্দ্র মিত্র—১৮৮৪। তেজচন্দ্রের অনেক কাজ করিতে হইত বলিয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোরা এত আপনার জন, তাই তোদের ডেকে পাঠাই। এতবার ডাকি, তবু আসিস না কেন? আচ্ছা, যদি বা না-ই আসতে পারিস, তা হলে বাড়ীতেই ধ্যানটান করিস; তাতেই আমি খুসী হব"। তেজচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ নির্ম্মল-চরিত্র ছিলেন। উক্ত কারণে, তাঁহারা সহজেই পরমহংসদেবের উপদেশাদি ধারণা করিতে পারিতেন। এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যাদের বিষয়-বুদ্ধি রয়েছে, তারা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে, ঐ দুধ নষ্ট হয়ে যায়"।

পল্টু—১৮৮৪—৮৫। প্রমথ চন্দ্র কর (পল্টু), দ্বিজ, হরিপদ, তেজচন্দ্র প্রভৃতি বালকগণকেও মাষ্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন বলিয়া, পল্টুর পিতা সর্ব্বদাই তাঁহাকে অনুযোগ দিতেন। তাই পল্টু একদিন তাঁহার বাবাকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি যে তাঁর কাছে যাই, একথা ঠিক। কিন্তু একি কিছু খারাপ কাজ?" পরমহংসদেবের রসিকতাপূর্ণ উক্তি সমূহ শুনিয়া পল্টু হাসিয়া

গড়াগড়ি যাইতেন। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে কলিকাতায় ব্যবহার-জীবী হন। এখনও তিনি বাঁচিয়া আছেন।

পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ—১৮৮৫। পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুরের স্কুলেই পড়িতেন। পূর্ণের আকৃতি অত্যন্ত মনোহর এবং চক্ষু দুইটী বেশ বড় ও উজ্জ্বল ছিল। মাষ্টার মহাশয় বালকের ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় পাইয়া, একদিন তাঁহাকে স্কুল হইতেই গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং পূর্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া, স্কুলের সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। যখন পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র তের বৎসর। পরমহংসদেব বালকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া, প্রথম হইতেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি বলিতেন, "পূর্ণ অতি শুদ্ধ-সত্ত্ব ছেলে। এমন শুভ-সংস্কারবান্ ছেলে অতি বিরল দেখা যায়"।

পূর্ণচন্দ্রের অভিভাবকগণ তাঁহাকে কোথাও একাকী যাইতে দিতেন না। তাঁহারা তাঁহার দক্ষিণেশ্বর-গমন পছন্দ করিবেন না, ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিয়া, পূর্ণ কখন কখন তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন। আবার, তিনি কলিকাতায় আসিলেও, পূর্ণ বাড়ীর লোকের অলক্ষিতে যাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাতের পর, অল্পকাল মধ্যেই, তাঁহার অন্তরের সুপ্ত ধর্ম্মভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিত এবং পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত

হইত। প্রবল অনুরাগ বশতঃ, ধ্যান করিতে বসিবামাত্র, পূর্ণচন্দ্রের অন্তর এরূপ উল্লসিত হইত যে, তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত, পরমহংসদেব অনেক সময়েই ভক্তগণের নিকট বালকের দেব-স্বভাব ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রশংসা করিতেন এবং কখন কখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন।

পরবর্ত্তী কালে পূর্ণচন্দ্র বিবাহ করিয়া গৃহী হইলেও, পরমহংসদেব তাঁহাকে শিষ্যগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক আধার হিসাবে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পরেই স্থান দিতেন। তাঁহার মন জন্ম হইতেই ত্যাগ ও সন্ন্যাস-প্রবণ ছিল। কিন্তু কর্ম্মের ফেরে সংসারী হইয়া, পরিবার পোষণের নিমিত্ত তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইয়াছিল। এই কারণে, তিনি একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, ষোল আনা মন দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত নিরভিমান ছিলেন এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্র ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিতেছেন না বলিয়া, সর্ব্বদাই যেন সকলের নিকট লজ্জিত হইয়া থাকিতেন।

পূর্ণচন্দ্র ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগে কার্য্য করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে বৎসরে ছয় মাস করিয়া সিমলাতে থাকিতে হইত। আবার, যখন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠিয়া গেল, তখন বাকী ছয় মাসও তাঁহাকে দিল্লীতেই থাকিতে হইত। চাকুরী করিলেও, সংসার বা অর্থের প্রতি তাঁহার আদৌ মন ছিল না। বেতনের টাকার অনেকাংশই তিনি

দীনদরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিতেন। সিমলাতে অবস্থান কালে, তিনি অবসর পাইলেই নির্জ্জন পাহাড়ে চলিয়া যাইতেন এবং ঈশ্বর-চিন্তায়, তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সহজ-সরল চাল-চলন ও কথাবার্ত্তায়, তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করা অত্যন্ত কঠিন হইত। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন, তাঁহারাই তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস, অনুরাগ, নির্ভরশীলতা ও আত্মত্যাগ-পূত জীবন দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।

দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে, পূর্ণচন্দ্র অসুস্থ হইয়া, কর্ম্মস্থল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৩২০ সনের কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসে, তিনি কলিকাতার বাটীতেই ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া পরলোক গমন করেন।

ছোট নরেন—১৮৮৫। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামক যুবককে 'ছোট নরেন' বলিয়া ডাকিতেন। ছোট নরেন অতিশয় সরল ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন গুরু স্বামী তোতাপুরীর সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহিত, যুবকের বুদ্ধির তুলনা করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে আদপেই বিষয়বুদ্ধি ছিল না। ঈশ্বরীয়-কথা একবার শুনিলেই, তিনি বেশ ধারণা করিতে পারিতেন। আবার, কখন কখন তিনি ঈশ্বরের দর্শন পাইবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ছোট নরেন খুব শুদ্ধ আধার। এর মনে জমিন, জরু, রূপেয়া, এই তিনটের একটেও নেই"। অর্থাৎ কামিনী, কাঞ্চন ও জমির প্রতি এর একটুও আকর্ষণ নাই। ছোট নরেন শ্রীরামকৃষ্ণকে

অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তজ্জন্য বাড়ীর গালাগালি অগ্রাহ্য করিয়াও, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, অনেক সময়ে একসঙ্গে দুই তিন রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বাস করিতেন।

ক্ষীরোদ—১৮৮৫। ক্ষীরোদ, বঙ্কিম, বিনোদ প্রমুখ মাষ্টার মহাশয়ের আরও কয়েক জন ছাত্র পরমহংসদেবের নিকট আসিতেন। ক্ষীরোদ দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক। তাঁহার চক্ষু দুইটী ছিল হরিণের চোখের মত। ক্ষীরোদ বেশ সচ্চরিত্র ছিলেন, ঈশ্বরীয় কথায় তাঁহার খুব আনন্দ হইত।

ভক্ত-প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন কাল হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত, নিত্যই তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত লোক-সমাগম হইত। কত লোক কৌতূহল বশতঃ তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল, কত জন তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াই বা ক'জনের জীবন-ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, উহার ইয়ত্তা করা যায় না। আবার এই সকল ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু জানা যায় না। মাত্র অল্প কয়েক জনের জীবন-কথা সামান্য পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কতিপয় বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও গৃহী

ভক্তের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর, বিস্তৃত বিবরণের অভাবে, অপর কয়েক জন ভক্ত সম্বন্ধে মোটামুটী দুই চারি কথা,—যাহা পাওয়া গিয়াছে—লিপিবদ্ধ করা হইল।

কৃষ্ণকিশোর—সাধনার মধ্যভাগ। কৃষ্ণকিশোর নামে আড়িয়াদহের জনৈক ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নিকট আসিতেন। পরমহংসদেবও কখন কখন তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া, 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পাঠ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাকে পাইলে, কৃষ্ণ-কিশোরের আনন্দের সীমা থাকিত না। ব্রাহ্মণ খুব সদাচারী ও ভক্তিমান্ ছিলেন। ভগবানের নামে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, "একবার তাঁর নাম নিলে, সব পাপ কেটে যায়। একবার কৃষ্ণ-নাম বা রাম-নাম নিলে, কোটী সন্ধ্যার ফল হয়"। আবার কখন কখন তিনি জ্ঞানের কথাও বলিতেন, 'আমি খ' অর্থাৎ আকাশ-স্বরূপ। পরমহংসদেব কৃষ্ণকিশোরের অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা ভক্তদের নিকট বলিতেন। একবার বৃন্দাবনে পিপাসায় কাতর হইয়া, তিনি পথিপার্শ্বে একটী কূপে জল পান করিতে গেলেন এবং কূপের ধারে একটী লোককে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আমায় এক ঘটী জল দিবে?" লোকটী বলিল, "মহাশয়, আমি জাতিতে মুচি। কি করিয়া আপনাকে জল দিব?" তখন কৃষ্ণকিশোর বলিলেন, "তুই বল 'শিব', তা হলেই শুদ্ধ হয়ে যাবি"। তারপর লোকটী 'শিব, শিব' বলিয়া তাঁহাকে জল তুলিয়া দিলে, তিনি সেই জলই নিঃসঙ্কোচে পান করিলেন।

পরমহংসদেব সময়ে সময়ে কৃষ্ণকিশোরের একাদশীর কথা বলিতেন। একাদশীতে তাঁহাকে লুচি-ছক্কা খাইতে দেখিয়া, পরমহংসদেবের সাধ হইল, তিনিও ঐরূপে একাদশী করেন। তাই তিনি একদিন পেট ভরিয়া লুচি-ছক্কা খাইয়া, কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করিয়াছিলেন। একদা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর পরমহংস-দেবকে বলিয়াছিলেন, "পৈতেটা ফেলে দিলে কেন ?" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "একবার তাঁর ভাবে মত্ত হয়ে যাও, তা হলে বুঝবে"। তারপর একবার কৃষ্ণকিশোর ঈশ্বরীয় ভাবে মত্ত হইয়া গেলেন। তিনি সারাদিন কেবল 'ওঁ, ওঁ' করিতেন। কর্ত্তা অসুস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া, বাড়ীর লোকেরা কবিরাজ ডাকিলে, তিনি কবিরাজকে বলিয়াছিলেন, "ওগো, আমার রোগটী সারিও ; কিন্তু দেখো, 'ওঁ'কারটী যেন সারিও না"। এক সময়ে কৃষ্ণকিশোর অর্থাভাবে ট্যাক্স দিতে না পারিয়া, বিষণ্ন মনে বসিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া, পরমহংসদেব রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কিগো, এমন করে বসে আছ যে ? তুমি ত 'খ'। ট্যাক্স-ওয়ালা না-হয় তোমার ঘটী-বাটী নিয়ে যাবে। ট্যাক্সের জন্য ত আর তোমায় বাঁধতে পারবে না ; তুমি ত 'খ"।

মাড়োয়ারী লক্ষ্মীনারায়ণ—সাধনার শেষার্দ্ধ। কলিকাতার কয়েক জন ভক্তিমান্ মাড়োয়ারী বেদানা, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া, মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহাদের

মধ্যে মাড়োয়ারী লক্ষ্মীনারায়ণের কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমহংসদেবকে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ এরূপ শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার বিছানা ময়লা দেখিয়া, একদিন তাঁহার সেবার সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথায়, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে বলিলেন, "যদি আবার একথা মুখে আন, তা হলে আর কখনো এখানে এসো না"। পরমহংসদেব টাকা স্পর্শ করিতে পারিতেন না। উহা গ্রহণ করিবেন কি করিয়া? মাড়োয়ারী লক্ষ্মীনারায়ণের ভারি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল। তিনি পরমহংসদেবের কথায় বলিলেন, "এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বোধ রয়েছে, তা হলে আপনার জ্ঞান এখনো পূর্ণ হয় নাই"। তারপর লক্ষ্মীনারায়ণ হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার নিকট কোম্পানীর কাগজগুলি দিতে চাহিলেন। পরমহংসদেব ইহাতেও রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তা হবে না, টাকা কাছে থাকাই খারাপ"।

বিষ্ণু—সাধনকাল। বিষ্ণু নামে একটী বালক আড়িয়াদহ হইতে পরমহংসদেবের নিকট আসিতেন। বালক হইলেও, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ, তিনি সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। পরমহংসদেবকে বিষ্ণুর বড় ভাল লাগিত। তিনিও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালক অনেক সময়ে স্কুল পলাইয়া, পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া আসিতেন। উক্ত কারণে, তাঁহার

মাতাপিতা তাঁহাকে অশেষ প্রকারে তিরস্কার ও উৎপীড়ন করিত। একবার বিষ্ণু পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া, বালক মাঠে মাঠে এবং বনে জঙ্গলে, সমস্ত দিন ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, বিষ্ণুর বাড়ীর লোকেরা পুনরায় তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অনবরত ঈশ্বর-চিন্তার ফলে, বিষ্ণু এই বয়সেই নানা ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন এবং জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমাগত বাড়ীর অত্যাচার অসহ্য বোধ হওয়ায়, একদিন তিনি গলায় ছুরি দিয়া, নশ্বর দেহের ধ্বংস সাধন করিলেন। এই সংবাদে, পরমহংসদেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন! তিনি উপস্থিত ভক্তগণকে কথায় কথায় ইঁহার বিষয়ে বলিয়াছিলেন, জ্ঞান লাভের পর স্বেচ্ছায় দেহপাত করিলেও, তাহাতে আত্মহত্যা-জনিত পাপের ভাগী হইতে হয় না।

কোয়ার সিং ও শিখ সিপাহীগণ—সাধনকাল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ঠিক উত্তর পার্শ্বেই একটী সরকারী বারুদখানা ছিল। একদল শিখ সিপাহী সেখানে থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করিত। ঐ সিপাহীগণ বেশ ভক্তিমান্ ছিল। তাহারা প্রায়ই কালীবাড়ীতে আসিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করিত এবং কখন কখন তাঁহাকে আপনাদের আবাস-স্থলে লইয়া যাইয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। আবার কখন বা নিমন্ত্রণ করিয়া,

তাঁহাকে ভোজনও করাইত। এই সিপাহীগণের হাবিলদার কোয়ার সিং, শ্রীরামকৃষ্ণের মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে 'বাবা নানকের' স্থান দিতেন। তিনি বলিতেন, "সমাধি থেকে ফিরে-আসা লোক, আর কখনো দেখিনি। তুমিই নানক"। কোয়ার সিং শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

রামলাল চট্টোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের শরীর-ত্যাগের পর, রামলাল পিতার স্থলবর্ত্তী হইয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পূজকের কাজ করিতেছিলেন। কাজেই, খুল্লতাত রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামলাল কখন কখন তাঁহাকে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পাঠ করিয়া শুনাইতেন; আবার প্রয়োজন মত তাঁহার সেবা করিতেন। যে বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়, সেই বৎসরের ১লা জানুয়ারী, তিনি কাশীপুর উদ্যানে উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অনেককেই বিশেষ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস, শ্রীযুক্ত রামলালও তাঁহার কৃপা-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। রামলাল পরমহংসদেবের অনুকরণে বেশ ভাল গান গাহিতে ও নাচিতে পারিতেন এবং কখন কখন গান গাহিয়া, তাঁহাকে ও ভক্তগণকে আনন্দ দান করিতেন। পরমহংসদেবের অদর্শনের পরেও, তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত শ্রীযুক্ত রামলাল জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা

সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রামলাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'রামলাল দাদা' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৩৪০ সনের ১লা মাঘ দেহত্যাগ করেন।

শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—রামলালের একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল শিবরাম চট্টোপাধ্যায়। শিবরাম অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পরমহংসগণের বালক অবস্থা বুঝাইতে যাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কখন শিবরামের বাল্যকালের কথা উল্লেখ করিতেন। তিনি বলিতেন, "ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখে শিবু বলত, 'খুড়ো, ঐ দেখ আকাশে চকমকি ঠুকছে'। আবার ফড়িং ধরতে গিয়ে, বাতাসে পাতা নড়ছে দেখে, পাছে শব্দ পেয়ে ফড়িং উড়ে চলে যায়, তাই পাতাকে বলত, 'চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধরব"। ১৩৪০ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ শিবরাম পরলোক গমন করেন।

যদুনাথ মল্লিক—১৮৭২। পাথুরিয়াঘাটার যদুনাথ মল্লিক তৎকালে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীর পূর্ব্ব সীমান্তে তাঁহার একটী বাগান-বাড়ী ছিল। যদুনাথ মধ্যে মধ্যে সেই বাগানে যাইয়া বাস করিতেন। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরমহংসদেব অনেক সময়ে তাঁহার বাগানে বেড়াইতে যাইতেন এবং তাঁহাকে নানা ঈশ্বরীয় কথা শুনাইতেন। তিনি দুই চারি বার যদুবাবুর পাথুরিয়া-ঘাটার বাড়ীতেও গমন করিয়াছিলেন। যদুনাথের বাগান-বাড়ীর

বৈঠকখানার দেয়ালে মেরী-কোলে যীশুর প্রতিকৃতি দেখিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেণীমাধব পাল—১৮৭৪—৭৫। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের বাড়ী ছিল বরাহনগরের সিঁতি পল্লীতে। তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। বেণীবাবু ব্রাহ্ম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের সমাজকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। আবার ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার উদ্যান-বাটীতে বৎসরে দুইবার করিয়া, সিঁতি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদি সম্পন্ন হইত। এই উপলক্ষে কলিকাতার ব্রাহ্ম ভক্তগণ সেখানে সমবেত হইতেন। প্রতি উৎসব উপলক্ষে বেণীবাবু, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। একবার পরমহংসদেব নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহাদের উৎসবে যোগদান করিলে, ভক্ত-সেবার জন্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধবকে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে দেখিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের এখানে এসে আজ খুব আনন্দ হল। অর্থ যাঁদের দাস, তাঁরাই প্রকৃত মানুষ। আর যারা অর্থের সদ্‌ব্যবহার জানে না, তাদের আকৃতি মানুষের মত হলেও, প্রকৃতি পশুর সমান। আজ এত-সব ভক্তের প্রাণে আনন্দ দিয়ে, তুমি ধন্য হয়েছ"।

জয়গোপাল সেন—১৮৭৫—৭৬। শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম ভক্ত। তাঁহার বেলঘরিয়া-স্থিত উদ্যানে

কেশবচন্দ্রের সহিত পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব তাঁহার কলিকাতা মাথাঘসা গলির বাড়ীতেও শুভাগমন করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ পাল—১৮৭৬—৭৭। সিঁতির কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল, মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন। এক দিবস মহেন্দ্রনাথ তাঁহার সেবার নিমিত্ত রামলালের হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার টাকা দেওয়ার কথা জানিয়া, উহা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরেও, মহেন্দ্র বাবুকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তাঁহার বাসগৃহের বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত।

মণিলাল মল্লিক—১৮৭৫—৮০। ব্রাহ্ম ভক্ত মণিলাল মল্লিক কলিকাতার সিদুরিয়াপট্টীতে বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইত। সেই উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময়েও, তিনি পরমহংসদেবকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিতেন। পরমহংসদেবের মুখে মধুর ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন ও উপাসনান্তে, তিনি সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। বরাহনগরের নিকটে মণিলালের একটী বাগানবাটী ছিল। মণিলাল কখন কখন ঐ বাগানে এবং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন। একদা মণিলালের একটী উপযুক্ত পুত্র অকালে লোকান্তরিত হইলে, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ মনে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রুক্ষ কেশ ও মলিন

বদন দেখিয়া, পরমহংসদেব উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মণিলাল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পুত্রের মৃত্যুর কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নীরবে সকল কথা শুনিয়া, গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তৎপর তিনি ভাবস্থ হইয়া, 'জীব সাজ সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে', এই গানটী গাহিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম ভাব-তরঙ্গ, মণিলালকে সংসারের অনিত্যতা পূর্ণমাত্রায় স্মরণ করাইয়া, শোক-সন্তাপ ভুলাইয়া দিল। তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে, ভাবের উপশম হইলে, রামকৃষ্ণ মণিলালের সহিত সমবেদনায় আকুল হইয়া, তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আপন ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, "অক্ষয় যখন এখানে মলো, প্রথম দেখলাম এটা যেন একটা অবস্থান্তর মাত্র, যেন খাপ থেকে তলোয়ার খানা নিয়ে গেল। কিন্তু, পরদিন ওর কথা মনে করে এমন শোক হতে লাগল, মনে হল যেন বুকের ভিতর গামছা নেংড়াচ্ছে। তখন ভাবলুম, যার পোঁদের কাপড়ের ঠিক নেই তারই যখন এত শোক, যারা সংসার করেছে, ছেলের জন্ম দিয়েছে, তাদের না-জানি কতটা হয়"। পরমহংসদেবের সঙ্গীত ও সান্ত্বনাবাক্যে মণিলাল শান্ত হইলেন; তাঁহার মন হইতে পুত্রশোক অন্তর্হিত হইল।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১৮৮১—৮২। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস করিতেন।

তাঁহার বাড়ী ছিল চব্বিশ-পরগণার জনাই গ্রামে। তিনি মেকাঞ্জি লায়ালের 'Exchange' নামক নিলাম আফিসের বড়বাবু ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কখন তাঁহাকে 'মোটা বামুন' নামে নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি একদিন পরমহংসদেবকে আপন বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। গৃহী হইলেও, বেদান্তচর্চ্চায় তাঁহার বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি বলিতেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; তিনিই আমি, সোহহং"। তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়েই তাঁহাকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ দান করিতেন। আবার কখন কখন তিনি তাঁহাকে ইহাও বলিতেন, "কলির মানব অন্নগত-প্রাণ ; এ যুগে নারদীয়া ভক্তিই শ্রেষ্ঠ—সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধরতে পারে ?"

কর্ম্মের প্রতি বিরাগ বশতঃ, প্রাণকৃষ্ণ এক সময়ে পরমহংস-দেবকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, এইবার ভাবছি, কর্ম্ম ছেড়ে দিব। কর্ম্ম করতে গেলে, আর কিছুই হয় না"। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ, কর্ম্ম করা বড় ঝঞ্ঝাট। কর্ম্ম ছেড়ে নির্জ্জনে যেয়ে, ঈশ্বর-চিন্তা করা খুব ভাল। শুধু বল্লে কি হবে ? কর্ম্ম ছাড়া বড় শক্ত। কাপ্তেনও আমায় ঐ কথা বলেছিল ; কিন্তু ছাড়তে পারে নি। সংসারী লোকেরা কর্ম্ম ছাড়তে পারে কই ?"

চুণিলাল বসু—১৮৮১—৮২। চুণিলাল বসু বাগবাজার অঞ্চলে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত চুণি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং সাধু-মহাত্মা খুঁজিয়া বেড়াইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া, তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা নিবৃত্ত হয়। তিনি বয়স্ক গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া, স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরম-হংসদেবের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ চুণিবাবুকে আদর করিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে, চুণিলাল রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে নিজ বাটীতে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নবগোপাল ঘোষ—১৮৮১—৮২। শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ কলিকাতার জর্জ্জ হ্যাণ্ডারসন্ আফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাদুড়-বাগানে বাস করিতেন। নবগোপাল বেশ ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এক দিবস পরম-হংসদেব ও ভক্তগণকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, কীর্ত্তন ও আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও ভক্তিমতী ছিলেন।

ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৮৩। কলিকাতার ঠনঠনিয়া পল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,তাঁহার পুত্র শ্রীশ ও বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। আবার, ঈশ্বরে তাঁহার অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, যদি কেহ একবার দুর্গা নাম লইয়া কোথাও

যাত্রা করে, তবে তাঁহার আর বিপদ-ভয় থাকে না; স্বয়ং শূলপাণি ত্রিশূলহস্তে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত ঈশান মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকে আপন বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। আবার, কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতেন। কাহারও দুঃখ দেখিলে, ঈশান বাবুর হৃদয় করুণায় গলিয়া যাইত। অনেক সময়ে, তিনি আপনার সম্মুখের অন্ন-ব্যঞ্জন নিরন্ন ভিখারীকে তুলিয়া দিতেন। তাঁহার দয়া, দানশীলতা, উদয়াস্ত জপ প্রভৃতির জন্য, অনেকেই তাঁহাকে খুব মানিত। পরমহংসদেব সর্ব্বদাই তাঁহাকে ষোল আনা মন দিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন।

শ্রীযুক্ত ঈশানের পুত্র শ্রীশ বেশ বিদ্বান্ ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে তিনি মাষ্টার মহাশয়ের সহিত এক সঙ্গে পড়িয়াছেন। শ্রীশবাবু আলিপুরে ওকালতি করিতেন। মাষ্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আলাপ করাইয়া দিলে পর, তিনি শ্রীশকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—১৮৮৩। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, পরমহংসদেব রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ সঙ্গে, বেলঘরিয়ার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকাল বেলা, সেখানে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, পরমহংসদেব ভাবের উদ্দাম বেগে, কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে, তিনি উপস্থিত বেলঘরিয়াবাসীকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল—১৮৮৩ শেষভাগ। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইয়া, পরমহংসদেবকে দর্শন করেন। তৎপর, তাঁহার নিকট যাতায়াতের ফলে, তিনি ধর্ম্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। উত্তর কালে, বৈকুণ্ঠনাথ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক 'স্বামী কৃপানন্দ' নাম ধারণ করিয়া, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের সহিত বরাহনগর মঠে ও উত্তরাখণ্ডে কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে, তিনি গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময়েই, পথে নৌকায় শরৎ চক্রবর্ত্তীর (স্বামী সারদানন্দ) সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার পর, অনেক সময়ে তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বৈকুণ্ঠনাথকে সর্ব্বদাই বাগবাজার 'উদ্বোধন কার্য্যালয়ে', তাঁহার সহিত একত্র দেখা যাইত। এই সূত্রে, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'সান্ন্যাল মহাশয়' নামেই সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের শেষ অসুখের সময়, বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথের বাড়ী নদীয়া জিলার বেলপুকুর গ্রামে। কিন্তু তিনি কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন। ১৩৪৩ সনের ২৭শে চৈত্র, কলিকাতার বাড়ীতেই তাঁহার শরীর যায়।

কিশোরী মোহন রায়—১৮৮৩—৮৪। বনহুগলী নিবাসী কিশোরী মোহন রায়, পরমহংসদেবের একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন।

পরমহংসদেবের মহাসমাধির পরেও, তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণের সহিত আজীবন মেলামেশা করিয়া গিয়াছেন। তিনি Government Stationery আফিসে কাজ করিতেন। কিশোরীমোহন কিছুকাল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র মাসিক 'উদ্বোধন'এর পরিচালন কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মধুসূদন ডাক্তার—১৮৮৩—৮৪। পরমহংসদেব অসুস্থ হইলে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন ডাক্তার প্রায়ই আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন। মধুবাবু প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং বেশ রসিক লোক ছিলেন। সমাধি অবস্থায় পড়িয়া যাইয়া, যখন পরমহংস-দেবের একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে ভক্তগণ বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য, মধুবাবু প্রায় প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন এবং প্রয়োজন মত ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিতেন।

নবাইচৈতন্য মিত্র—১৮৮৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত নবাইচৈতন্য মিত্রকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া আসেন। শ্রীযুক্ত নবাইচৈতন্যের বাড়ী ছিল কোন্নগরে। তিনি বেশ কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন এবং কখন কখন পরমহংস-দেবকে কীর্ত্তন গাহিয়া শুনাইতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগে, পরমহংসদেব শেষবার পাণিহাটীর মহোৎসবে গমন করিলে, নবাইচৈতন্য তাঁহার বিশেষ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর বৃদ্ধ নবাই, পুত্রের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, গঙ্গাতীরে একটী কুটীর বাঁধিয়া,তাহাতে বাস করিতে

লাগিলেন। ঐ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুটীরেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সাধন-ভজনে কাটিয়াছিল। এই কালে নবাইচৈতন্যের কীর্ত্তন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও উপদেশে, অনেকের প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি—১৮৮৪। বাগবাজার হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখার্জ্জি ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর প্রিয়নাথ পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের বাড়ী কেদেটী গ্রামে। কলিকাতার বাগবাজারেও ইঁহাদের একটী বসতবাটী ছিল। ভ্রাতৃদ্বয় সাধারণতঃ কলিকাতায় বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রের ময়দার কল ও অন্যান্য ব্যবসা ছিল। আর কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে চাকুরী করিতেন; সংসারে অভাব নাই, তাই চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। সরল ও উদার-স্বভাব এই দুই সহোদরকে পরমহংসদেব স্নেহ করিতেন। একবার তিনি তাঁহাদের বাগবাজারের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

হরি—১৮৮৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রের আত্মীয় ও প্রতিবেশী, হরি নামে একটী ভক্তিমান্ যুবক কখন তাঁহাদের সঙ্গে, আবার কখন বা একাকী দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। হরি কার্য্য উপলক্ষে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেও থাকিতেন। যুবকের অকপট ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ লক্ষ্য করিয়া, পরমহংসদেব আনন্দিত হইতেন এবং ভক্তগণের নিকট তাঁহার প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত হরি তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

হীরানন্দ—১৮৮৪। শ্রীযুক্ত হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী জনৈক ভক্ত। তিনি 'সিন্ধু টাইমস্' ও 'সিন্ধু সুধার' নামে দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। হীরানন্দ কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছেন। সেই সময়ে কেশব বাবু ও পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরমহংসদেবকে দর্শন ও তাঁহার নিকট বাস করিতেন। সরল, মিষ্টভাষী ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া, পরমহংসদেব হীরানন্দকে স্নেহ করিতেন। আবার, পরমহংসদেবের প্রতিও তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অসুখের সংবাদ পাইয়া, হীরানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সুদূর সিন্ধুদেশ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। হীরানন্দ আসিলে পর, পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

উত্তর কালে শ্রীযুক্ত হীরানন্দের ধর্ম্মজীবন অতি উন্নত হইয়াছিল। ফলে, তিনি স্বদেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, মহাপুরুষ রূপে পূজিত হইয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৮৮৪। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরমহংসদেবের একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন। উপেন্দ্র বাবু প্রথমে একটী ছোট বহির দোকান করেন। লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হওয়ায়, ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র দোকান হইতেই বর্ত্তমান 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' গড়িয়া উঠে। পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর, উপেন্দ্র-

নাথ ক্রমশঃ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি সাধু-সেবার জন্য মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিতেন।

তারক মুখোপাধ্যায়—১৮৮৪—৮৫। তারক নামে একটী উনিশ বিশ বৎসরের যুবক মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নিকট আসিতেন। তাঁহার বাড়ী বেলঘরিয়াতে। আবার কলিকাতায় বৌবাজারের কাছে তাঁহাদের একটী বাসাও ছিল। শ্রীযুক্ত তারকের মাতাপিতা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বারণ করিতেন। এই সম্পর্কে একদিন পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর লাভের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘন করলেও, কোন দোষ হয় না"। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি ভরত ও বিভীষণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভরত রামের জন্য মাতা কৈকেয়ীর কথা রক্ষা করেন নাই; বিভীষণ রামের জন্য রাবণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তারক শুদ্ধ-সত্ত্ব আধার এবং পরমহংসদেবের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিন্তু চাকুরী, সংসারের দুর্ভাবনা প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে ধর্ম্মভাব তেমন বিকশিত হয় নাই। এই নিমিত্ত, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে একরূপ অপরিচিত হইয়া রহিয়াছিলেন। তারক বিবাহিত ছিলেন বলিয়া,পরমহংসদেব তাঁহাকে কামিনী-কাঞ্চন হইতে খুব সাবধান থাকিতে উপদেশ দিতেন।

নিত্যগোপাল গোস্বামী—১৮৮৪—৮৫। ঢাকা নিবাসী নিত্যগোপাল গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন এবং অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত

হইয়া, আপন মনোবাসনা পূর্ণ করেন। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল যখন পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি আহার করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি আহার করিয়া উঠিলেন এবং ঈশ্বর-প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। পরমহংস-দেবের সঙ্গগুণে, নিত্যগোপাল ভগবৎ আনন্দের সন্ধান ও আস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অক্ষয় কুমার সেন—১৮৮৫। পরমহংসদেবের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সময়ে যে জমিদার বাড়ীতে কাজ করিতেন, অক্ষয় কুমার সেন সেখানে গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয় কুমারের অনুরোধে, এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। তৎপর, সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে, পরমহংসদেবের প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমে তিনি তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কাশীপুর উদ্যানে অবস্থান কালে, একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে কৃপা করিয়া মন্ত্রদান ও বিশেষ রূপে আশীর্ব্বাদ করেন। পরবর্ত্তী কালে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' নামক পরমহংসদেবের লীলাগাঁথা রচনা করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ গ্রন্থের পাতায় পাতায়, তাঁহার অতুলনীয় গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' অক্ষয়কুমারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

ভাই ভূপতি—১৮৮৫। ভূপতি নামক একজন কলেজের ছাত্র পরমহংসদেবের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপতি কিছুকাল বলরাম বাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, ইনি 'ভাই-ভূপতি' নামে পরিচিত হন। শুনা যায়, একবার পরমহংসদেব কৃপা করিয়া তাঁহার বক্ষে পদ-স্থাপন করিলে, তিনি ইষ্টের দর্শন পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অবিরাম ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, তিনি অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। শেষকাল পর্য্যন্ত, তাঁহার জপ একই ভাবে চলিয়াছিল। তিনি অল্পভাষী ছিলেন এবং ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্য ও শিশুর ন্যায় সরল ভাব লক্ষ্য করিয়া, পরবর্ত্তী কালে অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

কালীপদ ঘোষ—১৮৮৫। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের বন্ধু, বাবু কালীপদ ঘোষ কলিকাতার 'জন ডিকিন্সন্ কোম্পানীতে' কাজ করিতেন। গিরিশ বাবুর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়া, একদিন কালীপদ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। কালীপদ পরমহংস-দেবের গৃহে প্রবেশ করিলে, তিনি তাঁহার সহিত পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন এবং কথায় কথায় তাঁহার নিকট কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরমহংসদেবকে কালীপদের বেশ ভাল লাগিল। সেই নিমিত্ত, তিনি নিজের নৌকায় করিয়া, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া চলিলেন। নৌকায়

পরমহংসদেব ও কালীপদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বেশ জমিয়া গেল। ফলে, পরমহংসদেব কৃপা-পরবশ হইয়া, তাঁহার জিহ্বাগ্রে একটা মন্ত্র লিখিয়া, তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় কোথায় যাইবেন, পূর্ব্বে কিছুই স্থির করেন নাই; শুধু একটা খেয়াল বশতঃই যেন চলিয়া আসিয়াছেন। নৌকা ঘাটে পৌঁছিলে, তিনি অন্য কোথাও না যাইয়া, কালীপদের গৃহেই গমন করিলেন। একদিন কয়েক ঘণ্টা মিশামিশির ফলেই, কালীপদ পরমহংসদেবের অনুগত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। একবার পরমহংসদেব তাঁহার বক্ষে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোর চৈতন্য হোক্"। কালীপদের চৈতন্য হইয়াছিল। *

অতুল চন্দ্র ঘোষ--১৮৮৫। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের ভ্রাতা অতুল চন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন।

---

* পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে, কালীপদের চরিত্রে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। তাহাতে পরিবারের মধ্যে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইত। তাঁহার স্ত্রী দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা জানিতে পারিয়া, এক দিবস তাহাদের পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে রাসমণির কালীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীর চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত পরমহংসদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ইহার অল্প কয়েক দিন পরেই, কালীপদ পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছিল।

অতুল বাবু প্রথমতঃ ব্যঙ্গ করিয়া, পরমহংসদেবকে 'রাজহংস' নামে অভিহিত করিতেন। গিরিশের নিকট এই কথা জানিতে পারিয়া, এক দিবস পরমহংসদেব অতুল বাবুকে বলিলেন, "সে কিগো, রাজহংস ত ভাল কথা। সে যে হাঁসের রাজা; আবার দুধে জলে এক করে দিলে, দুধটুকু খেয়ে নেয়"। ইহাতে অতুল বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া, চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই, অতুল বাবুর মনের গতি ফিরিয়া গেল এবং তিনি পরমহংসদেবের কৃপার অধিকারী হইলেন। পরমহংসদেবের অসুখের সময়, অতুল বাবু তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

হরিবল্লভ ও নিমাইচরণ বসু প্রভৃতি—১৮৮৫। শ্রীযুক্ত বলরাম বসু পরমহংসদেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর, বলরামের পিতা, স্ত্রী-পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য সকলেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বলরাম বাবুর খুল্লতাত পুত্র, শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ বসু প্রথমে রামকৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন। হরিবল্লভ বাবু কটকে সরকারী উকিলের কাজ করিতেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। একবার হরিবল্লভ বাবু কলিকাতা আসিলে, গিরিশ বাবু তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া গেলেন। তখন পরমহংসদেব অসুস্থ হইয়া, কলিকাতার শ্যামপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার দিব্যসঙ্গ ও পূতস্পর্শে, শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ সেদিন হইতে নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। ক্রমে নিমাই বাবুরও মত পরিবর্ত্তন হইল। বলরাম বাবুর শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী ও তাঁহার শ্যালক

শ্রীযুক্ত তুলসীরাম, বাবুরাম এবং শান্তিরামও পরমহংসদেবের পূতসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর কালে, এই বাবুরামই সংসার ত্যাগ করিয়া, 'প্রেমানন্দ' নামে অভিহিত হন। পাঠক ইঁহার জীবন-কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

প্রভুদয়াল মিশ্র—১৮৮৫। পরমহংসদেব যখন চিকিৎসার্থ কলিকাতার শ্যামপুকুরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রভুদয়াল মিশ্র নামে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, পরমহংসদেবের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের কোনও খৃষ্টান বংশে শ্রীযুক্ত মিশ্রের জন্ম হয়। তাঁহার অন্তরে ত্যাগের ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া, তিনি সাহেবি পোষাকের নীচে ভারতীয় প্রথা অনুসারে, সন্ন্যাসিগণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিতেন। এক ভ্রাতার বিবাহের দিনে, দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিলে, তিনি ঐ দিন হইতেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, ত্যাগী জীবন যাপন করিতে থাকেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিবসেই, অল্পক্ষণ প্রসঙ্গের পরে, পরমহংসদেব ও মিশ্র একে অন্যের প্রতি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইলেন এবং মিশ্র তাঁহার সাহেবি পোষাক খুলিয়া, পরমহংসদেবকে গেরুয়া ও কৌপীন দেখাইলেন। সরল বিশ্বাস ও ইষ্টচিন্তার ফলে, ইতিপূর্ব্বেই তিনি খৃষ্টাবতার যীশুর দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শনানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাদুড়ী ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত—১৮৮৫। শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে অবস্থান কালে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাদুড়ী ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত পরমহংসদেবকে

দর্শন করেন। ইঁহারা কিছুকাল হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎসাও করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি ইঁহারা বেশ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন।

মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত—১৮৮৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র। তিনি এখনও জীবিত আছেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণের বয়স যখন এগার বার বৎসর, তখন তিনি শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ও অন্যান্য সমবয়স্ক ছেলেদের সহিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বেড়াইতে যাইয়া, দুই চারি বার পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পরমহংসদেবের সহিত মণীন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হয়। তখনও মণীন্দ্রের বয়স মাত্র পনর ষোল। এই কারণে, ভক্তগণ তাঁহাকে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। বয়স অল্প হইলেও, মণীন্দ্র ভগবানের নাম গান ও সংকীর্ত্তনে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেন। শ্যামপুকুরে পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন দিনে, মণীন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় দর্শন দিনে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়া, সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে, খোকা ভাবে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। ঐ দিন খোকা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গোপাল চন্দ্র ঘোষ—শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীতে 'ছোট গোপাল' বা 'হুটকো গোপাল'

নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সহিত বাস করিতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বড়কালী—শ্রীযুক্ত বড়কালী কোন আফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। ঐ চাকুরী দ্বারাই তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার পোষণ করিতে হইত। বড়কালী পরমহংসদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তজ্জন্য, তিনি মধ্যে মধ্যে আফিস হইতে ছুটী লইয়াও, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। হাজরা সর্ব্বদা ভক্তগণের সম্বন্ধে অপ্রিয় সমালোচনা করিতেন বলিয়া, একদিন বড়কালী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কষ্টি-পাথরের মত কে ভাল, কে মন্দ, পরখ করে বেড়াও, অত পরনিন্দা করা কি ভাল?"

গিরিশ চন্দ্র সেন—শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন নব-বিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতও রচনা করিয়াছিলেন।

যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ—যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি যখন ভক্তিভরে গান গাহিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। ইহাতে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে ভগবৎ-ভাবের উদ্দীপনা হইত। পরমহংসদেব তাঁহার গান শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। একদিন নীলকণ্ঠ পরমহংসদেবের গৃহে ভক্তগণ সঙ্গে শ্যামা-সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহাদের সহিত উদ্দাম নৃত্য করিয়াছিলেন।

নকুড় বাবাজী—শ্রীযুক্ত নকুড় বাবাজী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমহংসদেব পূর্ব্বে যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত ঝামাপুকুরে বাস করিতেন, সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে, তিনি নকুড় বাবাজীর দোকানে যাইয়া বসিতেন। তাই তাঁহার সহিত বহুদিনের পরিচয়। পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসবের দিনে, নকুড় বাবাজী প্রায় প্রতি বৎসরই তথায় যাইতেন এবং দক্ষিণেশ্বর হইয়া, পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন।

অন্যান্য ভক্তগণ—ইহা ছাড়া, বলরাম বাবুর পুরোহিত-বংশীয় শ্রীযুক্ত ফকির, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতুল, লাট-সাহেবের আফিসের পদস্থ কর্ম্মচারী হরীশ চন্দ্র মুস্তফী, মাষ্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরী মোহন গুপ্ত, রামচন্দ্র দত্তের মাতুল উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্র, বরাহনগরের হরমোহন মজুমদার, আগড়পাড়ার আশু, পাণিহাটীর মণি সেন, দমদমের মাষ্টার যজ্ঞেশ্বর, রাম চাটার্জ্জি, গিরীন্দ্র, বিহারী, যোগীন সেন, যোগীন বসু, এবং ব্রাহ্ম ভক্ত ভবানী (পরে ব্রহ্মবান্ধব), অমৃত লাল বসু প্রভৃতি আরও বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি কেহ একাধিক, আবার কেহ-বা বহুবার পরমহংসদেবের পুণ্যদর্শন ও দিব্যসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমা ও মহিলাভক্ত-প্রসঙ্গ

শ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-ভাব আলোচনা কালে, আমরা ৺ষোড়শী পূজা প্রভৃতি প্রসঙ্গ-ক্রমে, শ্রীযুক্তা সারদামণির কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। পরমহংসদেব কিরূপে তাঁহাকে ঐহিক ও পারত্রিক ছোট-বড় সকল বিষয়ে শিক্ষা দ্বারা, সামান্য লোক-ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয়ের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীমাও উপযুক্তা হিন্দু সহধর্ম্মিণীর ন্যায় যেরূপে পরমহংসদেবকে ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহার মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে আমরা যে সরলতা, পবিত্রতা, ভক্তি, করুণা ও উদারতার ছবি দেখিতে পাই, তাঁহার পরেই শ্রীমার চরিত্রে উহা সব চেয়ে বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। মা যেন বাস্তবিকই 'জগতের মা' হইয়া ছিলেন। স্বামীর লোকান্তর-প্রাপ্তির পরে, তিনি তাঁহার শিষ্য-সেবক এবং বহু ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট নরনারী ও পাপীতাপীকে, মাতার ন্যায় বাৎসল্য, করুণা ও স্নেহ-ভরে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব অনেক সময়েই আগন্তুকগণের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব

পরীক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু শ্রীমা, নির্ব্বিচারে সকলকেই ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, চরণে আশ্রয় দিয়াছেন। তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত হইতেন ; কিন্তু তাঁহার চাল-চলনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমানের ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি যেমন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা রূপে জন্মিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি খাঁটি হিন্দু-কুলবধূর ন্যায়, লজ্জার অবগুণ্ঠনে, অতি সামান্য ভাবে সারা জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। শ্রীমা সাধারণ কুলবধূদের মত,দিবসের সকল সময় অবিশ্রান্ত ভাবে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, এরূপ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন যে, তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি বাস্তবিকই অমিত-তেজঃসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির তুলনা হয় না।

শ্রীমা অনেক বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিয়াছেন। সেখানে কালীবাটীর কর্ম্মচারী, অতিথি-অভ্যাগত এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও আগন্তুকগণের সংখ্যা নেহাৎ অল্প ছিল না। কিন্তু সেখানকার কেহ কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি স্বল্প-পরিসর নহবতের ছোট ঘরখানিতে, মাসের পর মাস শ্বশ্রূমাতার সহিত বাস করিয়া, যথাসাধ্য স্বামী ও শ্বশ্রূমাতার সেবা করিতেন। মথুর বাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা জগদম্বা দাসীর অসুখ নিজে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার পর হইতে, পরমহংস-দেব আজীবন ঐ অসুখে (পেটের অসুখ) ভুগিয়াছেন। কালীবাটীর মন্দিরের ভোগরাগ শেষ হইতে সর্ব্বদাই অনেক

দেরী হইত এবং প্রসাদ পাইতে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। এই কারণে, সময় মত আহারের নিমিত্ত, শ্রীমা তাঁহাকে প্রত্যহ ঝোল-ভাত রাঁধিয়া দিতেন। দরিদ্র গৃহে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বালিকা বয়স হইতেই রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মে অভ্যস্তা ছিলেন।

বড় ফুল ফুটিতে দেরী হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্মের পূর্ণ বিকাশে বার বৎসর সময় লাগিয়াছিল। শ্রীযুক্তা সারদামণির হৃৎপদ্মও দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ছোট ঘরখানিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে, রামকৃষ্ণ-রূপ জ্ঞান-সূর্য্যের প্রভায় ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল! শ্বশ্রূমাতা, স্বামী ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবার জন্য সারদামণিকে যে কর্ম্ম করিতে হইত, তাহা তেমন বেশী কিছু নয়। ইহা আমরা সহজেই অনুমানও করিতে পারি। কাজেই দিবসের অনেক সময়, তিনি অবসর পাইতেন। কিন্তু দিনের বেলা যথেষ্ট অবসর থাকা সত্ত্বেও, তিনি রাত্রি তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন এবং শৌচ, গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জপতপে নিবিষ্ট হইতেন। আর দিনের বেলায় তিনি গৃহের বাহিরে আসিতেন না। এইরূপে কঠোর সাধনা করিয়া, ক্ষুদ্র গৃহে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবার ফলে, ঐ সময়ে শ্রীমার পায়ে যে বাতের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সারা জীবন কষ্ট পাইয়াছেন। একদিন শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া, সারদামণি অন্ধকারে একটা কুমীরের গায়ে প্রায় পা দিয়াছিলেন। কুমীরটা ঘাটের

উপর উঠিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ পদশব্দে ভয় পাইয়া, নিদ্রিত কুম্ভীর লম্ফ দিয়া জলে পড়িল। ইহার পর হইতে, তিনি অন্ধকার রাত্রে আলো না লইয়া ঘাটে যাইতেন না।

সন্ধ্যার পর, সকল লোকজন চলিয়া গেলে, রামকৃষ্ণ কখন কখন সারদামণিকে আপন গৃহে ডাকিয়া, নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। ঐ সময়ে, মধ্যে মধ্যে সারদামণি তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন। একদিন স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমার কি বলিয়া মনে হয়?" ইহার উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যে মা আদ্যাশক্তি রূপে মন্দিরে বিরাজিত, তিনিই বর্ত্তমানে গর্ভধারিণী রূপে নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই অন্য এক রূপে এখন আমার পদসেবায় রত আছেন। জগতের সকল রমণীকেই মা আনন্দময়ীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া আমার বোধ হয়। তোমাকেও সেই রূপেই প্রত্যক্ষ করি"। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবে আপন স্ত্রীকে মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারই শিক্ষা ও উপদেশ গুণে, সারদামণিও তাঁহাকে সেইরূপ নারায়ণ জ্ঞানে আজীবন সেবা ও পূজা করিয়া গিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, রামকৃষ্ণ একবার ক্রমাগত আট মাস কাল, পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। সারদামণি স্বামীর ন্যায় একান্ত শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতি এবং ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সহায় না হইলে, অন্ততঃ ঐ সময়ের জন্যও, রামকৃষ্ণের মনে দেহ-বুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে?

ধর্ম্ম, লোক-ব্যবহার ও উপস্থিত বিষয়ে, সারদামণির কিরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল, তাহা নিম্নোক্ত তিনটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

(১) একবার লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক মাড়োয়ারী ভক্ত, পরমহংসদেবের সেবার নিমিত্ত দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিতে চাহিলে, তিনি সারদামণিকে উহা গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাতে বুদ্ধিমতী সারদা বলিয়াছিলেন, "আমি টাকা লইয়া কি করিব ? আর যদি আমি উহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে প্রকারান্তরে, তোমারই উহা গ্রহণ করা হইবে। কারণ, ঐ অর্থ তোমার সেবা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই আমি ব্যয় করিব। সকলেই তোমাকে ত্যাগী বলিয়া সম্মান করে। এই অর্থ আমি গ্রহণ করিলেও, তুমি নিশ্চিতই লোকের নিকট হীন প্রতিপন্ন হইবে"। বাস্তবিক, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে পরীক্ষা করিবার জন্যই, এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সারদামণির নির্লোভিতা ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

(২) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে, পরমহংসদেব শেষবার ভক্তগণ সহ পাণিহাটীর মহোৎসবে গমনের উদ্যোগ করিলে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে বহু পুরুষ ও স্ত্রী ভক্ত, তাঁহার সহিত উৎসবে যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইলেন। স্বামী ও ভক্তগণকে দল বাঁধিয়া উৎসবে যাইতে দেখিয়া, শ্রীমারও তাঁহাদের সহিত যাইবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক মনে করিয়া, পরমহংসদেব জনৈক স্ত্রী-ভক্তের দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, সকলেই উৎসবে

যাইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন। কিন্তু স্বামী তাঁহার গমন বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন নাই জানিয়া, শ্রীমা পাণিহাটী গমনে বিরত হইলেন। তিনি স্ত্রী ভক্তটীকে বলিয়া দিলেন, এত লোকের ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর-দর্শনাদি তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে, তাই তিনি যাইবেন না। শ্রীমার এইরূপ আচরণে, রামকৃষ্ণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি বেশ বুদ্ধিমতীব কাজ করিয়াছেন। কারণ, উৎসব-ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে গেলে, লোকে হয়ত বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "হংস আর হংসী এসেছে"।

(৩) ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাসে,সারদামণি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ইহার পব হইতে, ১২৯৩ সনে পরমহংসদেবের মহাসমাধির সময় পর্য্যন্ত, প্রায়ই তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন। সারদামণি গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতেই লালিত-পালিত। কাজেই সহরের কৃত্রিম চাক-চিক্য ও বদ্ধ-বায়ু তাঁহাব সহ্য হইত না। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী তখন নির্জ্জন গ্রাম মধ্যে অবস্থিত হইলেও, নহবতের ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ থাকাব ফলে অসুস্থ হইয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে জয়রামবাটী বা কামারপুকুর যাইয়া কিছুকাল বাস করিয়া আসিতেন। একবার সারদামণি রামকৃষ্ণের ভাই-পো ও ভাই-ঝি (শিবরাম ও লক্ষ্মীমণি) এবং অপর কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষের সহিত কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছিলেন। রাস্তায়

আরামবাগ (জাহানাবাদ) ও তারকেশ্বরের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ ব্যাপিয়া তেলোভেলো ও কৈকলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ঐ প্রান্তর মধ্যে সেই সময়ে খুব ডাকাতের উপদ্রব ছিল। সারদামণি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ মাঠের মধ্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, সূর্য্য ডুবু-ডুবু হইল। সকলেই তখন ডাকাতের ভয়ে, প্রাণপণে পথ চলিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চলিতে, সারদামণির বেশ কষ্ট হইতেছিল। তাঁহার জন্য সকলে যাহাতে বিপদে না পড়েন, সেই নিমিত্ত তিনি সঙ্গিগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া, যথাসাধ্য হাঁটিতে লাগিলেন। সারদামণি কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই, তাঁহার সঙ্গিগণ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল এবং ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিল। উদ্‌বিগ্না সারদামণি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মাঠের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক বাগ্‌দি দম্পতী মাঠের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিল। দৈবক্রমে, তাহারা সারদামণির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। যষ্টিস্কন্ধে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, ভীষণ-দর্শন বাগ্‌দি কিছু দূর হইতে সারদামণিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সন্ধ্যাবেলা তুমি কে-গা, অন্ধকারে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ ?” তিনি ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, “বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমায় ফেলে চলে গেছে, তুমি যদি আমায় তাদের কাছে পৌঁছে দাও ! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর কাছেই যাব”। ইতিমধ্যে, সারদামণি বাগ্‌দি-পত্নীকে

দেখিতে পাইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিকটে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। সঙ্গীরা আমায় পথে ফেলে গেছে। ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসেছ"। সারদামণির মধুর পিতৃ-মাতৃ সম্ভাষণে, বাগ্‌দি-দম্পতীর হৃদয় স্নেহ ও করুণায় বিগলিত হইল। তাহারা সারদাকে সযত্নে নিকটবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক দোকানে লইয়া গেল। সেখানে মুড়ি-মুড়কি ক্রয় করিয়া, তাঁহাকে খাওয়াইল এবং বাগ্‌দি-পত্নী নিজ বস্ত্রাদি দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া, তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তৎপর, তাহারা সারদামণিকে কন্যাবৎ সমস্ত রাত্রি রক্ষা করিয়া, পরদিন সকালবেলা তারকেশ্বরে তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

পরমহংসদেবের শেষ অসুখের সময়, যখন তিনি শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমা, স্থানাভাবে সারাদিন অপরিচিত পুরুষ সকলের মধ্যে থাকিয়া এবং অশেষ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কাশীপুর উদ্যান-বাটীতেও তিনিই পূর্ব্বাপর তাঁহার পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংসদেব মহাসমাধি অবলম্বন করেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীর দেহ সৎকারের পর, যখন শ্রীমা আপন অলঙ্কার সমূহ খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, কেবলমাত্র সোণার বালা হাতে রহিয়াছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবিতাবস্থায় সুস্থ দেহে যেরূপ ছিলেন, সেইরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বালা খুলিতে

বারণ করিলেন। এই নিমিত্ত, শ্রীমা হাতের বালা খুলিলেন না, সাদা ধুতিও পরিলেন না। ইহার পর হইতে, তিনি সর্ব্বদা সরু লালপেড়ে কাপড় পরিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ কালে, শ্রীমার বয়স মাত্র তেত্রিশ বৎসর। ইহার পর, তিনি আরও চৌত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এই চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে, প্রথম কয়েক বৎসর তিনি কঠোর সাধনা করিয়া, নানা দিব্যদর্শন ও সমাধির আস্বাদ লাভ করেন। পরমহংসদেবের অদর্শনের অব্যবহিত পরেই, তিনি ৺কাশী হইয়া ৺বৃন্দাবনে যাইয়া, এক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে, তিনি একবার হরিদ্বারও গমন করিয়াছিলেন। ইহার পর, তিনি নানা সময়ে ৺কাশী, ৺প্রয়াগ, ৺বৃন্দাবন, ৺পুরী, ৺রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেন। ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ শ্রীমার জন্ম এবং ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (জুলাই, ১৯২০ খৃঃ) ৬৭ সাতষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়।

ব্রাহ্মণী অঘোরমণি (গোপালের মা)

(১৮৮৪ শেষ)

শ্রীযুক্তা অঘোরমণির পিত্রালয়, দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই তিন মাইল দূরে, কামারহাটীর নিকটে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই পতিহারা হইয়া, তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। কুলীন

ব্রাহ্মণ-কন্যা অঘোরমণি, গোবিন্দচরণ দত্ত নামক পটলডাঙ্গার জনৈক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির পুরোহিত-বংশীয়া। গোবিন্দ বাবু লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত অঘোরমণির পরম সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল। তাই তিনি তখন হইতে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া,৺গোবিন্দ বাবু প্রতিষ্ঠিত কামারহাটীর ঠাকুর-বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। অঘোরমণি নিত্য গঙ্গাস্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন ও ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবাকার্য্যে সাহায্য করিয়া, আনন্দে দিন কাটাইতেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপাল-ভাবটীই সন্তান-হীন, বালবিধবা অঘোরমণির অতিশয় প্রিয় ছিল। তজ্জন্য, তিনি বৈষ্ণব গুরুর নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শৌচ, স্নানাহার, ঠাকুর-সেবা ও স্বল্প নিদ্রার জন্য, তাঁহার কয়েক ঘণ্টা মাত্র ব্যয়িত হইত। আর দিবারাত্রের অবশিষ্টাংশ, তিনি বালগোপালের ধ্যানচিন্তা ও জপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। অঘোরমণি রাত্রি দুইটায় শয্যাত্যাগ করিয়া, তিনটার সময় নিত্য নিয়মিত জপে বসিতেন। এইরূপে, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কামারহাটীর ঠাকুর-বাড়ীতে বাস করিবার পর, তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন করেন।

পরমহংসদেবকে দর্শন অবধি, অঘোরমণির মন অনেক সময়ে জপ-তপের মধ্যেও দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিত এবং তিনি তাঁহার চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন। আবার অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণের ফলে, তিনি সময়ে সময়ে কালীবাটীতে আসিয়াও, তাঁহাকে দর্শন করিতেন।

পরমহংসদেবও শিশু-সন্তানের ন্যায় আনন্দে, তাঁহার আনীত সামান্য সন্দেশাদি গ্রহণ করিতেন এবং দেখা হইলেই, তাঁহার হাতের রাঁধা ব্যঞ্জনাদি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার আব্দার ও বাড়াবাড়িতে, দরিদ্র ব্রাহ্মণী বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন, "ভগবান্, আজীবন তোমার চিন্তা করে এই হল? এ আবার কোন্ বিপদে ফেললে প্রভু! এই পাগলা সাধুর আব্দারে পড়ে, আমার যে প্রাণান্ত!" এদিকে কিছুকাল পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াতের পরেই, অঘোরমণির আধ্যাত্মিক অনুভূতির উৎস-দ্বার খুলিয়া গেল। একদিন রাত্রিশেষে জপে বসিয়া, তিনি প্রথমে পরমহংসদেবকে দেখিলেন; তারপর চির-আকাঙ্ক্ষিত বালগোপালের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। কেবল-মাত্র একবার গোপালকে দেখিয়াই, তাঁহার দর্শনের পরিসমাপ্তি হইল না। এখন হইতে গোপাল আহার, বিহার, গৃহকর্ম্ম, সকল কাজের মধ্যেই অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, কখন তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিত, আবার অন্য সময়ে তাঁহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে রত হইত। গোপাল মধ্যে মধ্যে আব্দারে ছেলের মত, তাঁহাকে ক্ষীর, সর, ননীর জন্য পীড়াপীড়ি করিত। দরিদ্র ও সহায়-সম্বল-হীন ব্রাহ্মণী, তখন নিজ অভাবের কথা স্মরণ করিয়া, কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এইরূপে প্রায় দুই মাস কাল, অঘোরমণি গোপালের সহিত দিব্য লীলা-বিলাসে কাটাইলেন। তৎপর তাঁহার দিব্য ভাবের কতকটা উপশম হইল। কিন্তু তথাপি সকল সময়েই, তিনি ইচ্ছামাত্র গোপালের দর্শন পাইতেন।

অঘোরমণি প্রথম দিন, ৺গোবিন্দ বাবুর পত্নী ও তাঁহার অন্য একজন আত্মীয়া রমণীকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর, তিনি একাকীই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন। পরমহংসদেব অঘোরমণিকে 'কামারহাটীর বামণী' নামে নির্দ্দেশ করিতেন। প্রথম যে দিন ব্রাহ্মণী, রাত্রিশেষে নিজ ইষ্ট বালগোপালের অবিরাম দর্শন পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন, সেই দিন রাত্রি প্রভাত হইতেই, তিনি প্রাণের উল্লাসে তাঁহার গোপালকে বুকে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণকেও গোপাল-বোধে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রামকৃষ্ণও শিশু-কৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া,ব্রাহ্মণীকে 'মা যশোদা' জ্ঞানে,উক্ত আহার্য্য সমূহ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে, অঘোরমণি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ ইষ্ট গোপাল রূপে দেখিতেন এবং রামকৃষ্ণও তাঁহাকে 'গোপালের মা' বলিয়া ডাকিতেন।

বিধবাদের মধ্যে অনেকেই খুব আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। গোপালের মার শৌচাচার এত বেশী ছিল যে, তাঁহাকে শুচিবাই-গ্রস্তা বা ছুৎমার্গী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাইবার পর, তাঁহার আচার-বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তগণ, নানাপ্রকার ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া, পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথকে যে তিনি ঐ সকল কামনা-জড়িত দ্রব্য আহার করিতে দিতেন, ইহাও বলা হইয়াছে।

মহিলা ভক্তগণের মধ্যে, তিনি কেবল মাত্র গোপালের মাকে দুই চারি বার উহা ভোজন করিতে দিয়াছেন।

পরমহংসদেব একবার গোবিন্দ বাবুর পত্নীর অনুরোধে এবং দ্বিতীয় বার গোপালের মার নিমন্ত্রণে—মোট দুইবার,—গোপালের মার আবাস-স্থল কামারহাটীর ঠাকুর-বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। গোপালের মা সময়ে সময়ে সকল জীবের মধ্যেই দিব্যরূপ-ধারী গোপালকে দেখিতে পাইতেন এবং সকল সময়েই, ইচ্ছামাত্র গোপালের দর্শন লাভ করিতেন। গোপালের দর্শন তাঁহার নিকট নিত্যনৈমিত্তিক ও অতি স্বাভাবিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে 'মা যশোদা'র ভাব অনুক্ষণ প্রকট দেখিয়া, ভক্তগণ মুগ্ধ হইতেন। পরমহংসদেবের মহাসমাধির পরেও, গোপালের মা চব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে, তিনি কখন কখন বরাহনগর, আলমবাজার প্রভৃতি মঠে আসিতেন। গোপালের মা শেষ বয়সে, সন্ন্যাসিনীগণের ন্যায় গেরুয়া কাপড় পরিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশীয়া শিষ্যা, ভগিনী নিবেদিতা, এদেশে আসিয়া, গোপালের মার অদ্ভুত ভক্তি ও দর্শনাদির কাহিনী শুনিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে কলিকাতাস্থিত বাগবাজারের বসুপাড়ায় নিজ বাস-ভবনে রাখিয়া, দুই বৎসর পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। বসুপাড়ায় ভগিনী নিবেদিতার নিকট অবস্থান কালেই, ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় (৮ই জুলাই, ১৯০৬ খৃঃ) প্রাতঃকালে, গোপালের মার সংসার-লীলার যবনিকা-পাত হয়।

গৌরদাসী (গৌরী মা)

(১৮৮৩—৮৪)

শ্রীযুক্তা গৌরদাসী সর্ব্বসাধারণের নিকট 'গৌরী মা' নামে পরিচিতা। গৌরী মা অল্প বয়সেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, ৺বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং বৈষ্ণব মতে সাধন ভজন করিতে থাকেন। একবার ভক্ত-প্রবর বলরাম বসু ৺বৃন্দাবনে গমন করিলে, গৌরী মা তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহার সঙ্গেই কলিকাতায় আসিয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনেই গৌরী মা রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হন। ইহার পর, সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনের ফলে, পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। কখন কখন তিনি কালীবাটীতে যাইয়া, নহবতে শ্রীমার নিকট বাস করিতেন এবং পরমহংসদেবের জন্য রন্ধনাদি করিয়া, তাঁহার সেবা করিতেন। নিজ শুভ সংস্কার ও পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদে, গৌরী মা অল্পকাল মধ্যেই অতীন্দ্রিয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গৌরী মা আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করিয়াও, এদেশের নারীজাতির দুঃখদৈন্য ভুলিতে পারেন নাই। বালিকাদিগকে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য, তিনি অনেক কাল যাবৎ কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে, তিনি কলিকাতায় 'সারদেশ্বরী আশ্রম' নামক একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া, আমাদের দেশীয়

ধরণে স্ত্রী-শিক্ষা দ্বারা নারীজাতির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার শিষ্য-সেবকগণের অর্থানুকূল্যে এবং সর্ব্বসাধারণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় প্রতিষ্ঠানটী চলিতেছে।

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস (যোগীন মা)

(১৮৮৩—৮৪)

পরমহংসদেবের ভক্ত যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীতে 'যোগীন মা' নামে পরিচিতা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' তিনি 'গণুর মা' নামে অভিহিতা হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার একমাত্র কন্যার ডাক নাম ছিল গণু। যোগীন মার পিত্রালয় কলিকাতার বাগবাজারে। খড়দহের জমিদার অম্বিকাচরণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যোগীন্দ্রমোহিনী প্রথম হইতেই বেশ ভক্তিমতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামীর জীবন-ধারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবাহের কিছুকাল পরে, একান্ত পানাসক্ত স্বামীর সহিত জীবনের আদর্শ লইয়া বিশেষ মনোমালিন্য ঘটায়, যোগীন্দ্রমোহিনী পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত বলরাম, সম্পর্কে যোগীন মার মামা-শ্বশুর ছিলেন। বলরাম বাবুর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়া, তিনি তাঁহাদের বাড়ীতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। ইহার পর, যোগীন মা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত

করিতে লাগিলেন। শ্রীমা তখন কালীবাটীর নহবতে বাস করিতেছিলেন। ক্রমে, তাঁহার সহিতও যোগীন মার পরিচয় হইল। যোগীন মা স্বভাবতঃই উচ্চদরের সাধিকা ছিলেন। কাজেই নিজ সাধনা ও পরমহংসদেবের উপদেশ গুণে, তিনি অচিরেই দিব্য আনন্দের অধিকারিণী হইলেন।

পরমহংসদেবের জীবৎকালে, যোগীন্দ্রমোহিনী সুযোগ মত তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে, তিনি আজীবন শ্রীমার সেবা করিয়াছেন। যোগীন মা অনুক্ষণ নিরলস ভাবে ভগবানের স্মরণ-মনন ও জপধ্যান করিতেন। স্বভাব-সুলভ কঠোর সাধনা দ্বারা, তিনি সমাধি ও নানা দিব্য-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩৩১ সনের ২১শে জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতার বাগবাজারে শ্রীমার বাটীতে তাঁহার শরীরত্যাগ হয়।

গোলাপসুন্দরী দেবী (গোলাপ মা)

(১৮৮৫ মধ্যভাগ)

ব্রাহ্মণ-কন্যা গোলাপসুন্দরী কলিকাতার বাগবাজারে বাস করিতেন। তিনি অল্প বয়সে একটী পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার অতি আদরের ধন পুত্রটীও কয়েক বৎসর মধ্যেই লোকান্তরিত হইল। গোলাপসুন্দরীর অবস্থা সচ্ছল ছিল না; কিন্তু তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ছিলেন। আর তাঁহার কন্যাটীও সুশ্রী ও গুণবতী ছিল। নিজ বংশের

কৌলীন্য বলে ও কন্যার রূপে-গুণে, তিনি কন্যাটীকে পাথুরিয়া-ঘাটার ঠাকুর-পরিবারে, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু, অল্পকাল মধ্যেই দুরন্ত কাল ব্রাহ্মণীর শেষ-সম্বল কন্যাটীকেও চয়ন করিয়া লইল। পর পর স্বামী, পুত্র ও কন্যাকে হারাইয়া, ব্রাহ্মণী শোকে জর্জ্জরিতা হইলেন। গোলাপসুন্দরী যোগীন্দ্রমোহিনীর প্রতিবেশী; কাজেই তাঁহারা একে অন্যের সহিত পরিচিতা ছিলেন। যোগীন মা ইতিপূর্ব্বে পরমহংসদেবকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। তাই তিনি গোলাপসুন্দরীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, দুই চারি দিন তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ পাইয়া, ব্রাহ্মণীর শোক দূর হইল। ধন্য সেই দুঃখ-বিপদ, যাহা মানবকে শান্তি ও মুক্তির পথে লইয়া যায়!

গোলাপসুন্দরী পরবর্ত্তী কালে 'গোলাপ মা' নামে অভিহিতা হইতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' বলিয়া তাঁহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই, শ্রীরামকৃষ্ণ কতিপয় ভক্ত সহ গোলাপ মার বাগবাজারের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। 'কথামৃত' তৃতীয় ভাগের ঊনবিংশ খণ্ডে উহার চিত্র দেখিলে, পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন, রামকৃষ্ণের দর্শন পাইলে ব্রাহ্মণী কিরূপ আনন্দে আত্মহারা হইতেন এবং অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার শুভাগমনে, ঐ দিবস ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে কেমন আনন্দের হাট বসিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময়, গোলাপ মা মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে শ্রীমার নিকট দুই চারি দিন থাকিয়া ও তাঁহার নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মহাসমাধির অল্প কয়েক দিবস পরেই, গোলাপ মা শ্রীমার সহিত বৃন্দাবনে যাইয়া, এক বৎসর কাল সেখানে তাঁহার সেবা ও সাধন-ভজন করেন। ইহার পরেও, তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ ৩৬ বৎসর কাল, শ্রীমাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া, তাঁহার সেবায়ই দিন কাটাইয়াছেন। তাঁহার সেবা ও জপ-তপে তিনি সদা প্রফুল্ল-চিত্ত থাকিতেন। দরিদ্র, দুঃখী ও অনাথ আতুরের জন্য তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় অতি সহজেই করুণায় বিগলিত হইত। শ্রীমার অন্তর্ধানের পরেও, গোলাপ মা প্রায় সাড়ে চারি বৎসর এবং যোগীন মা কিঞ্চিন্ন্যূন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শ্রীমার নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন। ১৩৩১ সনের ৪ঠা পৌষ গোলাপ মা মরজগৎ হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন।

লক্ষ্মীমণি দেবী

রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবী, বিবাহের অব্যবহিত পরেই বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে রামকৃষ্ণ লক্ষ্মীমণিকে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বালিকার ধারণা-শক্তির প্রশংসা করিতেন। এক দিবস, তিনি লক্ষ্মীর জিহ্বাগ্রে ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া, তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। পরমহংসদেব

লক্ষ্মীমণিকে একাকী তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই কারণে, পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর ৺বৃন্দাবন গমন হইতে আরম্ভ করিয়া, তিনি অনেক কাল শ্রীমার সহবাসেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

অন্যান্য স্ত্রী-ভক্ত

পূর্ব্বোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত, শ্রীযুক্ত রাখালের শ্বশ্রূমাতা (মনোমোহন মিত্রের মাতা), দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতা প্রমুখ অসংখ্য স্ত্রী-ভক্ত পরমহংসদেবের দর্শন, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরমহংস-দেবের সেবাও করিয়াছেন।

পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত মিলন

বহু পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। আবার কাহারও উদার চরিত্রের কথা জানিতে পারিলেই, তিনি নিজে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন। এই পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া, মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন; অন্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মপথের সহায়ক বা গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ইঁহাদের মধ্যেও দুই চারিজন নিজ ইষ্টমূর্ত্তি জ্ঞানে তাঁহার পদে শরণ লইয়াছিলেন। অতঃপর আমরা ইঁহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী—সাধনকালের মধ্যভাগ। রাজপুতানার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী, অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত ষড়-দর্শনের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, নব্য-ন্যায়ে ব্যুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপ যাইবার পথে, অথবা নবদ্বীপ গমনের অল্পকাল পরেই, শাস্ত্রিজী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবের দর্শন লাভ করেন। ঐ সময়ে পরমহংসদেব একখণ্ড বাঁশ কাঁধে ফেলিয়া, উন্মত্তের ন্যায় পঞ্চবটীতে পায়চারি করিতেছিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া, উন্মত্ত বলিয়াই ধারণা করিলেন। সাত বৎসর কাল নবদ্বীপে ন্যায় পাঠ করিয়া দেশে ফিরিবার সময়, শাস্ত্রিজী পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন এবং পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বকৃত ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। শাস্ত্রিজী বিবাহিত হইলেও, বাল্যকাল হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় ৺কাশী প্রভৃতি স্থানে গুরুগৃহে বাস করিয়া, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর কাল স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন। ষড়-দর্শনে তাঁহার এরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল যে, নবদ্বীপে আসিবার পূর্ব্বেই, একবার জয়পুরের মহারাজ বেশ মোটা মাহিয়ানায় তাঁহাকে সভা-পণ্ডিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রিজীর জ্ঞান-পিপাসা তখনও মিটে নাই। তজ্জন্য তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, পাঠের নিমিত্ত নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শাস্ত্রীর অন্তরে সাধনা এবং জ্ঞান লাভের ইচ্ছাও একান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পরমহংসদেবকে দ্বিতীয় বার দর্শনের পর,

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতেই রহিয়া গেলেন এবং তাঁহার চরিত্রে অনুক্ষণ শাস্ত্রবাক্যের সফলতা দেখিতে পাইয়া, দিন দিন তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। ক্রমে পরমহংসদেবের সহবাসে, শাস্ত্রীর তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তপশ্চরণের নিমিত্ত কামরূপে বশিষ্ঠাশ্রমে চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া, সেখানেই শরীর-পাত করেন। পরমহংসদেব কখন কখন শাস্ত্রীর বৈরাগ্যের কথা এইরূপ বলিতেন, "দেখ, নারায়ণ শাস্ত্রীর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। অত-বড় পণ্ডিত, কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কামিনী-কাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে, যোগ হয় না। ও যে শুধু পণ্ডিত ছিল তা নয়, অনেক সাধ্য-সাধনাও করেছিল। বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে তপস্যা করার কথা আমাকে সর্ব্বদা বলত। আর সেখানে যেতে বারণ করলে, সে বলত, 'কোন্ দিন এ হাড়মাঁসের খাঁচাটা ভেঙ্গে যাবে (ডুবকি কব ফাট যায়গা), তার কি কিছু ঠিক আছে? সাধন-ভজন কখন করব?' শাস্ত্রী সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল; কিন্তু 'হর, হর' বলতে বলতে, তার ভাব হয়ে যেত"।

অচলানন্দ—সাধনার মধ্যভাগ। রামকৃষ্ণের তন্ত্রমত সাধন সময়ে যে সকল তান্ত্রিক সাধক দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, কালীঘাটের অচলানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। অচলানন্দের পূর্ব্বের

নাম রামকুমার। তাঁহার বাড়ী ছিল গঙ্গার তীরে কোতরঙে (কোন্নগরের কাছে)। অচলানন্দ গৃহত্যাগী হইয়া বীরভাবের সাধনায় মন দিয়াছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় কারণ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধাই লাভ। তথাপি তিনি বেশ ভক্তিভাবে মায়েব নাম ও জপধ্যান করিতেন। কখন কখন তিনি রামকৃষ্ণকেও কারণ গ্রহণের নিমিত্ত জেদ করিতেন। কিন্তু কারণ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অতিরিক্ত মাতামাতি এবং ধর্ম্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে, রামকৃষ্ণ কখনও অনুমোদন করেন নাই।

পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার—১৮৬৩। পণ্ডিত পদ্মলোচন ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, ক্রমে বর্দ্ধমান মহারাজের প্রধান সভা-পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে, পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তাঁহার সাধনাও সমান ভাবে চলিয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণ নিরভিমান ছিলেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উদার ভাব পোষণ করিতেন। একবার রাজসভায় পণ্ডিতগণের মধ্যে 'শিব বড়, বা বিষ্ণু বড়' এই কথা লইয়া এমন তর্ক বাঁধিয়া গেল যে, ইহার কোন মীমাংসা হইল না। পদ্মলোচন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তর্কের বিষয় জানিতে পারিয়া, অতি সরল ও উদার ভাষায় কথাটীর মীমাংসা করিয়া দিলেন। পদ্মলোচন বলিলেন "আমার চৌদ্দপুরুষ কখন শিবকেও দেখে নাই, বিষ্ণুকেও দেখে নাই। তবে শাস্ত্রে যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা

যায়, বিষ্ণুর ভক্তগণ বিষ্ণুকে বড় করিয়া বলিয়াছে, আবার শৈবগণ শিবকেই বড় করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এই কথার কোন মীমাংসা নাই। যিনি যাহার ইষ্ট, তিনিই তাহার নিকট সকলের চেয়ে বড় দেবতা"। তান্ত্রিক সাধনার অন্তে, পরমহংসদেব পণ্ডিত পদ্মলোচনের উদার মতের কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, পণ্ডিতজীও ঐকালে অসুস্থ হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কলিকাতার নিকটে আড়িয়াদহে আসিয়া, গঙ্গাতীরে একটী বাগান-বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। পরমহংসদেব প্রথমে ভাগিনেয় হৃদয়কে পাঠাইয়া, পণ্ডিতজীর খবর লইলেন। তৎপর এক দিবস তিনি হৃদয়কে সঙ্গে করিয়াই, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের বীণানিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত ও মধুর ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ এবং মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি দর্শন করিয়া, প্রথম দিনেই পদ্মলোচন চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি লক্ষ্য করিলেন, পরমহংসদেবের ভাব সমূহ শাস্ত্রকেও ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার বোধ হইয়াছিল, ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; পরমহংসদেব ঈশ্বরের অবতার। এই কারণে, তিনি এক সময়ে পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "আমার অসুখ সেরে যাক, তারপর সভা করে তোমার অবস্থা লোককে সব বলব"। ইহার কিছুকাল পরেই ৺কাশীধামে যাইয়া পণ্ডিত পদ্মলোচন দেহত্যাগ করেন। একবার মথুর বাবু কালীবাটীতে এক পণ্ডিত-সভা আহ্বান করিয়া, শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনকেও ঐ

সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অশূদ্রযাজী ও সদাচারী পণ্ডিত পদ্মলোচন সভায় না-ও আসিতে পারেন ভাবিয়া, তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিবার জন্য মথুর বাবু পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেব পণ্ডিতজীকে এই কথা বলিলে পর, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ী সভায় যাব—তা আর একটা কি কথা? হাড়ীর বাড়ীতে গিয়ে, খেয়ে আসতে পারি"। পরমহংসদেব পণ্ডিতজীর ভাব-ভক্তি সম্বন্ধে বলিতেন, "পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত, এত জ্ঞানী, কিন্তু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কেঁদে ফেলেছিল। আর কারো সঙ্গে কথা বলে এত সুখ পাই নি"।

পণ্ডিত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তর্কভূষণ—সাধনকালের শেষভাগ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালের শেষ দিকে, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। সম্ভবতঃ পরমহংসদেবের আগ্রহে, মথুর বাবুই তাঁহাকে সেখানে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের কথা হইতে জানিতে পারা যায়, পণ্ডিত গৌরীর দুইটী সিদ্ধাই ছিল। শ্রীযুক্ত গৌরী অনেক সময়ে তাঁহার বাম বাহু শূন্যে প্রসারিত এবং তদুপরি এক মণ কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া, তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া, যথাবিধি হোম করিতেন। আবার কাহারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তিনি 'হা রে রে রে নিরালম্ব লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্' এই কথা কয়টী উচ্চ স্বরে আবৃত্তি করিতেন। ইহাতে উপস্থিত পণ্ডিতদের সকলেরই বুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া যাইত এবং কেহই

তাঁহার সহিত তর্কে পারিয়া উঠিত না। গৌরী শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, অনেক সাধনও করিয়াছিলেন। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' কথাটীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া, তিনি স্ত্রী মাত্রেই ভগবতীর প্রকাশ অনুভব করিতেন এবং আপন স্ত্রীকেও দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন। কিন্তু তিনি প্রথমে অত্যন্ত গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। এমন কি, তুলসী পাতা স্পর্শ করিতেন না; প্রয়োজন হইলে দুইটী কাঠি দ্বারা ধরিতেন। পরমহংসদেবের ভাব-ভক্তির পরিচয় পাইয়া, গৌরী অনেক কাল তাঁহার সহবাসে কাটাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সকল গোঁড়ামি ও অহঙ্কার অভিমান দূর হইয়া গেল এবং প্রাণে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। ফলে, তিনি গৃহের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তপস্যার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ হইলেন। ইহার পর, গৌরীর স্ত্রী-পুত্র বহু অনুসন্ধান করিয়াও, তাঁহার কোন খোঁজ পান নাই। তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, গৌরী 'হা রে রে রে' চীৎকার করিয়া পণ্ডিতগণের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেন, তাঁহার সেই সিদ্ধাইটী পরমহংসদেব হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "সাধন-ভজন না থাকলে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছুই হয় না। ইঁদেশের গৌরী, পণ্ডিত ও সাধক দুই-ই ছিল। গৌরী মাঝে মাঝে মায়ের ভাবে উন্মত্ত হয়ে যেত। আবার 'হা রে রে রে' রবে চীৎকার কল্লে, পণ্ডিতেরা তার কাছে কেঁচো হয়ে যেত। যে দিন সে প্রথম এল, সেদিন আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে, তার চেয়েও জোরে চীৎকার করে উঠেছিলাম; তাতেই সে দমে গেল। আমাদের সে

চীৎকারের চোটে, কালীবাড়ীর সব লোক এসে জড় হয়ে গেছল"। একবার গৌরী পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "যখন দেখবে কালী-গৌরাঙ্গ এক বোধ হচ্ছে, তখনই জানবে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়েছে।

উলোর বামনদাস—সাধনকালের শেষভাগ। উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় একবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, কিছুকাল দেব বিশ্বাসের উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। বামনদাস একজন প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন। তজ্জন্য, পরমহংসদেব একদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা রাসমণির কালীবাটী হইতে গিয়াছেন শুনিয়া, বামনদাস অনুমানে পরমহংসদেবকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তারপর তিনি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলুম। যদি অনুগ্রহ করে এখানে এলেন, আমাদেরে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন"। ঐ সময়ে কয়েক জন দানগ্রহণার্থী ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরমহংসদেব বলিলেন, "আগে এদেরে বিদেয় কর, তারপর আমাদের কথা হবে"।

বামনদাস ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলে পর, পরমহংসদেব কথায় কথায় ভগবৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তিনি বামনদাসকে এই কথাটী বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ কৃপা করিয়া দেখা না দিলে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রসঙ্গ শেষ করিয়া কয়েকটী শ্যামা-সঙ্গীত গাহিবার পর, পরমহংসদেব

কালীবাড়ীতে ফিরিলেন। বামনদাস তাঁহার ভাবভক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব চলিয়া আসিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঘে পেলে মানুষ যেমন পালাতে পারে না, ঠিক তেমনি ঈশ্বরীও এঁকে পেয়ে বসেছেন"।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—সাধনান্তে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে, পরমহংসদেব কলিকাতার বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে দেখিতে গিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সরল, নিরহঙ্কার ও দয়ালু ছিলেন। পরমহংসদেব তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের উদার ভাবের প্রশংসা করিতেন। জয়নারায়ণ পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, শেষকালটা ৺কাশীতে কাটাইবেন। কার্য্যতঃ ঐরূপই ঘটিয়াছিল। ৺কাশীধামে যাইয়াই, তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শরীরত্যাগ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাধনান্তে। শ্রীযুক্ত মথুর বাবু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একসঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলেন। পরমহংসদেব মহর্ষিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এক দিবস মথুর বাবু তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পরিচয় ও অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, তাঁহার অঙ্গলক্ষণ সমূহ দেখিয়া, পরমহংসদেব বুঝিতে পারিলেন, মহর্ষির যোগ ও ভোগ দুই-ই রহিয়াছে। তাই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এ যুগের জনক। জনক রাজা এদিক ওদিক দু'দিক রেখে, দুধের বাটী

খেয়েছিল। সংসারে থেকেও, তোমার ঈশ্বরে মন রয়েছে শুনে, তোমাকে দেখতে এসেছি। আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও"। পরমহংসদেবের অনুরোধে, মহর্ষি তাঁহাকে বেদ হইতে কিছুটা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ ভাল লাগিল। দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, জগৎটা যেন একটা ঝাড় (বাতি), আর জীব ঝাড়ের এক একটী দীপ; ঝাড়ের দীপ না থাকিলে, ঝাড়টী পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঈশ্বর নিজের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্যই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চবটীতে ধ্যানকালে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক এইরূপ একটী দর্শন হইয়াছিল। মহর্ষির কথাগুলি তাঁহার দর্শনের সহিত হুবহু মিলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার খুব আনন্দ হইল।

অল্প সময়ের জন্য দেখা হইলেও, পরমহংসদেব এবং মহর্ষির মধ্যে বেশ একটা প্রীতির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম উৎসবে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, "আমি জামা-কাপড় পরে, বাবু সেজে তোমাদের এখানে আসতে পারব না"। রামকৃষ্ণ সাধারণতঃ জামা গায়ে দিতেন না; তাঁহার কাপড়ও প্রায়ই ঠিক থাকিত না। ভাবস্থ হইলে অনেক সময়েই, তিনি চারি পাঁচ বৎসরের বালকের মত, কাপড় বগলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। উৎসবে লোকের ভিড়ে হঠাৎ ঐরূপ একটা কিছু করিলে, কেহ তাঁহাকে কটু কথাও বলিতে পারে ভাবিয়া, মহর্ষি নিজেই পুনরায় তাঁহাকে উৎসবে লইয়া যাইতে বারণ

করিয়া, মথুর বাবুর নিকট একখানা পত্র দিয়াছিলেন। মহর্ষি ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন, না বুঝিয়া কেহ পরমহংস মহাশয়কে অযথা কটূক্তি করিয়া বসিলে, উহাতে মহর্ষির কষ্ট হইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—১৮৭২। একবার শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুত্র দ্বারিকা বাবু, কালীবাটীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে মাইকেলের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। পরমহংসদেবের আদেশে শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী, মাইকেলের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কিছুক্ষণ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। তৎপর মাইকেল বাংলাতেই বলিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহার সংস্কৃত বলার অভ্যাস ছিল না।

মাইকেল কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলিবার জন্য রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না; কে যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাই তিনি তাঁহাকে 'বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?', 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি; তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি', এইরূপ দুই তিনটী গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। মাইকেল যৌবন বয়সে লোভে পড়িয়া স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নিমিত্ত তিনি শেষ-জীবনে অনুতপ্তও হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতের সব কয়টীই

তাঁহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। মাইকেল উহার ভাব গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী—১৮৭৩ প্রারম্ভ। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া, ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদ কাননে প্রায় চারি মাস কাল অবস্থান করেন। ঐ সময়ে পরমহংসদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দয়ানন্দ রজোগুণী এবং উগ্র-ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা কাহারও অবিদিত নহে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনাড়ম্বর ভাব, মধুর চরিত্র ও মুহুর্মুহুঃ সমাধি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আমরা এত এত বেদ-বেদান্ত পড়িলাম, কিন্তু এই মহাপুরুষের চরিত্রে সকল শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের ন্যায় পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-মন্থন করিয়া, কেবলমাত্র ঘোলটাই খাইয়া থাকে; বাস্তবিক ইঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরাই মাখনটুকু গ্রহণ করিতে পারেন"।

কৃষ্ণদাস পাল—কোন বড়লোক পরমহংসদেবের নিকট আসিলে, তিনি প্রায়ই তাঁহাকে 'মানবের কর্ত্তব্য কি?' এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট (Hindu Patriot) পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল, একবার পরমহংস-দেবকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায়, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মানুষের কর্ত্তব্য ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেশ-সেবা ও জগতের দুঃখ দূর করাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য, এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্ম ও

ত্যাগের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের একদেশদর্শিতা ও নিজ মতে গোঁড়ামি দেখিয়া, পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি কেন? জগৎ কি এতটুকু, যে তুমি জগতের দুঃখ দূর করে ফেলবে? অনাদি-কাল থেকে আমাদের সনাতন শাস্ত্র যে ত্যাগকে সবচেয়ে বড় করে বলেছে, সে কথাটা কিনা তুমি আজ উল্টে দিচ্ছ। দু'পাতা ইংরাজী পড়েই তুমি ভাবছ যে, দুনিয়ার সব কিছু তোমার জানা হয়ে গেছে"।

মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর—পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ মানসে, পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট লোক, এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগান-বাটীতে আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কথা-প্রসঙ্গে, 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "আমরা সংসারে আছি, আমাদের কি আর কখন মুক্তি হবে? রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিককেই নরক দর্শন কর্ত্তে হয়েছিল"। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য সুকৃতিকে বাদ দিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার নরক দর্শনের কথাটাই বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া, পরমহংসদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি শুধু যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের কথাটাই মনে করে রেখেছ। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, সন্তোষ, ধৈর্য্য, বিবেক-বৈরাগ্য ও ভক্তির কথা কিছুই বুঝি তোমার জানা নাই?"

অশ্বিনী কুমার দত্ত—১৮৮১, অক্টোবর। বরিশালের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুকে দেখিয়া নাকি পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "এ অতি শুদ্ধ আধার, যেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন"। বরিশালের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত, চারি পাঁচ বার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কয়েক বারের দর্শন সম্বন্ধে, আমরা দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। সম্ভবতঃ ১৮৮১ সালের ৺শারদীয়া পূজার ছুটীতে, অশ্বিনী বাবু প্রথম পরমহংসদেবকে দর্শন করেন। সেই দিন কেশব বাবুও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরমহংসদেবকে উত্তরের বারান্দাতে তাকিয়া ঠেস দিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, অশ্বিনী বাবুর মনে হইয়াছিল, "এ আবার কেমন পরমহংস?" পরমহংসদেবের বালকভাব দেখিয়া, কেশব বাবু আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইতেছিলেন। প্রথমে অশ্বিনী বাবুর মনে হইয়াছিল, "এ আবার কেমন ঢং, ন্যাকামি?" কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই, তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। পরমহংসের সরল উক্তি সমূহের মধ্যে, তিনি আগাগোড়া বেশ একটা সরস ভাব ও সারবত্তা দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই তাঁহার বালকভাব।

তৎপর এক দিবস অশ্বিনী বাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, পরমহংসদেবের সহিত কথা বলিতে বলিতে, হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে কি প্রভেদ, এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এদের মধ্যে আর প্রভেদ কি? রোশনচৌকি বাজাতে, একজন

যেমন পোঁ ধরে থাকে, আর একজন নানা রকম রাগ-রাগিণী বাজায়, তেমনি ব্রাহ্মেরা নিরাকারে পোঁ ধরে রয়েছে, আর হিঁদুরা তার মধ্যে রঙ পরঙ তুলছে"। অনন্তর, অশ্বিনী বাবু 'তাকে কি করে পাব ?' এই প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন, "চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি তিনি সব সময় আমাদের টানছেন। লোহার গায়ে কাদা থাকলে, চুম্বকে লাগতে পারে না। তেমনি যতক্ষণ মনে মলিনতা থাকে, ততক্ষণ তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। কাঁদতে কাঁদতে মনের কাদাটুকু ধুয়ে গেলে, অমনি তিনি টেনে লন"।

মাত্র চারি পাঁচ দিন পরমহংসদেবের সঙ্গ করিয়াই, অশ্বিনী বাবু প্রাণে এমন এক অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি বলিতেন, উহাতে তাঁহার জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল; জীবন-সায়াহ্নেও তিনি এই স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১৮৮২, আগষ্ট। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার বাড়ী বীরসিংহ গ্রাম কামারপুকুর হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরমহংসদেবের ইচ্ছা হইল। শ্রীযুক্ত মাষ্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কাজ করিতেন। পরমহংসদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "আমায় বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে ? তাকে দেখতে বড় সাধ হয়"।

মাষ্টার মহাশয় বিদ্যাসাগরের সহিত আলাপ করিয়া, একদিন বিকাল বেলা প্রায় চারিটার সময়, পরমহংসদেবকে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভবনাথ এবং হাজরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বেই মাষ্টারের নিকট পরমহংসদেবের সকল খবর লইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি এই অদ্ভুত পরমহংসের সাধারণ বেশ-ভূষা দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন না। পরমহংসদেব যেন ছিলেন রসের নাগর। তিনি হাসিতে হাসিতে বিদ্যাসাগরকে বলিলেন, "এতদিন খাল, বিল হদ্দ নদী দেখা হয়েছে, এবার সাগরে এসে পড়েছি"। বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—"তবে খানিকটা লোণা জল নিয়ে যান আর কি ?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"তা হবে কেন গো, লোণা জল হবে কেন? তুমি যে বিদ্যার সাগর, ক্ষীর-সমুদ্র"।

অনন্তর পরমহংসদেব কথায় কথায় ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি পথ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া বিদ্যাসাগরকে অনেক কথা বলিলেন। এইবার তিনি 'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়-দর্শনে না পায় দরশন', এই গানটী গাহিয়া বিদ্যাসাগরকে বুঝাইয়া দিলেন, শুধু ভাববিহীন পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবান্‌কে কিছুতেই পাওয়া যায় না; আবার, ভাব-ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা সহজেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। তিনি যে ভাবের বিষয়, অভাবে কে ধরতে পারে। অতঃপর পরমহংসদেব একে একে 'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি', 'মন কি তত্ত্ব কর তারে', 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়', এই

গান কয়টি গাহিয়া, বিশ্বাস ভক্তি, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, আবার 'তাঁহার উপর ভালবাসা হইলে পূজা, বলি, যাগযজ্ঞ কিছুরই প্রয়োজন থাকে না', ইত্যাদি অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৯টা হইয়া গেল।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইতে অধিক রাত্রি হইয়া যাইবে বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে, কালীবাড়ী দেখে আসবেন ; রাসমণির বাগান বেশ চমৎকার জায়গা"। বিদ্যাসাগর—"যাব বৈ কি ? আপনি এখানে এলেন, আর আমি যাব না ?" শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমরা জেলে-ডিঙ্গি ; খাল, বিল, নদী সব জায়গায়ই যেতে পারি ; কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি কোথায় চড়াতে লেগে যান"। ঐ দিবস বিদ্যাসাগরের গৃহে তাঁহার কয়েক জন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। পরমহংসদেবের কথাবার্ত্তায় একটা নূতন আলোক পাইয়া, তাঁহারা প্রাণে অপার আনন্দ ও শান্তি লাভ করিলেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি—১৮৮৪, জুন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন, রথযাত্রা দিবসে, পরমহংসদেব কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়ায় শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি নিকটেই কলেজ ষ্ট্রীটে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য পরম-

হংসদেবের বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। এই নিমিত্ত দ্বিপ্রহরের আহার ও বিশ্রামের পর, প্রায় বেলা চারিটার সময়, তিনি গাড়ী করিয়া সেই বাড়ীতে গমন করিলেন। গৃহস্বামী, পণ্ডিত শশধর ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ভক্তগণের অনেকেই, শ্রীযুক্ত ঈশানের বাড়ী হইতে পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপর পণ্ডিত শশধর কিরূপে লোকের নিকট বক্তৃতা করেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, পরমহংসদেব প্রসঙ্গ-ক্রমে তাঁহাকে বলিলেন, "বক্তৃতা দ্বারা বিষয়ী লোকের প্রাণে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করা দুরূহ ব্যাপার। সাধারণতঃ হাজার বক্তৃতায়ও কোন কাজ হয় না। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের দর্শন ও আদেশ পাইয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রচারে সুফল দেখা যায়। সাধনা ও বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যে কোনই কাজ হয় না"। ঐ দিবস পরমহংসদেব বহুক্ষণ ব্যাপিয়া পণ্ডিত শশধরকে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আগে সাধন করে তাঁর দর্শন ও আদেশ লাভ কর, তারপর প্রচারে প্রবৃত্ত হও। তা হলে প্রচারে কাজ হবে, লোক-শিক্ষাতেও দোষ হবে না"। শ্রীরামকৃষ্ণের সরল ও মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, পণ্ডিত শশধর মুগ্ধ হইলেন। পণ্ডিতের মন তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল। এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই, তিনি পরমহংসদেবের আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর, পণ্ডিত শশধর আরও অনেক

বার তাঁহার পুণ্যদর্শন ও দিব্যসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সকল সময়েই তাঁহাকে অনুভূতি-রহিত শাস্ত্র-পাঠ এবং পাণ্ডিত্যের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া দিয়া, ঈশ্বর-দর্শন-মুলক সাধনা, বিবেক-বৈরাগ্য ও প্রকৃত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহাকে নানাভাবে বলিতেন যে, এক গাদা শাস্ত্র পড়িয়া, শুধু লম্বা-চওড়া কথা বলিলে কোন কাজ হয় না; সাধন করিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায়।

পরমহংসদেবের সঙ্গগুণে পণ্ডিত শশধরের শাস্ত্রপাঠ ও জ্ঞান-বিচার অনেক পরিমাণে সরস হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ প্রচার কার্য্য ত্যাগ করিয়া, আপন কল্যাণ ও শান্তি হেতু তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৮৪, ডিসেম্বর। এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ শোভাবাজার বেনেটোলায় শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাড়ীতে গমন করিলে, প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিম বাবু সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। বঙ্কিম বাবু শ্রীযুক্ত অধরের বন্ধু; তাই অধর পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তারপর নানা রসিকতার ভিতর দিয়া, পরমহংসদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। বঙ্কিম বাবু কিছুক্ষণ পর পর এক একটী প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর পরমহংসদেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি বঙ্কিমকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা হয়েছ গো?" বঙ্কিম বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ ইংরাজের কর্ম্মচারী

ছিলেন ; তাই তিনি উত্তর করিলেন, "মহাশয়, সাহেবের জুতোর চোটে"। এই কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "তা কেন হবে? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন"।

পরমহংসদেবের রসিকতাপূর্ণ উক্তি ও দুই চারিটী তত্ত্বকথা শুনিয়াই বঙ্কিম বাবু মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?" ভাবস্থ হইলে, কখন কখন রামকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ পাইত ; কিন্তু সাধারণ ভাব-ভূমিতে অবস্থান কালে, তিনি আপনাকে দীনের দীন, হীনেরও হীন বলিয়া মনে করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিলে, অনেক সময়ে তিনি বলিতেন, "আমি গুয়ের কীটেরও অধম, তোমরা কেন আমায় অমন বলছ্?" তিনি বঙ্কিম বাবুর কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন, "মানুষের শক্তিই-বা কতটুকু যে, তাঁকে প্রচার করবে। যে নিজেই শুতে স্থান পায় না, সে অন্যকে শোবার স্থান দিবে কোথা হতে?"

বঙ্কিম বাবুর সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া, নিজেই ভক্তগণ সহ কীর্ত্তন ও তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা ভাব লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিদায়কালে তিনি অতি বিনীত ভাবে পরমহংসদেবকে একবার তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের ওখানেও

ভক্ত লোক আছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে তাঁহার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

পণ্ডিত শ্যামপদ ভট্টাচার্য্য—১৮৮৫, আগষ্ট। আঁটপুরের পণ্ডিত শ্যামপদ ভট্টাচার্য্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্যামপদ নিরহঙ্কার ও ভক্তিমান্ ছিলেন। তজ্জন্য পরমহংসদেবের পূতসঙ্গে সহজেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বেশ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিয়াছিল। পরমহংসদেব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরই জীব-জগৎ সব হয়ে রয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ জ্ঞান লাভ হয় না, বিচার চলে, ততক্ষণ এই সংসার স্বপ্নবৎ, ধোকার টাটী বলে বোধ হয়। আর জ্ঞান হয়ে গেলে, এই সংসারই মজার কুঠী হয়ে দাঁড়ায়"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সঙ্ঘ-গঠন

শ্যামপুকুরের বাড়ী ও কাশীপুর উদ্যান

(শ্যামপুকুর—১৮৮৫, সেপ্টেম্বর—নবেম্বর। কাশীপুর—১৮৮৫, ডিসেম্বর—১৮৮৬, ১৬ই আগষ্ট)

বার বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া, 'যত মত তত পথ' রূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় মূলক উদার সত্যে পৌঁছিবার পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পরমহংসদেব ঐ তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের নিকট শতমুখে প্রচার করিতে ছিলেন। কাজেই গত ষোল বৎসর ব্যাপিয়া, তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথার বিরাম ছিল না। আবার, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব হইত এবং ভাবের উদ্দাম বেগে অনেক সময়েই তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। কখন কাপড়-বগলে আপন গৃহমধ্যে পায়চারি করিতেন, কখন বা তাঁহার দেহ ভাবে অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া, মৃতবৎ প্রতীয়মান হইত। যখন শ্রীমা পরমহংসদেবের গৃহে শয়ন করিতেন, তখন স্বামীর নিদ্রাহীনতা ও মুহুর্মুহুঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে মধ্য-রাত্রিতে, তাঁহার গভীর ভাব-সমাধি শ্রীমাকে অতিশয় উদ্বিগ্না করিয়া তুলিত। এই নিমিত্ত, কোন কোন দিন তিনি ভয় পাইয়া, গভীর রাত্রিতেই ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিতে বাধ্য হইতেন। হৃদয়রাম আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রণব ও নামাদি উচ্চারণ করিলে,

তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেন। প্রথমতঃ বার বৎসরের কঠোর সাধনা, তৎপর প্রচার কালে বহুবর্ষ-ব্যাপী অনিয়মিত আহারনিদ্রার ফলে, এই সময়ে পরমহংসদেবের শরীর নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, একদিন পরমহংসদেব, গঙ্গাতীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কালে, ভাবস্থ হইয়া মাটীতে পড়িয়া যান এবং উহাতে তাঁহার বাম হাতের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। সময়ে সময়ে তিনি হাতের ব্যথায় কাতর হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন, আর মাকে বলিতেন, "মা, তুমি কেন আমায় অমন করলে? ব্যথায় যে আমার প্রাণ যায়!" আবার যাহারা নিকটে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হ্যাঁগা, আমার হাতটা কি সারবে না?" কখন বা ভাবে গান ধরিতেন, "তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা"। পরমহংস-দেবের হাত সারিতে প্রায় চারি মাস লাগিয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল মাসে) অতিরিক্ত গরম পড়িলে, পরমহংসদেব ভক্তগণের আগ্রহে প্রায়ই পানীয় জল প্রভৃতির সহিত বরফ সেবন করিতে লাগিলেন। ইহাতে গ্রীষ্ম-বোধের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল; কিন্তু ক্রমাগত দুই তিন মাস বরফ সেবনের পরে, তাঁহার গলনালীতে অল্প অল্প বেদনার সঞ্চার হইল। উপযুক্ত ঔষধ, পথ্য ও প্রলেপাদির সাহায্যে চিকিৎসা চলিল; কিন্তু রোগের একটুও উপশম হইল না, বরং বেদনা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। কথা বলিলে ও ভাবস্থ হইলে, গলার

বেদনা বাড়িয়া যায় বলিয়া, ডাক্তারেরা এই দুই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু চিরকাল যিনি অনিত্য-শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, শরীরের আরামের জন্য কি তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ত্যাগ করা সম্ভব? জিজ্ঞাসু, ভক্ত বা শোক-মোহে জর্জ্জরিত কাহাকেও পাইলেই, তিনি ঈশ্বরীয় কথায় মাতিয়া যাইতেন এবং নাচিয়া গাহিয়া আনন্দে উল্লসিত হইতেন। তবে যাঁহারা ধর্ম্মের প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয় বলিয়া, তিনি কখন কখন মায়ের নিকট আব্দার করিয়া বলিতেন, "মা, দিনরাত কত কথা বলব? আমি যে আর পারি না মা! তুই কেদার, রাম, মাষ্টার, গিরিশ, বিজয় এদের একটু শক্তি দে, যাতে এরা আমায় সাহায্য করতে পারে"। দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধারণ মানব, শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। সুতরাং শরীর অসুস্থ হইলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মন নিরানন্দ হয় এবং মুখেও ঐ ভাবটী ফুটিয়া উঠে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধন বলে, বহু পূর্ব্বেই মনকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইলেও, তিনি তিলেকের জন্যও মনের প্রফুল্লতা হারাইতেন না। তাঁহার চিত্ত সতত হরিপ্রেম-মদিরা পানে আনন্দে মগ্ন থাকিত এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাইত।

পাণিহাটী দক্ষিণেশ্বরের তিন চারি মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ দাস

কর্ত্তৃক নিত্যানন্দপ্রভু ও ভক্তগণের সেবা* স্মরণ করিয়া, প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, পাণিহাটী গ্রামে একটি বৃহৎ মেলা বসে এবং বৈষ্ণবগণের মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরমহংসদেব পূর্ব্বে অনেক বার ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। সেখানে গেলেই, তিনি কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া যাইতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যগীতে, হাজার হাজার বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইত এবং হরিনামের উচ্চ ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইত। পরমহংসদেব মধ্যে কয়েক বৎসর পাণিহাটীর মহোৎসবে যাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য এইবার তিনি নরেন্দ্র, বলরাম, গিরিশ, রাম, মহেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে

---

* রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের জনৈক লক্ষপতির পুত্র ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-বশে পিতার অতুল সম্পদ্ ও গৃহ ত্যাগ করিয়া হরিপ্রেমে মত্ত হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম-সাধন করিতে উপদেশ দেন। তথাপি রঘুনাথ গৃহত্যাগী হইয়া, নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই নিমিত্ত নিত্যানন্দ পাণিহাটীতে তাঁহার দণ্ডবিধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি বাড়ী হইতে পলাইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছ; উহার দণ্ডস্বরূপ আজ তোমাকে চিঁড়ার মহোৎসব করিয়া, বৈষ্ণব-ভোজন করাইতে হইবে"। নিত্যানন্দের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, রঘুনাথ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে চিঁড়ার মহোৎসব করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে, প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে পাণিহাটীতে চিঁড়ার মহোৎসব হইয়া থাকে এবং ঐ উৎসবকে 'দণ্ড-মহোৎসব' বলা হয়। রঘুনাথ দাসের পর, পাণিহাটী গ্রামের রাঘব পণ্ডিত ঐ উৎসব সম্পন্ন করিতেন বলিয়া, উহাকে 'রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব'ও বলা হইয়া থাকে।

উৎসবে গমন করিলেন। উৎসব দিবসে মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; কিন্তু তন্মধ্যেই পরমহংসদেব কীর্ত্তনানন্দে উল্লসিত হইয়া, তালে তালে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত কীর্ত্তনের দল সমূহ, তাঁহার উপস্থিতিতে নূতন প্রাণ পাইয়া, সারাদিন অভিনব কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া রহিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁহার দিব্য রূপ ও অপূর্ব্ব নৃত্য মুগ্ধ-নেত্রে দর্শন করিল। দিব্য ভাবাবেশে, মুক্ত আকাশতলে নাচিয়া গাহিয়া, পরমহংসদেবের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। নিজ অসুস্থ শরীরের কথা একবারও তাঁহার মনে পড়িল না। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, প্রকৃতি কখনই প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। এই একদিনের অত্যাচারের ফলেই, পরমহংসদেবের গলার ব্যথা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল এবং নিয়মিত ঔষধ-পথ্য সেবন করা সত্ত্বেও, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার গলার ক্ষত হইতে অল্প অল্প রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। পীড়া দিন দিন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, ভক্তগণ ভীত হইলেন এবং মাষ্টার মহাশয়, নরেন্দ্রনাথ, রামবাবু ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। প্রথমে বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে একটি অতি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। কিন্তু পরমহংসদেব বহুবর্ষ যাবৎ গঙ্গাতীরে সুপরিসর কালীবাড়ীর মুক্ত বায়ুতে বাস করিতেছিলেন বলিয়া, ঐ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই যেন তাঁহার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটিল।

শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ী নিকটেই ছিল। পরমহংসদেব অবিলম্বে তাঁহার বাটীতে চলিয়া গেলেন। ভক্ত বলরাম অযাচিত ভাবে গুরুদেবকে পাইয়া, সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব অসুস্থ হইয়া, কলিকাতায় বলরাম বাবুর গৃহে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া, চারিদিক হইতে ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিলেন। সুতরাং এই কালে, বলরাম বাবুর গৃহে নিত্যই দর্শক ও ভক্তগণের ভিড় লাগিয়া থাকিত। সপ্তাহ কাল মধ্যেই, শ্যামপুকুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, পরমহংসদেবকে তথায় স্থানান্তরিত করা হইল এবং ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। গলার ক্ষত হইতে রুধিরস্রাব হওয়া অবধি, পরমহংসদেব ভাতের মণ্ড, দুধ, সুজির পায়স প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিতেন; ভাত তরকারী ইত্যাদি কঠিন খাদ্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে, শ্রীমা-ই তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের আহার্য্য প্রস্তুতের নিমিত্ত তাঁহাকেও শ্যামপুকুরের বাটীতে আনয়ন করা হইল। আবার ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করায়, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকগণ রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে নিকটে থাকিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আর ভক্তগণ সম্মিলিত ভাবে চিকিৎসার ব্যয় ও সেবাকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে প্রায় তিন মাস কাল গত হইল; কিন্তু পরমহংসদেবের ব্যাধির উপশম হইল না; বরং উহা বাড়িয়াই চলিল। তৎপর, ডাক্তারের পরামর্শে কলিকাতা ও বরাহনগরের মধ্যবর্ত্তী কাশীপুরে, ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষের প্রশস্ত উদ্যান-বাটী মাসিক আশী টাকায় ভাড়া করিয়া, পরমহংসদেবকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। ৺শারদীয়া পূজার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে (সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ, সম্ভবতঃ ২রা আশ্বিন) ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, তিন মাস কাল পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে বাস করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরে অবস্থান কালেও, কলিকাতার বহু লোক পরমহংসদেবের দর্শন ও উপদেশ লাভে ধন্য হইলেন। কেহ তাঁহার নিকট আসিলেই, তিনি দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া, তাঁহাকে মধুর ঈশ্বরীয় কথা ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতেন। দেখিতে দেখিতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ আসিয়া পড়িল। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্র লালের সাধ্যানুরূপ চেষ্টায়ও রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরমহংসদেবের সেবা করিবার জন্য, শ্রীমাকেও কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন। কাশীপুর কলিকাতার অতি নিকটে হইলেও, একেবারে কলিকাতা সহরের মধ্যে নয়। ইতিপূর্ব্বে শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে, নরেন্দ্রনাথ, শশী, কালী প্রমুখ যে চারি পাঁচ জন যুবক শুশ্রূষার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে রাত্রি যাপন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্কুল

কলেজে পড়িতেন। ক্রমাগত অনেকদিন ধরিয়া রাত্রিকালে বাড়ীতে উপস্থিত না থাকায়, তাঁহাদিগকে অভিভাবকগণের বিষ-নজরে পড়িতে হইয়াছিল। কাশীপুরের বাগান হইতে অনেক সময়ে, তাঁহাদের পক্ষে গৃহে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। এই কারণে, তাঁহাদের বাড়ীতে অধিকতর গোলযোগের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তথাপি নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা একরূপ গৃহত্যাগ করিয়াই, গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ক্রমে, সেবকগণের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কাশীপুর উদ্যান-বাটীর সুন্দর সংস্থান, মনোহর পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি দর্শন করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁহার রোগযন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেবকগণ নৈরাশ্যের মাঝখানেও, আশায় বুক বাঁধিয়া, প্রাণপণে গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, একে একে কাশীপুরের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর ভগবৎ-প্রসঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দোল্লাসের বিরাম ছিল না। তাঁহার ঈশ্বরীয় কথা ও মুহুর্মুহুঃ ভাব, প্রতিদিন শিষ্য-সেবক ও আগন্তুকগণের প্রাণে শান্তি ও আনন্দের অভিনব আলোক ও পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ক্রমে, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ব্বাণোন্মুখ দেহ-প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিল। কিঞ্চিদ-ধিক আট মাস কাল কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে বাস করার পর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট (৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩ সাল)

রবিবার সন্ধ্যাকালে, শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। কিন্তু পুনরায় রাত্রি একটা দুই মিনিটের সময়, উপস্থিত শিষ্য-সেবকগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিযোগে মর্ত্ত্য-লীলার যবনিকা-পাত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং ক্রমে রামবাবু, গিরিশচন্দ্র, কাপ্তেন প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া জুটিলেন। ব্রহ্ম-সমাজেরও অনেকেই আসিলেন। সংবাদ পাইয়া, অন্যান্য বহু লোক তাঁহাকে শেষবার দর্শন করিতে, কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলেন। ক্রমাগত বৎসরাধিক কাল রোগে শয্যাশায়ী থাকায়, পরমহংস-দেবের শুষ্ক শরীরে হাড় ক'খানা মাত্র দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার দিব্য, জ্যোতির্ম্ময়, হাসিমাখা মুখখানি ও গাত্রতাপ লক্ষ্য করিয়া, ভক্তগণ সংশয়ে পতিত হইলেন। তিনি প্রায়ই বহুক্ষণ সমাধিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে কিনা, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় এগারটার সময়ে ডাক্তার সরকার আসিয়া, তাঁহার শরীর বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ভক্তগণের সংশয় অমূলক নহে, মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে"। অপরাহ্ন পাঁচটা পর্য্যন্ত চারিদিক হইতে ভক্তগণের আগমন প্রতীক্ষা করা হইল। ইতিমধ্যে অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণের অপাপবিদ্ধ দেহ

একখানা খাটের উপর রাখিয়া, গেরুয়া বসন, স্রক্-চন্দন ও বিবিধ পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া, উচ্চ সংকীর্ত্তন সহ কাশীপুরের শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সর্ব্বগ্রাসী জাতবেদা লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, জ্ঞান ও পবিত্রতার মূর্ত্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মানব-লীলা সাঙ্গ হইল; কিন্তু জগতের জন্য তিনি পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অত্যুচ্চ ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ,—সর্ব্বভূতে সমদর্শন, শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা এবং সমগ্র বিশ্বের আর্ত্ত ও পতিতের শান্তি ও কল্যাণ কামনা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

(১৮৮৫—সেপ্টেম্বর)

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার যখন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে পরমহংসদেবের চিকিৎসা আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তিনি প্রথম কয়েক দিবস অতি যত্ন সহকারে, দিনে দুই তিন বার করিয়া আসিয়া, তাঁহার রোগের লক্ষণ সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, ডাক্তার সরকার ভগবানের সাকার ভাব সমূহে আস্থা হারাইলেও, তাঁহাতে ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের অভাব ছিল না। ডাক্তার সরকার প্রথম দিবস নিজ পারিশ্রমিকের টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধু, এবং ভক্তগণ তাঁহার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেছেন

জানিতে পারিয়া, তিনি অতঃপর কখনও ইঁহাদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে, পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিলে, প্রতিদিন ঈশ্বর-প্রসঙ্গে তাঁহার সরল ও মর্ম্মস্পর্শী দুই চারিটী কথা শুনিতে পাইয়া, ডাক্তার সরকার ক্রমে তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট আসিলে অনেক সময়েই, তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তিন চারি ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রোগী দেখিবার সময় মিলিত না এবং যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইত। বেশী কথা বলিলে পরমহংসদেবের গলরোগ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া, ডাক্তার তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁহাকে প্রত্যহ অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলাইতেন। কারণ, তাঁহার নিকট আসিলেই, তিনি দীর্ঘ আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি পরমহংসদেবকে বলিতেন, "আর কারো সঙ্গে কথা বলো না, কথা বললেই তোমার রোগ বেড়ে যাবে। তবে আমি যখন আসব, কেবলমাত্র আমার সঙ্গে কথা কইবে"। শুধু তাহাই নহে, বাড়ীতেও, পরমহংসের চিন্তা অনেক সময়ে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া রাখিত। পরমহংসদেব মাষ্টার মহাশয়, নরেন্দ্রনাথ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত ডাক্তারের পরিচয় ও আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারের পাণ্ডিত্যাভিমান মোটেই ছিল না। সময়ে সময়ে তিনি তাঁহাদের সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া আনন্দিত হইতেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের ভজন-সঙ্গীত শুনিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন।

ডাক্তার সরকার পরমহংসদেবের অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি লক্ষ্য করিয়া, এক দিবস তিনি জনৈক ডাক্তার-বন্ধুর সহযোগে, সমাধি অবস্থায় পরমহংসদেবের শরীর পরীক্ষা করিলেন এবং উহাতে মৃতের লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এইরূপে মহেন্দ্রলাল দিনের পর দিন, পরমহংসদেবের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে রামকৃষ্ণ-ভক্ত বলিয়া প্রকাশ্যে পরিচয় না দিলেও, তিনি যে পরমহংসদেবকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একদিন তিনি কথা-প্রসঙ্গে জনৈক বন্ধুকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "As man, I have the greatest regard for him—মানুষ হিসাবে, আমি তাঁকে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি"।

উপসংহার

(১৮৮৬—১৯০৯)

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মঠ

দেহত্যাগের পূর্ব্বে, শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতা ও কলিকাতায় আগমন এবং শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে প্রায় এক বৎসর কাল অবস্থান, তাঁহার ভক্তগণের মিলন-সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাস্তবিক, এইকালে অসুস্থ গুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়াই, তাঁহার

গৃহী ভক্ত ও ত্যাগী যুবকগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত ও স্নেহ-সূত্রে বদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম পত্তন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, তাঁহারা অনুক্ষণ নিকটে থাকিয়া, তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়াছিলেন। গুরুদেবের পবিত্র দেহ সংকারের পর, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যগণ সমবেত ভাবে, তাঁহার অস্থি ও দেহ-ভস্ম একটি কলসীতে পূর্ণ করিয়া, কাশীপুরের উদ্যান বাটীতে লইয়া আসিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহাবশেষ কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে, অতঃপর ইহাই তাঁহার শিষ্যগণের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। গৃহী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সকল বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। তাই তিনি গুরুদেবের দেহাবশেষ কাঁকুড়গাছিতে নিজ বাগান-বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া, উহার নিত্যপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী যুবক শিষ্যগণ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল, উহার কিয়দংশ রামবাবুকে দেওয়া হইবে এবং বাকীটুকু ত্যাগী যুবকদের নিকটে থাকিবে।

রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে, তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে, তাঁহার দেহাবশেষপূর্ণ কলসীর সম্মুখে ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল। ষষ্ঠ দিবসে, শ্রীমাকে কাশীপুর উদ্যান-বাটী হইতে বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে আনয়ন করা হইল। ঐ সঙ্গেই রামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণ, দেহাবশেষের কলসী হইতে গুরুদেবের অস্থি ও

দেহাবশেষ একটা বড় কৌটায় পূরিয়া, নিত্যপূজা ও ভোগরাগের উদ্দেশ্যে, অস্থায়ী ভাবে বলরাম বাবুর বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। সপ্তম দিবস, রবিবার, জন্মাষ্টমী তিথিতে, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেহাবশেষের বাকী অংশটুকু কলসী-সমেত কাশীপুর হইতে লইয়া যাইয়া, সমারোহের সহিত উৎসব করিয়া, কাঁকুড়গাছির উদ্যান-বাটীতে উহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। শীঘ্রই তিনি সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, উহার তলদেশে দেহাবশেষের কলসীটী পুঁতিয়া রাখিলেন এবং মন্দিরে গুরুদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া, উহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা গুরুদেবের সেবার নিমিত্ত বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই তিন জন আর গৃহে ফিরিলেন না। উদ্যান-বাটীর ভাড়ার মাস পূর্ণ হইবারও কয়েক দিন বাকী ছিল। ঐ কয় দিবসের জন্য তাঁহারা সেখানেই রহিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে কাশীপুর উদ্যান-বাটীর ভাড়ার সময়, আগষ্ট মাস, শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু যাঁহারা তখনও ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কোথায় যাইবেন? আবার, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, শশী, কালী প্রভৃতি যুবকগণের পক্ষেও নিজ নিজ গৃহে বাস করা কষ্টকর। কারণ, ত্যাগই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা কি করিয়া গৃহে বাস করিবেন? গৃহ তাঁহাদের নিকট কারাগার, আত্মীয়-স্বজন কালসাপের তুল্য। পরমহংসদেবের

একান্ত অনুগত ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কাশীপুর বাগান-বাড়ীর ভাড়া দিয়া আসিয়াছেন; আর শ্রীযুক্ত বলরাম, রাম, মাষ্টার, গিরিশ প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তেরা সম্মিলিত ভাবে, গুরুদেবের চিকিৎসার ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যয় বহন করিতেন। গৃহী ভক্তগণের মধ্যে, কেহ কেহ কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী যুবক গুরুভ্রাতাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেও, সুরেন্দ্র বাবু অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে অথবা সংসার-দাবানলে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিবে, ইহা কেমন করিয়া সহিব? এক কাজ কর; একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া, তোমরা সব একত্র বাস কর। তাহাতে তোমাদের একটা দাঁড়াইবার স্থান হইবে। আর আমরাও মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইয়া, সংসারের জ্বালা জুড়াইয়া আসিব। আমি কাশীপুরে ঠাকুরের সেবায় সামান্য কিছু দিতাম; এখন তাহা দ্বারাই কোন প্রকারে তোমাদের খরচ চলিয়া যাইবে"। সুরেন্দ্র বাবুর উৎসাহ ও উদ্যোগে, শীঘ্রই মাসিক এগার টাকা (ট্যাক্স সমেত) ভাড়ায় বরাহনগরে একটী বাড়ী ঠিক করা হইল। প্রথমে লাটু, তারক ও বুড়ো গোপাল সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁহারা অবস্থাধীন গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বাড়ী হইতেই সর্ব্বদা বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির প্রায় পাঁচ মাস পরে, ১২৯৩ সনের পৌষ মাসের শেষভাগে নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, তারক, নিরঞ্জন প্রমুখ কতিপয় গুরুভ্রাতা সহ আঁটপুর বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়ীতে সমবেত হন। সেখানে তাঁহারা কয়েক দিবস এক মনে দিবারাত্র জপধ্যান, শাস্ত্র-চর্চ্চা ও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ক্রমে গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিবার পরে, একে একে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, কালী, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও যোগীন আসিয়া বরাহনগর মঠে জুটিলেন। ক্রমে সুবোধ, সারদাপ্রসন্ন, হরিনাথ, গঙ্গাধর এবং তুলসীও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কাশীপুর উদ্যান-বাটী হইতে পরমহংস-দেবের ব্যবহৃত সকল দ্রব্যাদি বরাহনগরের বাড়ীতে আনিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। শীঘ্রই তাঁহার দেহাবশেষও বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে সেখানে আনয়ন করা হইল। এখানেই রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পত্তন। বরাহনগরে মঠ-স্থাপন অবধি, সুরেন্দ্র বাবু প্রয়োজন অনুসারে মঠের খরচের জন্য প্রতি মাসে ত্রিশ, চল্লিশ হইতে আরম্ভ করিয়া, এক শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। বলরাম বাবুও প্রয়োজন মত মঠের খরচের জন্য টাকাকড়ি দিতেন।

দেহত্যাগের প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, নিরঞ্জন, যোগীন, বাবুরাম, তারক, শশী, শরৎ, কালী, লাটু ও বুড়ো গোপাল, এই একাদশ জন শিষ্যকে সন্ন্যাসের চিহ্ন-স্বরূপ গৈরিক বসন প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের

প্রথম ভাগে, নরেন্দ্রনাথ গুরুভ্রাতৃগণ সহ বরাহনগর মঠে যথাবিধি বিরজা-হোম করিয়া, যোগপট্ট (সন্ন্যাসের নাম) গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ ও লাটু তখন বৃন্দাবনে তপস্যারত ছিলেন। কাজেই, তাঁহারা মঠে ফিরিয়া, হোমাদি অনুষ্ঠান করিলেন। হরিনাথ এবং তুলসীও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী হইয়া, নরেন্দ্রনাথ প্রথমেই 'বিবেকানন্দ' নাম ধারণ করেন নাই। পরিব্রাজক অবস্থায়, কোন কোন সময়ে, তিনি আত্মগোপন উদ্দেশ্যে নাম বদলাইয়া, 'বিবিদিষানন্দ' প্রভৃতি নামে আপন পরিচয় দিতেন। আর সম্ভবতঃ, আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে তিনি খেতড়ি-রাজ কর্ত্তৃক 'বিবেকানন্দ' নামে ভূষিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের মধ্যে, কেহই আধ্যাত্মিকতা ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে নরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন না। শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে অবস্থান কালে, নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই নিকটে উপস্থিত থাকিয়া, গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সুযোগে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নানা ভাবে শিক্ষাদান করেন। তিনি তাঁহাকে আপন আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহও দান করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে, শিষ্যগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে, নরেন্দ্রনাথই যোগ্য ব্যক্তি। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের শিক্ষা, উপদেশ ও কৃপা-গুণে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাকৃত অথবা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস ইত্যাদি স্থায়ী ফল দান করিতে পারে

না, এবং ধর্ম্ম জগতে ইহাদের স্থান উচ্চে নয়, একথা বুঝিতে পারিয়া, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বরাহনগর মঠের প্রথম পত্তন হইতেই, প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের দ্বারা স্থায়ী ফল ও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, গুরুভ্রাতৃগণ সহ কঠোর তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে রত হইলেন। এই কালে, তাঁহারা সামান্য এক খণ্ড বস্ত্র ও মুণ-ভাত, শাক-ভাত ইত্যাদি অতি সাধারণ খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকিয়া, যে ভাবে নিত্য গঙ্গাস্নান, অনবরত শাস্ত্রপাঠ ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপধ্যানে, দিবারাত্র একই নিয়মে অতিবাহিত করিতেন, তাহা ত্যাগী জীবন যাপনেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁহাদের অত্যুগ্র তপস্যার কথা স্মরণ করিলেও, আমাদের অন্তর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মঠের ভ্রাতাদের মধ্যে দুই এক জন, ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। কেহ কেহ তীব্র বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, তপস্যার উদ্দেশ্যে, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থে চলিয়া গেলেন। আবার অন্যেরা অনন্ত আকাশকে গৃহ-ছাদ ও ভূমিতলকে শয্যা রূপে বরণ করিয়া, সম্পূর্ণ নিরালম্ব ভাবে নর্ম্মদা-তীর, দাক্ষিণাত্য, হিমালয়ের দুর্গম তীর্থ সমূহ, এমন কি, বরফাবৃত তিব্বত প্রদেশ ভ্রমণে রত হইলেন।

শ্রীযুক্ত শশী মঠের প্রথম পত্তন হইতেই, শ্রীগুরুর সেবা-পূজায় প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার নিকট, ইহা হইতে বড় তপস্যা আর কিছুই ছিল না। তিনি পূর্ব্বাপর বরাহনগর মঠে থাকিয়া, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে, শ্রীগুরুর নিত্যপূজা ও ভোগ-রাগ চালাইতে লাগিলেন। তখন তিনি মঠের প্রাণ-স্বরূপ

ছিলেন। মঠে উপস্থিত গুরুভ্রাতাদিগের নিয়মিত স্নানাহারাদির তত্ত্বও তিনিই করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে জপ-ধ্যান ও স্বাধ্যায় হইতে বল পূর্ব্বক টানিয়া তুলিয়া, আহারাদি করাইতে হইত।

'যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ'—ভাব-ভক্তি ও বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য, ভগবান্ ভক্ত ও আশ্রিতগণের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ হরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিষম সংসার-পরীক্ষায় নিপতিত করেন। সুরেন্দ্র বাবু ও বলরাম বসু মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে, তিন বৎসরের অধিক কাল যাবৎ কোন প্রকারে, বরাহনগর মঠের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছিল। এইবার ভগবান্ ত্যাগী যুবকগণের সামান্য মাত্র অন্নবস্ত্রের সংস্থানটীও হরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে বলরাম বাবু এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে সুরেন্দ্র মিত্র কালগ্রাসে পতিত হন। এই দারুণ দুর্দ্দিনে, শশীর (রামকৃষ্ণানন্দ) ভিক্ষা-শিক্ষা এবং অপর দুই এক জন ভক্তের অর্থ-সাহায্যে মঠের খরচ পত্র চলিতে লাগিল। তখন প্রায়ই মঠবাসিগণকে শুধু নুণ ও তেলাকুচপাতা-সিদ্ধ যোগে ভাত খাইতে হইত। মঠে তখন যে কয়জন সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের মধ্যেও প্রায় সকলেই বৃক্ষতল ও ভিক্ষা সম্বল করিয়া, তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যেন ভগবানের প্রতি অভিমান ভরে, অদৃষ্টের পরিহাসকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া, অধিকতর কঠোর জীবন যাপন করিবার জন্যই, তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এইকালে নরেন্দ্রনাথ তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-ধারণাকে মাত্র নিত্যসঙ্গী করিয়া, 'বহতা পানির' ন্যায় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে, নির্জ্জন হিমগিরি-কোলে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রাজপুতানার আলোয়ার, জয়পুর, খেতড়ি, আবুপাহাড় এবং কাথিয়াওয়ারের পুরবন্দর প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, তিনি প্রায় দুই বৎসর পরে মান্দ্রাজে উপনীত হন। খেতড়ি ও আলোয়ারের রাজা বিবেকানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, কতিপয় ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক এবং মহীশূর ও রামনাদের রাজা, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। ঐ সকল রাজা, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ, তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবক শিষ্যগণের উৎসাহ উদ্যোগে, এবং রামনাদ, মহীশূর ও খেতড়ি-রাজের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যে, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমেরিকায় পৌঁছিয়া, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। ফলে, চির-অবজ্ঞাত ভারতবর্ষ ও ভারতীয় রীতিনীতি, জগৎ-সভায় বরেণ্য আসন লাভ করে।

আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া, তিনি কয়েক মাস ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

স্বামিজীর আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বেই, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। স্বামিজী তখন দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ছিলেন বলিয়া, আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব্বে আলমবাজারের মঠ তাঁহার দেখা হয় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গাতীরে একটি স্থায়ী মঠ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গুরুভ্রাতৃগণ গঙ্গার পশ্চিম কূলে বেলুড় গ্রামে, মঠবাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী একখণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে বাড়ী নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল এবং কাজের সুবিধার জন্য, বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীটি ভাড়া করিয়া, পুনরায় আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে উঠাইয়া আনা হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর, বেলুড়ের নিজস্ব জমিতে, স্বয়ং স্বামিজী স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। ঐ দিবস স্বামিজী, নীলাম্বর বাবুর বাগান-বাড়ী হইতে গুরুদেবের দেহাবশেষ নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া নূতন জমিতে আনিয়া, স্বয়ং যথাবিধি উহার পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। তখনও মঠের গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। সেই নিমিত্ত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত, মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতেই রহিয়াছিল। স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যগণই জমি-ক্রয় ও মঠবাড়ী নির্ম্মাণের সকল ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পাঁচ বৎসর তাঁহার গুরুদেবের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ঐকালে তিনি লক্ষ্য

করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত পুরুষ মানব-জাতির নিকট পরিচিত ধর্ম্ম সমূহ একা সাধন করিয়া, নিজ জীবনকে এক অপূর্ব্ব 'বিশ্ব-মানবাদর্শ' রূপে পরিণত করিয়াছেন—(১) সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ভক্তি-পথের ভাবরাশি অবলম্বনে, রামকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ও হরিকথা প্রসঙ্গে নিজে আনন্দে উল্লসিত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকবৃন্দের মনেও ঐ ভাব সঞ্চারিত করিতেন ; পরক্ষণেই আবার (২) নেতি-নেতি রূপ জ্ঞান-বিচার দ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুর বোধে মগ্ন হইয়া, ব্রহ্মশক্তির কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতেন ; আবার তৎপর-মুহূর্ত্তেই তিনি (৩) নিজ দেহ মন অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বজীবের হিতের জন্য ভাবনা, চিন্তা, পরামর্শ, উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া, শরীর ক্ষয় করিতে করিতে সহসা (৪) যোগশাস্ত্রের রহস্য-বিদ্যা, সমাধি অবলম্বন ও উহার উচ্চাবচ সর্ব্ববিধ স্তরে অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া, যোগবিদ্‌গণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

স্বামিজী সারাজীবন বিজ্ঞান হিসাবেই ধর্ম্মবিষয়ের চর্চ্চা ও গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস জানিবার বুঝিবার জন্য সারা-জীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার গুরুদেবের জীবন ভিন্ন অপর কোথাও, এক জীবনে এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সংযোগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি বুঝিতে পারিলেন, মানব-জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যাবতীয় মানবকে

লইয়া এক উদার ধর্ম্ম সঙ্ঘ স্থাপনের উদ্দেশ্যে, এই একটী আদর্শ, একটী সুনির্দ্দিষ্ট ছাঁচ, ভগবান্ কর্তৃক জগতের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। সেই ছাঁচ বা আদর্শটীকে মানব জাতির সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখাই, তাঁহার মঠ-স্থাপনের উদ্দেশ্য।

রামকৃষ্ণ মিশন

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে, স্বামিজী কলিকাতায় বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণেব এক সভা আহ্বান বরেন। আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ কামনায়, আর্ত্ত ও পতিতগণের মধ্যে অন্ন, বিদ্যা ও ধর্ম্ম দানের নিমিত্ত সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি এই সভায় রামকৃষ্ণ ভক্তগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ কবিলেন। তদনুযায়ী, ঐ দিনই একটী সঙ্ঘও গঠিত হইল এবং স্বামিজী সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে, উহার নাম রাখিলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। কাবণ, শ্রীরামকৃষ্ণের সমদর্শন ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় মুলক 'যত মত, তত পথ'রূপ বাণী বা মিলন সূত্রই ছিল ইহাব মূলে, এবং ঐ বাণীর বহুল প্রচার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানব মণ্ডলী মধ্যে মৈত্রী স্থাপনই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সাধারণ সভাপতি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রেব সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের পর, প্রতি রবিবার কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর বাড়ীতে

ঐ সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সেখানে গীতা, উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ অথবা বিষয়-বিশেষ অবলম্বনে বক্তৃতা হইত। স্বামিজী কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে, সভায় যোগদান করিয়া, সঙ্গীত ও উপদেশ দ্বারা সকলের প্রাণে আনন্দ দান করিতেন।

এইরূপে, প্রথম তিন বৎসর বলরাম বাবুর বাড়ীতেই রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাদি চলিয়াছিল। স্বামিজীর দেহত্যাগের প্রায় ৭ বৎসর পরে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, রামকৃষ্ণ মিশন গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়া, বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার মুষ্টিমেয় শিষ্যের অন্তরে যে ত্যাগের বীজ বপন করিয়াছিলেন, উহা কালক্রমে, বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় মহা মহীরুহে পরিণত হইল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের বিশেষত্ব

পরোপকারের ভাবটী বহু পুরাতন। ইহাতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুরাণাদি শাস্ত্রে, 'পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্', 'দুর্লভঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বজীবে দয়াপরঃ' ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি এবং পরোপকারের দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দল বাঁধিয়া পরোপকার করা, সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধগণ এবং সম্ভবতঃ তাহাদের অনুকরণে খৃষ্টানগণও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছেন। আর 'সেবা'ত ভারতের শূদ্রেরা, অপর তিন বর্ণকে চিরকালই করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের বিশেষত্ব কি? ইহার উত্তর পাইতে হইলে, আমাদিগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের কয়েকটী ঘটনার অনুধ্যান করিতে হইবে।

অদ্বৈত অনুভূতির ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে অহরহঃ সর্ব্বজীবের অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেন। ঐ কালে ৺জগদম্বার আদেশে, তাঁহার অন্তরে লোক-কল্যাণ সাধনের শুভেচ্ছা উদিত না হইলে, অদ্বৈত-ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ করাই অসম্ভব হইত। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে, সর্ব্বদা সাধারণ ভূমিতে অবস্থিত মানব-মনের সহিত চলিতে হইত বলিয়া, তিনি বাধ্য হইয়া অদ্বৈত বুদ্ধিকে যতদূর সম্ভব চাপিয়া রাখিয়া, লোক-ব্যবহার করিতেন। কিন্তু, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঐ ভাবটী স্বভাবতঃই ফুটিয়া বাহির হইত। আমরা দেখিয়াছি,—(১) কালী-বাটীর উদ্যানে শ্যামল দুর্ব্বাদলের সহিত একাত্মবোধ হেতু, দুর্ব্বাদল পদদলিত হওয়ায়, রামকৃষ্ণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলেন; (২) চাঁদনীর ঘাটে দাঁড়াইয়া গঙ্গা-দর্শন কালে, এক নৌকার মাঝি অপর মাঝির পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলে, অদ্বৈত-বুদ্ধির ফলে, রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে আঘাতের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি আহতের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন; (৩) সর্ব্বভূতে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি জীবের প্রতি অসীম সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং সহজেই তাহাদের দুঃখে কাতর হইতেন।

(১), (২)—১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৩)—১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া, বৈষ্ণবগণের 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন', এই কথাটী ব্যাখ্যা করিতে করিতে, ভাবস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, "জীবে দয়া? জীবে আবার দয়া কি? তুই দয়া করবার কে? দয়া নয়, দয়া নয়, শিব-জ্ঞানে সেবা"। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) এবং অন্যান্য কয়েক জন ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু একমাত্র স্বামিজীই, পরমহংসদেবের এই কথার মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষণেক পরেই, নরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন, "আজ একটী অপূর্ব্ব সত্য জানিতে পারিলাম। জীবনে যদি কখনও সুযোগ ঘটে, তবে এই মহান্ সত্য জগতে প্রচার করিব"।

স্বামী বিবেকানন্দের চিত্তে ধর্ম্মভাবই ছিল প্রবলতম বৃত্তি। আর সম্ভবতঃ, তাঁহার চিত্তে পরহিতেচ্ছাও সমভাবেই প্রবল ছিল। আশৈশব তিনি মানুষের দুঃখে বড় কাতর হইতেন এবং সকল সময়েই প্রাণপণে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। মানুষের দুঃখ কিসে দূর হয়, ইহাই আজীবন তাঁহার নিকট এক প্রধান সমস্যা ছিল। পরমহংসদেব নিজ জীবনে সেই সমস্যার সমাধান করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য নরেনকে সেই সমাধান জগতে প্রচার করিতে বাধ্য করিলেন।

এক দিবস, কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে ধ্যানকালে, নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধির আস্বাদ লাভ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অনুক্ষণ ঐ আনন্দময় সমাধিতে মগ্ন থাকিবার জন্য আগ্রহ

প্রকাশ করিলেন। ইহাতে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তোর এ কেমন হীনবুদ্ধি যে, তুই আপন সুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাস; জগৎ-শুদ্ধ লোক দুঃখ-দৈন্য, শোক-মোহে ডুবে রয়েছে, আর তুই কিনা একাই আনন্দে থাকবি! একথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? তোর কত উচ্চ অবস্থা আসবে, আর তুই ধর্ম্মের বন্যা এনে জগৎকে ভাসিয়ে দিবি, তবে তো কাজ হয়!"

স্বামী বিবেকানন্দ, নাগ-মহাশয় প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক শিষ্যই জীবের অন্তরে শিব-দর্শন করিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণও সময়ে সময়ে মানবদেহে ঈশ্বর-পূজার অনুমোদন করিয়াছেন। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পঞ্চবটী-মূলে বসিয়া 'কথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' হইতে একটী স্থান পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। ঐ সময়ে, 'দেবী চৌধুরাণী'র পতিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করার কথা শুনিয়া, রামকৃষ্ণ পতিব্রতা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন"।

স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়াছিলেন,—মূর্ত্তি, মন্দির ও তীর্থ লইয়া মানুষ এমন ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান-স্থল যে জীব-হৃদয়, বিশেষতঃ মানব-হৃদয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া, তাহারা হিংসাদ্বেষ ও

দলাদলিতে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মই বেশী করে। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পাষাণ ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, মনুষ্যদেহে রামসীতা-পূজা, গুরুপূজা, কুমারী-পূজা, ষোড়শী-পূজা ইত্যাদি নানা প্রকারে ঈশ্বর-পূজা করিয়া, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকগণ এবং অন্যান্য অনেকেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন।

স্বামিজী গুরুর ও নিজের অনুভব এবং শাস্ত্রের অনুমোদন, প্রচলিত ধর্ম্মের অবিরোধ জানিয়া, অন্নবস্ত্র, বিদ্যা ও ধর্ম্ম দান রূপ উপচারে, মানবদেহে ঈশ্বরের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্ম্মের পর-হিত (Philanthropy) নহে; স্মৃতি-শাস্ত্রের দানধর্ম্ম বা পরোপকার নহে; মোক্ষ লাভার্থে রক্তমাংসের মন্দিরে বিশ্বনাথের পূজা। ইহাতে সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয়; আর ইহার অবান্তর ফল রূপে, জগতের হিতও হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে, দুর্ব্বল জাতির উপর সবলের অত্যাচার, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, ইন্দ্রিয়পরতা ও জড়-বিজ্ঞানের আসুরিক সম্পদের যুগে কেবলমাত্র সকল জীবে নারায়ণ বুদ্ধি আনয়ন ও নারায়ণ জ্ঞানে জীব-সেবার ভাব গ্রহণ দ্বারাই, ধর্ম্মদ্বেষিতা, ধনিদরিদ্র-সমস্যা, স্বার্থান্ধ স্বদেশ-প্রেম ও উহার ফল স্বরূপ পরদেশ লুণ্ঠনাদির সুমীমাংসা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

সমাপ্ত